ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪১২:১৩

প্রথম মহীপালের রাজভিটা শিলালিপি : পাঠোদ্ধার ও বিশ্লেষণ
মোঃ মনিরুল হক
মোঃ আব্দুল কুদ্দুস
উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০) : বাংলাদেশ রেজিমেন্টের ভূমিকা
মো. ফজলুল হক
ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার লবণ শিল্প
মো. রেজাউল করিম
মুসলিম শাসনামলে বাংলায় প্রবর্তিত ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ
মো. শামসুজ্জোহা এছামী
ভাষা আন্দোলন ও ছাত্র নেতৃত্ব
মোহাম্মদ বশির আহম্মদ
মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রনীতি : প্রসঙ্গ মধ্যপ্রাচ্য
মো. ফায়েকউজ্জামান
শহীদ সাবেরের 'আরেক দুনিয়া থেকে': ১৯৫০-এর দশকের জেলজীবন
শফিকুর রহমান
আল মাহমুদের জীবনবোধ
সরকার আমিন
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প : দুর্ভিক্ষের চিত্র
গৌতম কুমার দাস
বিশ শতকে নারী রচিত বাংলা উপন্যাসে নারী-শিক্ষার স্বরূপ
মোহাঃ শাহ্ কামাল ভূঁঞা
নকশি কাঁথার সামাজিক, ব্যবহারিক ও কাব্যিক মূল্য
বিলকিস বেগম
গ্রামীণ নারীর জীবন-জীবিকা-ক্ষমতায়ন : একটি গ্রামভিত্তিক সমীক্ষা
কানিজ ফাতেমা কানন
প্রবাসী কর্মজীবীদের পারিবারিক জীবন : প্রোষিতভর্তৃকার ক্ষমতায়ন
মোঃ ওমর ফারুক
দৈহিক মিলন: পক্ষদের অধিকার ও দায়বদ্ধতা
খবির উদ্দীন আহম্মদ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল

ISSN 1561-798X
ত্রয়োদশ সংখ্যা ১৪১২

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ আবুল বাসার মিঞা

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার
জাকির হোসেন

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২
প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৬

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

প্রকাশক

মোঃ জাইদুর রহমান
সচিব, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
ফোন : (০৭২১) ৭৫০৭৫৩ ।। ফ্যাক্স : (০৭২১) ৭৫০০৬৪
E-mail : ibsru@yahoo.com

কভার ডিজাইন
আবু তাহের বাবু

সম্পাদনা সহকারী
এস.এম. গোলাম নবী
সহকারী রেজিস্ট্রার, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক
মেসার্স শাহ্পীর চিশতী প্রিন্টিং প্রেস
কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী

মূল্য
টাকা ১৫০.০০

সম্পাদকমণ্ডলী

নির্বাহী সম্পাদক

মোঃ আবুল বাসার মিঞা
প্রফেসর ও পরিচালক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক

স্বরোচিষ সরকার
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জাকির হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য

মু. আবদুল কাদির ভূঁইয়া
প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রীতি কুমার মিত্র
প্রফেসর, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. জয়নুল আবেদীন
প্রফেসর, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আবু দাউদ হাসান
প্রফেসর, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সনজীব কুমার সাহা
প্রফেসর, মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আনওয়ারুল হাসান সুফি
প্রফেসর, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. জগলুল হায়দার
প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বেগম আসমা সিদ্দিকা
প্রফেসর, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. মোস্তাফা কামাল
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ নাজিমুল হক
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা আইবিএস দায়ী নয়)

যোগাযোগ

নির্বাহী সম্পাদক
আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ফোকলোর, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, আইন, পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে।
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় রচিত অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে।
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান অনুযায়ী। তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
- গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য রীতি অনুসরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পরিসর অনূর্ধ্ব কুড়ি হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের দুই কপি পাণ্ডুলিপি রি-রাইটেবল সিডিসহ জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফন্ট হবে "বিজয়" সফ্টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে"। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা অবশ্যই থাকতে হবে।

সূচিপত্র

মোঃ মনিরুল হক মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	প্রথম মহীপালের রাজভিটা শিলালিপি : পাঠোদ্ধার ও বিশ্লেষণ	০৭
মো. ফজলুল হক	উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০) : বাংলাদেশ রেজিমেন্টের ভূমিকা	১৩
মো. রেজাউল করিম	ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার লবণ শিল্প : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	২৯
মো. শামসুজ্জোহা এছামী	মুসলিম শাসনামলে বাংলায় প্রবর্তিত ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ	৪৯
মোহাম্মদ বশির আহম্মদ	ভাষা আন্দোলন ও ছাত্র নেতৃত্ব	৫৭
মো. ফায়েকউজ্জামান	মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রনীতি : প্রসঙ্গ মধ্যপ্রাচ্য	৬৯
শফিকুর রহমান	শহীদ সাবেরের 'আরেক দুনিয়া থেকে': ১৯৫০-এর দশকের জেলজীবন	৮১
সরকার আমিন	আল মাহমুদের জীবনবোধ	৯৩
গৌতম কুমার দাস	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প : দুর্ভিক্ষের চিত্র	১০৩
মোহাং শাহ্ কামাল ভূঁঞা	বিশ শতকে নারী রচিত বাংলা উপন্যাসে নারী-শিক্ষার স্বরূপ	১১৯
বিলকিস বেগম	নকশি কাঁথার সামাজিক, ব্যবহারিক ও কাব্যিক মূল্য	১৩১
কানিজ ফাতেমা কানন	গ্রামীণ নারীর জীবন-জীবিকা-ক্ষমতায়ন : একটি গ্রামভিত্তিক সমীক্ষা	১৩৯
মোঃ ওমর ফারুক	প্রবাসী কর্মজীবীদের পারিবারিক জীবন : প্রোষিতভর্তৃকার ক্ষমতায়ন	১৫৩
খবির উদ্দীন আহম্মদ	দৈহিক মিলন : পক্ষদের অধিকার ও দায়বদ্ধতা	১৭৩

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২

প্রথম মহীপালের রাজভিটা শিলালিপি : পাঠোদ্ধার ও বিশ্লেষণ

মোঃ মনিরুল হক*
মোঃ আব্দুল কুদ্দুস**

Abstract: An inscription, incised on black basalt, has been acquired in Varendra Research Museum recently from Rajabhita on the bank of the river Tangan of Pirganj Upazilla in Thakurgaon district. This inscription, bearing the name of Mahipala (the first), was inscribed in 1010 A.D. The language of the inscription is Sanskrit and the script is proto-Bengali (Kutil Lipi). The inscription is written in prose and bears three animal depictions such as a camel, a pig and an ass, where the pig is associating with the ass and the camel is standing behind. Such type of pictorial imprecation is very rare in ancient sculpture of Bengal.

ভূমিকা

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে পাল রাজবংশের স্থিতি সবচেয়ে দীর্ঘ। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে দ্বাদশ শতকের শেষ অবধি পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার শত বছর ধরে ২০ জন পাল নৃপতি কখনো গৌড়সহ অপরাপর বিস্তীর্ণ ভূভাগের, আবার কখনো সীমিত অঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[১] কিন্তু ১৯৮৭ সালে পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলার হাবিবপুর থানার অন্তর্গত ৭৩ নং জগজ্জীবনপুর মৌজার সলাইডাঙ্গা নামক স্থানে একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হবার পর পাল রাজবংশের নতুন একজন রাজা, দেবপালের প্রথম পুত্র মহেন্দ্রপালের নাম অবগত হওয়া গেছে;[২] এতে বর্তমান পাল নৃপতির মোট সংখ্যা হয়েছে ২১ জন । শুধু সময়ের স্থিতির জন্যই নয়, আরো নানান কারণে পাল রাজবংশের উত্থান ও রাজ্য শাসনের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

---

* উপ-পরিচালক, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

** সিনিয়র কনজারভেশন অফিসার, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] দীনেশচন্দ্র সরকার, *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত* (কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৮২), পৃ. ৪২-৪৩। যদিও রমেশচন্দ্র মজুমদার পাল-নৃপতির সংখ্যা ১৮ জন বলে উল্লেখ করেছেন এবং সর্বশেষ দুই জন পাল নৃপতি কি-না, সেবিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন; *বাংলা দেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (৮ম সং; কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮), পৃ. ১১২-১৩, ১৪৫-৪৬।

[২] ইতিপূর্বে ঐতিহাসিক আর.সি. মজুমদার, ডি.সি. সরকার, আর.ডি. ব্যানার্জী প্রমুখের ইতিহাস গ্রন্থে ৪র্থ পাল নৃপতি হিসেবে দেবপালের পুত্র ১ম শূরপালের নাম উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু জগজ্জীবনপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, শূরপালের রাজ্যারোহণের পূর্বে তাঁর অগ্রজ মহেন্দ্রপাল সিংহাসনারোহণ করেন। উল্লেখ্য, মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালীন ৯টি প্রত্ননিদর্শনের আলোকে ঐতিহাসিকগণ মহেন্দ্রপালকে পালবংশ-বহির্ভূত গুর্জর-প্রতীহার-রাজ বলে মনে করতেন। পরিতোষকুমার কুণ্ডু, 'জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসনে পাল রাজবংশের নতুন তথ্য', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পঞ্চদশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৭, পৃ. ৮৫-৯২।

প্রত্যক্ষ ইতিহাস গ্রন্থ পাওয়া না যাওয়ার কারণে, প্রাচীন বাংলার অন্যান্য রাজা বা রাজবংশের ন্যায় পালরাজা বা রাজবংশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও পরোক্ষ সূত্র হিসেবে ঐতিহাসিকদের প্রস্তরলিপি, তাম্রলিপি, মূর্তিলিপি বা অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। আশার কথা, প্রাচীন বাংলার এই সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান প্রচুর সংখ্যায় আবিস্কৃত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। দেশের ইতিহাস-উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণা-কর্মে খ্যাতি অর্জনকারী, ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত, দেশের সর্বপ্রাচীন সংগ্রহশালা, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর গত ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে মহীপাল দেবের নামাঙ্কিত একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রস্তরলিপি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে, যা দ্বারা পাল রাজবংশের ইতিহাসে নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে বলে মনে করা যায়।

প্রাপ্তিস্থান ও উদ্ধার-কাহিনী

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁও জেলার (বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা) পীরগঞ্জ উপজেলার রাজভিটা নামক স্থানে লিপিটি পাওয়া যায়। রাজভিটা পীরগঞ্জ উপজেলার জাবরহাট ইউনিয়নের হাটপাড়া মৌজায় অবস্থিত। রাজভিটাকে স্থানীয় জনগণ 'শেরশাহ্ পাড়' বলেও উল্লেখ করে থাকেন। এর উত্তর পাশ দিয়ে টাঙ্গন নদী প্রবাহিত। নদীর পাড় ঘেঁষে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে উঁচু ভিটা জমি বিদ্যমান। ঐ স্থানে মাটি খননকালে শ্রমিকরা আলোচ্য লিপিটি উদ্ধার করে। এই সম্পর্কে বগুড়া থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক করতোয়া' পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়।[৩] এরপর উদ্ধারকৃত লিপিটি পীরগঞ্জ থানায় জমা দেওয়া হলে, তা ঠাকুরগাঁও জেলার কোর্ট মহাফেজখানায় রাখা হয়। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ পত্রিকা মারফত লিপির সংবাদ অবগত হয়ে, তা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও সাধারণ্যে উপস্থাপনের জন্য জাদুঘরে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে রাজশাহীর মাননীয় বিভাগীয় কমিশনারকে অনুরোধপত্র পাঠান।[৪] কমিশনার মহোদয় সম্মতি জ্ঞাপন করলে,[৫] জাদুঘরের পরিচালক ঠাকুরগাঁয়ের জেলা প্রশাসককে প্রত্ননিদর্শন জাদুঘরে সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পত্র মারফত অনুরোধ জানান।[৬] এই অনুবৃত্তিক্রমে ঠাকুরগাঁয়ের জেলা প্রশাসক জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে নিদর্শন সংগ্রহের বিষয়ে অবহিত করলে,[৭] তদনুযায়ী উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ মণ্ডল ১২-০৩-২০০২ তারিখে লিপিটি জাদুঘরে নিয়ে আসেন এবং তা জাদুঘরে পরিগৃহীত হয়।[৮]

প্রাপ্তিস্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে বরেন্দ্র অঞ্চলের সীমান্তস্থ উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এই জেলার বাণগড় (দিনাজপুর জেলা সদর থেকে প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণ দিকে

---

[৩] জেড. এ. বাবুল, 'পীরগঞ্জের ঐতিহাসিক রাজভিটা ॥ কষ্টি পাথরের প্রাচীন শিলালিপি উদ্ধার' *দৈনিক করতোয়া*, ২১শে মে, ২০০০।

[৪] পত্র নং ভিআরএম/৪-৮/৮০/২০০০-২০০১, তারিখ ২৩-১০-২০০০।

[৫] সম্মতি স্মারক নং উন্নয়ন (ডি)/৮-১৫/০১/২৪(২), তারিখ ৩০-০২-২০০২।

[৬] পত্র নং ভিআরএম/৪-৮/১৫২/২০০১-২০০২, তারিখ ১৩-০২-২০০২।

[৭] স্মারক নং জেট্রেঠাক/চৌদ্দ-৬/৯৮/২৩/১(৩), তারিখ ১১-০৩-২০০২।

[৮] Varendra Research Museum, *Accession Registar of Antiquities*, No. 4, Rajshahi, Acc. No. 2002.23 (8640).

অবস্থিত) নামক এলাকা গুপ্ত ও পাল আমলে কোটিবর্ষ নামে খ্যাত ছিল।[৯] এখানে তৎকালীন 'বিষয়' বা জেলার শাসন-কেন্দ্র অবস্থিত ছিল।[১০] জৈন প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থানুসারে 'রাঢ় ও বঙ্গজনদের' এটি রাজধানী ছিল বলেও ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন।[১১] অনেকে অনুমান করেন যে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বা উত্তরবঙ্গের কোনো বর্ষ, বিষয় বা পরগণার অধিকাংশ দিনাজপুরের নিকটে অবস্থিত ছিল।[১২] মুসলিম শাসনের প্রথম দিক পর্যন্ত প্রধান নগর হিসেবে এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল।[১৩]

অবিভক্ত দিনাজপুর অঞ্চল থেকে প্রাচীন বাংলার অনেক ঐতিহাসিক প্রত্ন-উপাদান, যেমন— নয়পালের রাজত্বকালীন বাণগড় প্রশস্তি, কম্বোজবংশীয় কুঞ্জরঘটাবর্ষের শিলাস্তম্ভ, বিভিন্ন প্রস্তর ভাস্কর্য, গরুড়স্তম্ভ লিপি, বিরাট দুর্গ, মহীপাল দিঘি, কান্তনগর মন্দির প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানকার শিবহাটি নামক স্থানে বিদ্যাশিব প্রতিষ্ঠিত শৈব মতাদর্শের বিখ্যাত 'গোলকীমঠ' অবস্থিত ছিল বলেও জানা যায়।[১৪]

আলোচ্য লিপিটির প্রাপ্তিস্থান রাজভিটা ঐতিহাসিক বাণগড় থেকে আনুমানিক ২৬/২৭ মাইল দক্ষিণ দিকে টাঙ্গন নদীর তীরে অবস্থিত। মহেন্দ্রপালের জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসনে আমরা টংগিল নদীর খাড়ি সম্পর্কে অবহিত হই। এই টংগিল নদী, আজকের টাঙ্গন নদী থেকে অভিন্ন, তা অনুমান করা যায়।[১৫]

উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে অনুমান করা যায় যে, অত্রাঞ্চল একটি প্রত্নভূমি। এস্থানে ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে প্রাচীন ইট বা পোড়ামাটির নিদর্শন। নদীর ভাঙ্গনের ফলে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে কোনো প্রাসাদ বা নগরী-প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ। সার্বিকভাবে বিবেচনা করে বলা যায় যে, এই এলাকাটি প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদের একটি পুরাভূমি। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই অঞ্চলে উৎখনন কাজ করা গেলে, আবিষ্কৃত হতে পারে ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপাদান।

লিপি-পরিচয়

লিপিটি কালো পাথরে (Black basalt) খোদিত এবং পাথরের দৈর্ঘ্য ৬৬ সেন্টিমিটার (প্রায় ২৬ ইঞ্চি) ও প্রস্থ ৩১ সেন্টিমটির (প্রায় ১২.২ ইঞ্চি)। লিপির তলদেশ (Obverse) অমসৃণ বিধায়, এর উচ্চতা সবখানে সমান নয়; তবে গড় উচ্চতা ৭ সেন্টিমিটারের (২.৭৫ ইঞ্চি) কাছাকাছি। এর ওজন প্রায় ৩০ কিলোগ্রাম। লিপির সারির সংখ্যা ছয় এবং প্রতি সারির দৈর্ঘ্য ৬১ সেন্টিমিটার (প্রায় ২৪ ইঞ্চি)। এর অক্ষরগুলো অত্যন্ত সুন্দর এবং শৈল্পিকরূপে খোদাইকৃত। তবে একস্থানে, সম্ভবত অনবধানতাবশত ভুল খোদাইয়ের পর, সেস্থান ঘষে পুনরায় অক্ষর খোদাই করা হয়েছে। এতে অবশ্য লিপি-পাঠে কোনোরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না। শিলাখণ্ডের কয়েক স্থানে চটা (thin slip) উঠে গেলেও, কোনো অক্ষর এখনো বিনষ্ট হয়নি। প্রতি পঙ্‌ক্তির অক্ষর একই পরিমাপে খোদিত হয়নি; প্রথম ও

---

[৯] R.C. Majumder, *History of Bengal*, vol.I (Dacca : University of Dacca, 1943), p. 9.

[১০] দীনেশচন্দ্র সরকার, *শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ* (কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৮২), পৃ. ৮৫।

[১১] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব* (কলকাতা : বুক এমপোরিয়াম, ১৩৫৬), পৃ. ১৪৫।

[১২] অমিয় বসু (সম্পা:), *বাংলায় ভ্রমণ*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা: পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ, ১৯৪০), পৃ. ১।

[১৩] দীনেশচন্দ্র সরকার, পৃ, ৮৫।

[১৪] *তদেব*, পৃ. ৮৬।

[১৫] পরিতোষ কুমার কুণ্ডু, 'জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসনে পাল রাজবংশের নতুন ঐতিহাসিক তথ্য', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পঞ্চদশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৭, পৃ. ৮৮।

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির অক্ষরের উচ্চতা প্রায় ২ সেন্টিমিটার; তৃতীয় পঙ্‌ক্তির ১.৫ সেন্টিমিটার এবং চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির উচ্চতা ১ সেন্টিমিটার।

প্রস্তরখণ্ডের শীর্ষদেশ থেকে প্রায় ২ সেন্টিমিটার, বাম ও ডান পার্শ্ব (edge) থেকে যথাক্রমে প্রায় ২ ও ৩ সেন্টিমিটার কিনারা (margin) ছেড়ে অক্ষর খোদাই করা হয়েছে এবং নিচের অংশের বাম দিকে ১টি উটের মূর্তি (যার উচ্চতা প্রায় ২০ সেন্টিমিটার) ও ডান দিকে ১টি শূকরীর ওপর উপগত ১টি গর্দভের মূর্তি (যাদের উচ্চতা যথাক্রমে প্রায় ৯ সেন্টিমিটার ও ১৪ সেন্টিমিটার) রয়েছে। মূর্তিগুলো অনেকটা উদ্গত (high relief) ভাবে খোদিত। লিপির তৃতীয় সারি বরাবর, উটের মূর্তির মাথার উপর একটি পুষ্পিকা অঙ্কিত রয়েছে। নির্দ্বিধায় বলা যায়, লিপিকর অক্ষর ও ভাস্কর্য নির্মাণে অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নবান ছিলেন।

আলোচ্য প্রস্তরশাসনটি মহীপাল দেবের নামাঙ্কিত ৩৩তম রাজ্যবর্ষে উৎকীর্ণ এযাবৎ প্রাপ্ত লেখর মধ্যে ১২তম লেখ। উল্লেখ্য, ১ম মহীপাল দেবের নামাঙ্কিত ইতিপূর্বে প্রকাশিত ১১টি লেখর কথা জানা যায়।[১৬] এগুলো হলো:

১. কুমিল্লা জেলার বাঘাউড়া মূর্তিলেখ (৩য় রাজ্যবর্ষ);
২. কুমিল্লা জেলার নারায়ণপুর মূর্তিলেখ (৪র্থ রাজ্যবর্ষ);
৩. দিনাজপুর জেলার বেলোয়া তাম্রশাসন (৫ম রাজ্যবর্ষ);
৪. পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাণগড় তাম্রশাসন (৯ম রাজ্যবর্ষ);
৫. বিহার রাজ্যের নালন্দা শিলালেখ (১১শ রাজ্যবর্ষ);
৬. বিহার রাজ্যের বোধগয়া মূর্তিলেখ (১১শ রাজ্যবর্ষ);
৭. বিহার রাজ্যে কুরকীহার মূর্তিলেখ (২১শ বা ৩১শ রাজ্যবর্ষ);
৮. বিহার রাজ্যের ইমাদপুর মূর্তিলেখ (৪৮শ রাজ্যবর্ষ), ২টি লেখ;
৯. পাটনা জেলার তেত্রাবন মূর্তিলেখ এবং
১০. বারানসীর সারনাথ শিলালেখ (১০৮৩ বিক্রমসংবৎ, ১০২৬ খ্রিস্টাব্দ)।

লিপির কাল নির্ণয়

এই লিপির প্রথম সারিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহীপাল দেবের রাজ্যারোহণের ৩৩তম বৎসরের আশ্বিন মাসে লিপি খোদিত হয়। আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন উৎস থেকে অবগত আছি যে, পাল রাজবংশে মহীপাল নাম-জ্ঞাপক দুইজন নৃপতি রাজ-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এঁরা হলেন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল। কিন্তু আলোচ্য লিপিতে উল্লিখিত মহীপাল প্রথম, না-কি দ্বিতীয়, তার স্পষ্ট কোন সাক্ষ্য নেই। এক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালের স্থিতি বিশ্লেষণ এবং লিপি-বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে লিপি রচনার সময়কাল এবং রাজার নাম নিরূপণ করা যেতে পারে।

আমরা জানি, দ্বিতীয় বিগ্রহপালের (আ. ৯৬০-৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ) পুত্র প্রথম মহীপাল খ্রিস্টীয় ৯৭৭ অব্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অর্ধ শতাব্দীকাল (আ. ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) রাজ-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়কালে তিনি বিলুপ্তপ্রায় পিতৃরাজ্যের উদ্ধারসাধন, বহিঃশত্রু প্রতিহতকরণ, নানারূপ জনহিতকর কর্মসাধন, ধর্মীয় কাজে পৃষ্ঠপোষকতা দান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। পক্ষান্তরে, ইতিহাসে দ্বিতীয় মহীপাল সংজ্ঞক

---

[১৬] দীনেশচন্দ্র সরকার, *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত* (কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৮২), ১৪-১৬।

নরপতি ছিলেন তৃতীয় বিগ্রহপালের (আ. ১০৪৭-১০৭০ খ্রিস্টাব্দ) তিন পুত্রের মধ্যে প্রথম। তিনি পিতার মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আরোহণ করেন আ. ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু অন্তর্বিদ্রোহ এবং কৈবর্ত বিদ্রোহের কারণে তিনি বেশিদিন রাজ্যভোগ করতে সমর্থ হননি; কৈবর্ত বিদ্রোহের নায়ক দিব্বোক কর্তৃক আ. ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে (অর্থাৎ এক বছরের মধ্যেই) তিনি নিহত হন।[১৭] যদিও তাঁর রাজ্যকালের স্থিতি সম্পর্কে সরসীকুমার সরস্বতী পাল আমলের কতিপয় 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথিতে অঙ্কিত চিত্রকলা পর্যালোচনা করে একটি পুঁথি দ্বিতীয় মহীপালের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে চিত্রিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৮] ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ও দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকাল ন্যূনপক্ষে পাঁচ বছর (আ. ১০৭০-১০৭৫ খ্রিস্টাব্দ) বলে মনে করেন।[১৯] কিন্তু যেহেতু, আলোচ্য শিলালেখটি ৩৩তম সংবৎসরে লিখিত বলে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং যেহেতু দ্বিতীয় মহীপাল কোনোক্রমেই এত দীর্ঘ সময় রাজত্ব করেননি, সে কারণে এটি প্রথম মহীপালের রাজত্বকালের হওয়াই সম্ভব। এছাড়া, এই লিপির অক্ষর বিন্যাস, লিপি-বৈশিষ্ট্য প্রথম মহীপালের খ্রিস্টীয় ৯৮১ অব্দে লিখিত 'মহীপালের নারায়ণপুর মূর্তিলেখ'[২০] খ্রিস্টীয় ৯৮৮ অব্দে লিখিত 'বালাদিত্য প্রস্তর-লিপি (নালন্দা-লিপি)'[২১]; খ্রিস্টীয় ১০২৬ অব্দে লিখিত 'মহীপালদেব- প্রস্তরলিপি (সারনাথ-লিপি)'[২২] প্রভৃতি লিপির সঙ্গে যথেষ্ট সাযুজ্য লক্ষ করে (যদিও কিছুকিছু অক্ষরের আকৃতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়) আমরা মনে করতে পারি যে, এই লেখটি প্রথম মহীপাল দেবের রাজত্বকালেই অঙ্কিত ।

দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের মতানুসারে প্রথম মহীপাল গৌড়াধিপতি হন আ. ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে।[২৩] আলোচ্য লিপিভাষ্যে আমরা অবগত হই যে, লিপিটি মহীপালের ৩৩তম রাজ্য-সম্বৎসরে উৎকীর্ণ। সুতরাং এই লিপির রচনাকাল আ. ৯৭৭+৩৩=১০১০ খ্রিষ্টাব্দের আশ্বিন মাস।

লিপি-পাঠ

প্রথম পঙ্‌ক্তি	ওঁ[২৪] শ্রীমন্মহীপাল দেবপাদীয় প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্ঞে সম্বত্ ৩৩ আশ্বিন দিনে। শ্রীদেশিহটূ। শ্রীজয়হটূ। শ্রীগৌড়হটূ যৈসমসূ
দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি	বণিগ্‌ব্রামেন। শ্রীসোন্নকা দেবী মাধবশাসন আগচ্চকাবচ্ছুন্ন গ্রাম। ধাত্রীপুর। সপ্তখাতক। খনিত্রপল্লী। লক্‌খুন্ন গ্রামেষু। সেক্যেপি।
তৃতীয় পঙ্‌ক্তি	স্বস্যাংস্বস্যাং। বাটিকায়াং। বাজ্ঞসুমৌ চ। গুবাকনালিকের বৃক্ষান্। আর্জয়ন্তি। তেষাংবাগ্দত্তা। যথাফা[২৫]লন্নালিকের বৃক্ষম্প্রতিয়লত্রয়ম্। ফাল
চতুর্থ পঙ্‌ক্তি	বদ্গুবাকবৃক্ষম্প্রতিয়ল একঃ। শ্রীসোন্নকা মাধবস্য পূজার্থম্। প্রতি সম্বসে রন্তে র্দ্দাতপ্যম্। যত্র। প্রতি নালিকের বৃক্ষং হিয়ণ্ড[২৬] প্রতি গূবাক বৃ

---

[১৭] *তদেব*, পৃ ৮৬।

[১৮] সরসীকুমার সরস্বতী, *পালযুগের চিত্রকলা* (কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৮), পৃ. ৫৮-৬৩।

[১৯] নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৪৮৮।

[২০] দীনেশচন্দ্র সরকার, *শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ*, প্লেট নং ১২।

[২১] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *গৌড়লেখমালা* (রাজশাহী : বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৩১৯), পৃ. ১০১ (প্লেট)।

[২২] *তদেব*, পৃ. ১০৪ (প্লেট)।

[২৩] মহীপাল দেবের রাজ্যারোহণের বৎসর খ্রিস্টীয় ৯৮৮ অব্দ বলে রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, পৃ.৮৫।

[২৪] প্রতিকী 'ওঁ' শব্দ দ্বারা লিপি আরম্ভ।

[২৫] এই 'া' (আ-কার) চিহ্নটি অন্যান্য অক্ষর বা 'কার' চিহ্ন থেকে পরিমাপে ছোট; সম্ভবত লিপি খোদাইয়ের সময় অনবধানতাবশত 'া' চিহ্নটি বাদ পড়ে যায়; লিপি সম্পন্ন হওয়ার পর সেই ভ্রম সংশোধন করা হয়েছে।

পঞ্চম পঙ্‌ক্তি ক্ষংদিপ**ত**[২৭] এতন্নিয়মিতাথাত্‌। যঃ কশ্চিদন্যথা কুরুতে। তষ্যদৃষ্টেন। শ্রীমদ্দেবপাদাঃ। অন্তরাদত্তাঃ। গর্দ্ধভঃপিতা। গন্তু যূকরী মাতা। উ

ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তি ষ্ট্রঃ পিতৃব্যে। ভবেত্র্‌। ষপথ ইতি।

লিপির ভাবানুবাদ*

শ্রীমহীপাল দেবের রাজত্বের ৩৩তম বৎসরের আশ্বিন মাসে এই লিপিটি উৎকীর্ণ হয়। শ্রী দেশীহট্, শ্রী জয়হট্ এবং শ্রী গৌড়হট্ নামক তিনজন বণিককে মাধবের পূজার জন্য শ্রীসোন্নকা দেবী নামক একজন ভূস্বামীন্ ধাত্রীপুর, সপ্তখাতক, খনিত্রপল্লী এবং লক্‌খুন্ন গ্রাম দান করেন। এই মর্মে দানপত্রটি সম্পাদিত হয় যে, প্রত্যেক গ্রাম-নিবাসী প্রতি বৎসর অন্তে তাদের নারিকেল ও সুপারি বাগান থেকে তিনটি নারিকেল গাছের ফল এবং একটি সুপারি গাছের ফল সোন্নকা মাধবের পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদান করবে।

যদি এমন দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তি এই নিয়মের অন্যথা করছে, তা হলে তার দেবতুল্য পিতা গর্দভের ন্যায় হীনপদস্থ হবে ও শূকরী মাতাতে গমন করবে এবং তার পিতৃব্য হবে উষ্ট্রের ন্যায়। এই মর্মে তারা সকলেই (গ্রামবাসী ও দানগ্রহীতা) শপথ গ্রহণ করে।

লিপির বৈশিষ্ট্য

'ওঁ' চিহ্ন দ্বারা লিপি আরম্ভ করা হয়েছে। এই চিহ্নটি মাঙ্গলিক চিহ্ন রূপে উৎকীর্ণ করার রীতি প্রচলিত ছিল এবং এর দ্বারা 'সিদ্ধম' পদ দ্যোতিত হয়।[২৮] বস্তুত চিহ্নটি মধ্যযুগে 'ওঁ সিদ্ধি' বা 'সিদ্ধিরস্তু'রূপে উচ্চারিত হতো এবং পূর্বভারতের বাংলা অঞ্চলে এটিকে 'আঁজি' চিহ্ন বলা হতো।[২৯] প্রাচীন বা মধ্যযুগের বিভিন্ন শিলালেখ বা তাম্রশাসনে ' ' চিহ্নটি ' 'রূপেও লিখিত দেখা যায়।[৩০]

সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে লিখিত এই লিপিতে দশম-একাদশ শতকের উত্তর ভারতীয় প্রত্ন-বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয়েছে, যা কুটিল লিপি হিসেবে পরিচিত।

---

[২৬] লিপির প্রথম পঙ্‌ক্তিতে লিখিত গাণিতিক সংখ্যা '৩' এবং এই পঙ্‌ক্তির হিয়ঙ শব্দের 'ঙ' দেখতে প্রায় অনুরূপ। বিশেষভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, 'ঙ'এর উপরের অংশ বেশি বক্রাকার; যা গাণিতিক '৩'-এর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

[২৭] এই শব্দে 'ত' অক্ষরটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; এরূপ 'ত' সেন-পূর্বযুগে দেখা যায় না। তবে পরবর্তীকালে লক্ষ্মণ সেনের আনুলিয়া তাম্রশাসনের ২৮ পঙ্‌ক্তিতে প্রায় অনুরূপ 'ত' ব্যবহৃত হয়েছে দ্রষ্টব্য, Nani Gopal Majumdar, *Inscriptions of Bengal,* vol. III (Rajshahi : Varendra Research Society, 1929), plate-9, p. 84; এতে অক্ষরের উপরের মাত্রা থাকলেও, বর্তমান লিপিতে সম্ভবত ভ্রমবশত মাত্রা অঙ্কিত হয়নি।

* লিপিটির ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে আমরা শ্রী ননীগোপাল জলদাস, বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী এবং শ্রী রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, সহকারী অধ্যাপক, সরকারী আনন্দমোহন কলেজ, কিশোরগঞ্জ মহাশয়দ্বয়ের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

[২৮] দীনেশচন্দ্র সরকার, *শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ* (কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৮২), পৃ. ৮৪।

[২৯] তদেব, পৃ. ৯৩।

[৩০] এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, নয়পালের রাজত্বকালীন মূর্তিশিবের বাণগড় প্রশস্তি, ৩য় গোপালের রাজীবপুর মূর্তিলেখ, বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি, বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসন, লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসন প্রভৃতিতে চিহ্নটি ' 'রূপে এবং ১ম শুরপালের তাম্রশাসন, ১ম মহীপালের নারায়ণপুর মূর্তিলেখ, বল্লালসেনের সনোখার মূর্তিলেখ, শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসন, ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসন প্রভৃতিতে চিহ্নটি ' 'রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ ৫০০ থেকে ৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সর্বভারতীয় লিপি বলতে ব্রাহ্মীলিপিকে বোঝানো হয়। পরবর্তীকালে এই লিপি উত্তর ভারতে এবং দক্ষিণ ভারতে দুটি স্বতন্ত্র ধারায় বিকশিত হতে থাকে। উত্তরী লিপির প্রচলন বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর পর্যন্ত এবং দক্ষিণী লিপি দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। খ্রিস্টীয় ৪র্থ থেকে ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত গুপ্ত লিপি (যা উত্তরী লিপি থেকে উদ্ভূত) বস্তুত সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তনের পরবর্তী স্তরে আসে কুটিল লিপি। এ জাতীয় লিপিতে বর্ণের, বিশেষ করে, স্বরবর্ণের মাত্রায় কুটিল বা বাঁকা আকৃতি দেখা যায়; সেকারণে একে কুটিল লিপি বলা হয়ে থাকে।[৩১]

'বালাদিত্য প্রস্তরলিপি (নালন্দা লিপি)'[৩২]; 'গরুড়স্তম্ভ লিপি (বদাল প্রস্তরলিপি)'[৩৩], 'বীরদেব প্রশস্তি (ঘোষরাবাঁ লিপি)'[৩৪], 'কেশব প্রশস্তি (মহাবোধি লিপি)'[৩৫] 'দেবলের কুটিল লিপি (*Kutila Inscription at Dewal*)'[৩৬] প্রভৃতি লিপিতে ব্যবহৃত অক্ষরলিপির সঙ্গে রাজভিটা লিপির যথেষ্ট সাযুজ্য রয়েছে। উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত লিপিগুলি সবই কুটিল প্রভাবিত। লিপিতে ব্যবহৃত বেশকিছু এ-কার (ে) চিহ্নের মধ্যে দুটি (১ম পঙ্‌ক্তির 'বিজয়রাজ্ঞে' শব্দে এবং ২য় পঙ্‌ক্তির বণিগ্‌ত্রামেন' শব্দে) এ-কার চিহ্ন নাগরী বৈশিষ্ট্যে লিখিত এবং বাকিগুলি সবই কুটিল। খোদিত বর্ণমালার মধ্যে 'ম', 'ন', 'ন্ম', 'ল', 'ব', 'য', 'ষ্ব', 'ন্ন', 'ক', 'খ', 'ত্র', 'ল্ল', 'ষ', 'এ', 'ও' অক্ষরগুলি এবং আ-কার, ই-কার, ঈ-কার, ঋ-কার চিহ্নগুলি আধুনিক বাংলা অক্ষরের প্রায় অনুরূপ।

কুটিল লিপি উত্তরী ও দক্ষিণী শিল্প-শৈলীতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেও, উত্তরের কিছু কিছু লিপিতে দক্ষিণের প্রভাব এবং দক্ষিণের কিছু (কদাচিৎ) উত্তরের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৩৭] আলোচ্য লিপিতেও দক্ষিণী লিপির অনেক প্রভাব লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে, ৯৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দের 'গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষের রাষ্ট্রকূট লিপি,'[৩৮] ৯৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দের 'অমোঘবর্ষের রাষ্ট্রকূট লিপি'[৩৯] প্রভৃতি লিপি লক্ষণীয়। এইসব লিপির দু-একটি অক্ষর ব্যতীত প্রায় সব অক্ষরের সাথে (যেমন-ক, জ, ত, থ, প, ব, ম, য, ল, শ, ষ, স, হ, ৎ এবং ক্ষ, ত্ত, ণ্ড, ঃ) রাজভিটা লিপিতে ব্যবহৃত অক্ষরের সাযুজ্য রয়েছে।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন অক্ষরের স্বতন্ত্র অবয়ব সৃষ্টি হতে থাকে, তখন স্বতন্ত্র ধারার এই বর্ণ পশ্চিম ভারতে নাগরী (সিদ্ধমাতৃকা থেকে) এবং পূর্ব ভারতে বাংলা অক্ষরে রূপান্তরিত হয়। সপ্তম থেকে নবম শতক পর্যন্ত বাংলা বর্ণলিপির উপর পশ্চিম ভারতীয় বর্ণলিপির প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও, দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, ১ম মহীপালের সময় থেকে এই প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে।[৪০] এ কারণে আমরা ১ম মহীপালের রাজত্বকালে লিখিত লিপিতে আধুনিক বাংলা

---

[৩১] গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা (মণীন্দ্র নাথ মজুমদার কর্তৃক অনূদিত), *প্রাচীন ভারতের লিপিমালা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ.৮০।

[৩২] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *গৌড়লেখমালা* (রাজশাহী : বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ম, ১৩১৯), পৃ.১০১।

[৩৩] *তদেব*, প্লেট- ৭০।

[৩৪] *তদেব*, প্লেট- ৪৫।

[৩৫] *তদেব*, প্লেট-২৯।

[৩৬] *Archaeological Survey of India,* vol. I, 1862-65, Simla,1871, pl. LI, pp. 352-357.

[৩৭] গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা (মণীন্দ্র নাথ মজুমদার কর্তৃক অনূদিত), পৃ.৮০।

[৩৮] JAS Bargess (ed.) *Indian Antiquary,* Bombay, 1883, pl.- I, II(a), III, pp.247-252.

[৩৯] *Ibid,* pl.-I, II(a), II(b), pp. 263-274.

[৪০] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, পৃ.১৮১।

হরফের অনুরূপ অবয়ব লক্ষ করা যায়। ১ম মহীপালের ইমাদপুর মূর্তিলেখ[৪১] এবং পূর্বে উল্লিখিত বালাদিত্য, বদাল প্রভৃতি প্রস্তর লিপিতে আমরা আধুনিক বাংলা অক্ষরের আকৃতির অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।

লিপিতে কয়েকটি শব্দের অদৃষ্টপূর্ব বানান লক্ষণীয়; যেমন—নালিকের (নারিকেল), উষ্ত্র (উষ্ট্র), ষূকরী (শূকরী), ষপথ (শপথ) প্রভৃতি। এছাড়া লিপিতে বেশ কয়েকস্থানে অপ্রয়োজনীয় পূর্ণ বিরাম চিহ্ন '।' (দাঁড়ি)-এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

লিপিতে দান সম্পর্কিত অভিসম্পাত ও ভাস্কর্যের ডেপিকশন

ধর্মীয় ও মানব-কল্যাণমূলক দান-কর্মের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যকে উৎসাহিত করা এবং প্রদত্ত দানের অন্যথা করলে ভর্ৎসনা করা প্রতিটি ধর্মেই নীতিবাক্যরূপে উল্লিখিত হয়েছে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ধর্মীয় অনুশাসনেও সবধরণের দানের ঐহিক ও পারত্রিক সুফল সম্পর্কিত নির্দেশনার উল্লেখ দেখা যায়। লিপির বক্তব্য উপস্থাপনের প্রকৃতি অর্থাৎ কিরূপে লিপি খোদাই করতে হবে, তার পরিচয় যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আচারাধ্যায়ের রাজধর্ম-প্রকরণে উল্লিখিত আছে।[৪২] সাধারণত লিপির শেষাংশে, লিপির উদ্দেশ্য ব্যাহতকারী বা অন্যথাকারীর প্রতি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনার উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত সময়ে লিখিত প্রস্তরশাসন, তাম্রশাসন বা পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন উপমা সহযোগে এই সকল ভর্ৎসনা দেয়া হয়েছে; যেমন—

স্বদত্তা ম্পরদত্তা ম্বা যো হরেত বসুন্ধরাম [।]
স বিষ্ঠায়াং কৃি(কৃ)মি ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥[৪৩](প্রাচীনকাল)

অর্থাৎ ভূমি স্বদত্ত-ই হোক, আর অন্যদত্ত-ই হোক, যে এটি হরণ করবে, সে বিষ্ঠার কৃমি হয়ে পিতৃগণসহ পচতে থাকবে।

যত্নেন লিখিতং বেদং যশ্চোরয়তি পুস্তকম্।
শুকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গর্দভ ॥[৪৪](মধ্যযুগ)

অর্থাৎ সযত্নে লিখিত এগ্রন্থ যে ব্যক্তি চুরি করবে, তার মা শূকরী এবং বাবা গর্দভ হবে।

প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য-শিল্পে লিপিযুক্ত মূর্তি বা মূর্তিলেখ অপ্রতুল নয়। কিন্তু সেখানে মূর্তি-ই প্রধান উপজীব্য, লিপি গৌণ। আলোচ্য লিপিতে তিনটি প্রাণীর মূর্তি অঙ্কিত হলেও, বস্তুত এটি মূর্তিলেখের শ্রেণীভুক্ত নয়; কারণ এখানে দান সম্বলিত বক্তব্যই মুখ্য উপজীব্য। দানের অনুশাসন-বাণী উপস্থাপনের জন্য এখানে মূর্তিগুলি রূপক অর্থে খোদিত হয়েছে। এরূপ প্রতীকী বক্তব্য অর্থাৎ মূর্তি বা ভাস্কর্য খোদাইয়ের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপনের নমুনা আরও কিছুকিছু লিপিতে লক্ষ করা যায়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলো সোমেশ্বরদেবের সময়কার নরসিংহদেবের 'দন্তেশ্বরী গুডি ইনসক্রিপশন'। এতে চিত্রের মাধ্যমে অভিসম্পাত বাণী, যথা, গাভী ও বাছুর, সূর্য ও চাঁদ, শিব

---

[৪১] *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal*, Letters, Vol. VII, 1941, p.218, and Vol. XVI, p.247.

[৪২] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *গৌড়লেখমালা* (রাজশাহী : বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৩১৯), পৃ. ৩।

[৪৩] রাধাগোবিন্দ বসাক, 'নবাবিস্কৃত তাম্রশাসন (ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব-লিপি)' *সাহিত্য*, কলিকাতা, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৯, পৃ. ৩৮১-৩৯৯।

[৪৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ২৫৯৮; উদ্ধৃত, কল্পনা ভৌমিক, *পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৪৬।

প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গাভী ও বাছুরের চিত্র দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, দুগ্ধ পানরত বাছুরকে তার মাতার নিকট থেকে বিচ্যুত করলে যে-পাপকর্ম হবে, প্রদত্ত দানের অন্যথা করলেও সেরূপ গুরুতর পাপ সংঘটিত হবে। সূর্য ও চাঁদের প্রতীক দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সূর্য ও চাঁদ যতদিন তাদের ঔজ্জ্বল্য দান করবে, ততদিন ঐ দান অক্ষুণ্ণ রবে। শিবের মূর্তি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, উক্ত দানকে মহাদেব শিব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।[৪৫]

আলোচ্য লিপিতে ৩টি প্রাণীর, যথা—গাধা, শূকরী এবং উটের চিত্রসম্বলিত অভিসম্পাত বাণী বেশ তাৎপর্যবহ। গাধাকে সাধারণত চরম বোকা বা জড়বুদ্ধি প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হয়। একারণে আমাদের দেশে কাউকে চরমভাবে তিরস্কার করতে 'গাধা' বা 'গাধার বাচ্চা' বলে সম্বোধন করা হয়। এদেশীয় সংস্কৃতিতে শূকর বা শূকরীকেও হীন অর্থে প্রকাশ করা হয় এবং লোভী পাশব প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে শূকর আখ্যা দেওয়া হয়।[৪৬] 'শুয়োরের বাচ্চা' বলে এদেশে নিকৃষ্ট গালিও প্রচলিত রয়েছে। লিপির পাদদেশের ডান পাশে চিত্রিত শূকরীর উপর উপগত গাধার চিত্রণ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এই দানের যে অন্যথা করবে, তার পিতা গর্দভ বলে বিবেচিত হবে এবং সে শূকরী মাতাতে গমন করবে [যঃ কশ্চিদান্যথা কুরুতে। তষ্যদৃষ্টেণ। শ্রীমদ্দেবপাদাঃ। অনুরাদত্তা। গর্দ্ধভঃ পিতা। গন্ত্ত ষূকরী (?)][৪৭]। সুতরাং গাধা ও শূকরীর শঙ্কর মৈথুনের মূর্তি দ্বারা এখানে অত্যন্ত গর্হিত পাপাচারণ এবং অস্বাভাবিক কলুষিত ভবিষ্যত জীবনের অভিসম্পাত চিত্রিত হয়েছে। শিলালেখতে এইরূপ গর্দভ ও শূকরীর উপগমন-দৃশ্য সচারোচর পরিলক্ষিত না হলেও, অশোকাচল্ল দেবের বোধগয়া লিপির পাদদেশে শূকরীর উপর উপগত গাধার একটি মূর্তি[৪৮] এবং সোমেশ্বর দেবের সময়কালীন কুরুশপালের একটি শাসনে অনুরূপ একটি দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে; যেখানে বলা হয়েছে 'যো অন্যথা করোতি তস্য পিতা গর্দভ শূকরী মাতা'।[৪৯] আপাতদৃষ্টিতে এই ধরনের চিত্রণ বিকৃত যৌনতার প্রতীক বলে মনে হতে পারে এবং বিখ্যাত লিপিতাত্ত্বিক বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই চিত্রকে অশ্লীল চিত্র বলে উল্লেখ করেছেন।[৫০] বস্তুত এতে শিলানুশাসনের অন্যথাকারীর প্রতি অভিসম্পাত বাণীর চিত্রায়ণই পরিস্ফুটিত।

এই লেখটিতে উটের মূর্তিটিও তাৎপর্যবহ। উট সাধারণত শান্তিপ্রিয়, নিরীহ, কষ্টসহিষ্ণু ও দ্রুতগামী প্রাণী; মরু-পথিককে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একে মরুভূমির জাহাজও বলা হয়ে থাকে। আরব-বিশ্বে উটের উপস্থিতি সর্বাধিক হলেও, পৃথিবীর অপরাপর অঞ্চলেও উট দেখা যায়। উত্তরভারতে উটকে তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হয়। কিছু কিছু সংস্কৃত প্রবচনে উটের চিত্রকে লোভী, মূঢ়, বা অস্পৃশ্যরূপে নির্দেশিত করা হয়ে থাকে।[৫১]

---

[৪৫] Hiralal, 'The Dantesvari Gudi Inscription of Narasimhadeva', *Epigraphia Indica* vol. IX, 1907-8, p. 164.

[৪৬] *Ibid.*, p. 918.

[৪৭] পঙ্‌ক্তি ৫-৬।

[৪৮] Vinoda Vihari Vidyavinoda, 'Two Inscriptions From Bodh-Goya', *Eigraphia Indica*, vol. XII, 1913-14, p. 29, pl. 6.

[৪৯] Rai Bahadur Hira Lal, 'Two Kuruspal Inscriptions of Dharana-Mahadevi of the Time of Somrsvaradeva', *Epigraphia Indica,* vol. X, 1909-10, Line-15, pp. 31-34.

[৫০] Vinod Vihari Vidyavinod, 'Two Inscriptions From Bodh-Goya', *Eigraphia Indica*, vol. XII, 1913-14, p. 29, footnote 22.

[৫১] James Hastings (ed.), *Encyclopaedia of Religion and Ethics,* vol. III, 1910, pp. 173-175.

মূল্যায়ন

প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় উট নিতান্তই অনুপস্থিত। প্রাচীন বাংলার প্রস্তর ভাস্কর্য-শিল্পেও উটের ডেপিকশন লক্ষ করা যায় না। তবে পাল আমলে নির্মিত পাহাড়পুরের টেরাকোটা শিল্পে উটের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে;[৫২] সেখানে জাতকের কাহিনী বর্ণনার লক্ষ্যে উটের মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। কিন্তু রাজভিটা শিলালেখে উল্লিখিত উটের মূর্তিটি অস্পৃশ্য অর্থে খোদিত হয়েছে। আমরা জানি, পাল রাজত্বের প্রথম পর্যায়ে ধর্মপাল ও দেবপাল গৌড়সহ বিশাল ভারতের অধীশ্বর ছিলেন; দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ম মহীপাল পাল-রাজ্যের হৃত অংশ পুনরুদ্ধার করে বারাণসী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত করেন এবং উত্তরভারতের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ শাসন করেন। একারণে প্রথম মহীপালের রাজ্যাভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটে এবং বাংলার ভাস্করগণ ভারতের মরু অঞ্চলের ভাস্কর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উটের চিত্রায়ণ করে থাকতে পারেন। এদিক থেকে বলা যায় যে, আলোচ্য লিপিতে উটের চিত্রায়ণ বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রার সংযোজন।

পাল রাজবংশের বিভিন্ন রাজার সীলমোহরে ধর্মচক্রের প্রবর্তন এবং তাঁদের 'পরমসৌগত' (অর্থাৎ সুগত বা বুদ্ধের পরম ভক্ত) উপাধিধারণ দৃষ্টে তাঁদেরকে বৌদ্ধ ধর্মালম্বী বলা হয়ে থাকে। তবে তাঁরা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেও মনে করা হয়। উপরন্তু, পালরাজগণের মধ্যে কেউ কেউ বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্র সরকার উল্লেখ করেছেন যে, নারায়ণ পাল, ১ম মহীপাল ও নয়পাল বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন।[৫৩] অবশ্য, ১ম মহীপালের রাজত্বের প্রথম দিকের শাসনসমূহের আলোকে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি পরমসৌগত ও বুদ্ধভট্টারকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু বাণগড় প্রশস্তি থেকে জানা যায়, শিবাধ্যুষিত ভবানীর মন্দির সংবলিত বিখ্যাত 'গোলকী শৈবমঠ' তিনি জনৈক ইন্দ্রশিবকে দান করেছিলেন। এছাড়াও তিনি বারাণসীর কঠোরপন্থী পাশুপত গুরব (শৈবাচার্য বা পুরোহিত) বামরাশির একজন ভক্ত ছিলেন বলে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ সারনাথ মূর্তিলেখ হতে জানা যায়। এতে ১ম মহীপালের শৈব ও শাক্ত ধর্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।[৫৪]

রাজভিটা শিলালিপি থেকেও আমরা ১ম মহীপালের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার তথ্য অবগত হই। এই লিপিতে মাধবের (কৃষ্ণের) পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারি ও নারিকেল বাগান থেকে নির্দিষ্ট হারে ফল প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাংলায় বিপুল সংখ্যক বিষ্ণুমূর্তি প্রাপ্তির সাক্ষ্যে আমরা জানি, ৮ম শতাব্দী থেকে ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত এখানে বৈষ্ণবধর্ম বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। আর, সেই সময় বৈষ্ণবধর্মে কৃষ্ণ-লীলার প্রাধান্য ছিল ব্যাপকরূপে।[৫৫] সুতরাং কৃষ্ণের পূজা প্রচলন বা পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য ১ম মহীপাল রাষ্ট্রীয়ভাবে আনুকূল্য প্রদান করেছিলেন বলে আমরা রাজভিটা প্রস্তরলিপি থেকে অবগত হতে পারি।

রাজভিটা প্রস্তর লিপি একটি দানপত্র। ১ম মহীপালের বেশকিছু মূর্তিলেখ পাওয়া গেলেও, এরূপ ভাস্কর্য-খোদিত লিপি ইতিপূর্বে আর পাওয়া যায়নি।

---

[৫২] দ্রষ্টব্য, K.N. Dikshit, *MASI*, No.55 (Delhi : Manager of Publications, 1938), p.68, pl.LIII (b); Varendra Research Museum, *Accession Regitar of Antiquities*, No.1, Rajshahi, Acc. No.2184.

[৫৩] দীনেশচন্দ্র সরকার, *পাল সেনযুগের বংশানুচরিত*, পৃ. ১৫৪।

[৫৪] *তদেব*, পৃ. ১৫৪-৫৫।

[৫৫] রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ১৮৫।

নিছক শিলালেখ ও তাম্রশাসনের ভিত্তিতে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার পথ-প্রবর্তন হয়েছিল বিংশ শতকের প্রথম দশকের পর থেকে। বস্তুত এরপর থেকে আজতক প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের দ্বারা প্রাচীন ইতিহাসের যে পথ-পরিক্রমা, সেখানে শিলালেখ ও তাম্রশাসন-ই প্রধান অবলম্বন। কারণ, সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিতম ব্যতীত ইতিহাসের অন্য কোনো প্রত্যক্ষ সাহিত্যিক উপকরণ আজও আবিষ্কৃত হয়নি। সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পালরাজবংশের অন্যতম নৃপতি প্রথম মহীপাল দেবের নামাঙ্কিত এই রাজভিটা শিলালেখটিও ইতিহাসের অন্যতম উৎস হিসেবে গৃহীত হতে পারে বলে আমরা মনে করি।

প্রথম মহীপালের রাজভিটা শিলালিপি

প্রথম মহীপালদেবের রাজভিটা লিপি

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২

উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০) : বাংলাদেশ রেজিমেন্টের ভূমিকা

মো. ফজলুল হক*

Abstract : Middle East is situated in a meeting place of three continents, and it is the most important proprietress of the 3/4th reserved oil and 1/4th unrefined oil. Above all, it is the center of the three most important religions of the worldly, namely, Judaism, Christianity and Islam. So any incident of Middle East creates repercussion in the whole world. Bangladesh is also not outside of it. Because Bangladesh is closely related to the Muslim counties of the Middle East, Iraq's attack on Kuwait in 2nd August 1990 created a lot of upheaval in Bangladesh's political, economic and social life. Under the pressure of the word poseurs, the Government of Bangladesh sent military in multinational force to free Kuwait. This significant decision created good image of Bangladesh for its diplomatic relations with powerful countries. This article thus attempts to evaluate the role of Bangladeshi unit in multinational force.

১. ভূমিকা

মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণগুলোর মধ্যে ইসলামি মৌলবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ এবং তেল সম্পদ অন্যতম। এসব সংকটের বিস্তার ব্যাপক। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকটে ইসলামি মৌলবাদ নতুন না হলেও আয়াতুল্লাহ খোমেনীর মাধ্যমে তা নতুন মর্যাদা লাভ করে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের উৎপীড়িত জনগণের নিকট ইসলামি মৌলবাদ মারাত্মক রূপ ধারণ করে এবং এর নামে অনেক বিপ্লব ঘোষিত হয়। এমনকি পশ্চিমা শক্তিগুলো সাবেক সোভিয়েত উনিয়নকে দমন করার জন্য মৌলবাদকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে বলে পর্যবেক্ষক মহলের অভিমত। অপরদিকে বিদেশি কর্তৃত্বের হাত থেকে মুক্তির জন্য আরব জাতীয়তাবাদের ধারণা জনসাধারণের চিন্তাভাবনার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসের ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং অপরাপর পরাশক্তিকে বাধা প্রদান করে সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র গঠন করেন। এ বিষয়টি আরব লেখকগণ অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করার ফলে আরব জাতীয়তাবোধ উপনিবেশ বিরোধী প্রবণতার পরিবর্তে পারস্পরিক আত্মকলহের সৃষ্টি করে। মধ্যপ্রাচ্য সংকটের মূলে ইসলামি মৌলবাদ এবং আরব জাতীয়তাবাদ যতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে, তারচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছে তেল সম্পদ। কারণ তেল এমন একটি সম্পদ যা বিশ্ব বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক যোগাযোগের চাবিকাঠি। প্রধান তেল

* ড. মো. ফজলুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উৎপাদক এবং ভোক্তারা ভৌগোলিক দিক থেকে পৃথক হলেও তেল উত্তোলন, বাজারজাতকরণ এবং কোটা নির্ধারণে স্ব-স্ব স্বার্থের প্রভাব বিস্তার করায় মধ্যপ্রাচ্য সংকটের সৃষ্টি হয়েছে বহুলাংশে। তাছাড়া আরব-ইসরাইল দীর্ঘ দিনের বিবাদ, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ, হাইড্রোপলিটিক্স, সীমানা বিরোধ, আধুনিকীকরণ, গোঁড়া ধর্মীয় বিশ্বাস, অর্থনৈতিক সুবিধা এবং আত্মকলহ এ সবগুলোই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকটের জন্য কোনো না কোনোভাবে দায়ী। তবে নতুন বিশ্ব রাজনৈতিক সম্পর্ক অবশ্য এ সমস্যা সমাধানে ঐক্যমত পোষণ করে।

এই সংকট শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরিণত হয়। আমেকিার প্রেসিডেন্ট বুশের আবেদনক্রমে জাতিসংঘের অনুরোধ যৌথ বাহিনী গঠিত হয়। এই যৌথ বাহিনীতে বাংলাদেশ রেজিমেন্টও যোগদান করে এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২.পটভূমি

২.১: উপসাগরীয় যুদ্ধের পটভূমি

১৯৯০ সালের ২রা আগস্ট ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের মাধ্যমে সৃষ্ট উপসাগরীয় সংকট বিশ্ব রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি করে। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বের আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ এবং তার আগ্রাসন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সামরিক শক্তি বিন্যাসে কি ধরনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০) তার জ্বলন্ত উদাহরণ। মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাই প্রথম বারের মতো চীন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রকে একই অবস্থানে থেকে ভোট দিতে দেখা গেছে। সামরিক তৎপরতা সমন্বয় প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি দেশের প্রতিনিধিদের এক নজিরবিহীন বৈঠক অনুষ্ঠান এক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। ইরাকের সামরিক সুহৃদ সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরাকের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের উদ্যোগে যৌথ বাহিনী গঠিত হলে সেখানে সৈন্য পাঠানোর ঘোষণা দেয়। উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে বরাবর বাণিজ্যিক সম্পর্ক রক্ষাকারী দেশ জাপান এবং কোনো রকম অর্থনৈতিক ও সামরিক জোটের বাইরে অবস্থানকারী নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে পরিচিত সুইজারল্যান্ড পর্যন্ত ইরাক প্রতিরোধের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। বন্ধুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতি অব্যাহত থাকলেও বাংলাদেশ সরকার ইরাকের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ইরাকের বিরুদ্ধে বিশ্ব রাজনীতির মূল শক্তির অবস্থানকে বেশি চাঙ্গা করে সৌদি আরবে সৈন্য পাঠানো সংক্রান্ত আরব লীগের সিদ্ধান্তে। ২১ সদস্য বিশিষ্ট আরব লীগের বৈঠকে ১২টি দেশ সৌদি আরবে সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেবল মাত্র ইরাক নিজে এবং পিএলও ভোট দান করে। জর্ডান, আলজেরিয়া, ইয়েমেন, সুদান, মৌরতানিয়া ভোট দানে বিরত থাকে এবং তিউনিসিয়া অনুপস্থিত থাকে।[১] ইরাকের বিরুদ্ধে এরূপ বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ ভূমিকায় নেতৃত্বদানকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র সফলভাবে তার কূটনৈতিক তৎপরতাকে কাজে লাগায়। বহির্বিশ্বের সঙ্গে ইরাকের যোগাযোগের একমাত্র খোলা আকাশ পথও বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র জর্ডানের ওপর চাপ প্রয়োগ করে।[২] উপসাগরীয় দেশগুলোর নিরাপত্তার আশু প্রশ্ন তুলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুযায়ী গঠিত বহুজাতিক বাহিনীতে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও সৈন্য প্রেরণ করে। বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশের এ স্পট এবং তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রাথমিক অবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশের এই প্রথম সঠিক বা ভুল যাই হউক না কেন একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত কূটনীতির ক্ষেত্রে গুণগত উত্তরণের এক নতুন মাত্রার সূচনা করে। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য প্রবন্ধটি রচিত।

---

[১] *The Gurdian*, U.K., 12 January, 1991, p.7.

[২] *New York Times*, U.K.17 November, 1990, p. 3-4.

বর্তমান ইরাক এবং কুয়েত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪) পূর্বে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বসরা প্রদেশের অংশ ছিল। ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থান অর্জনের জন্য ব্রিটেন কুয়েতের শাসক শেখ মোবারকের সাথে একটি গোপন সমঝোতা করে।[৩] ফলে তখন থেকেই কুয়েতে ব্রিটেনের আধিপত্য সৃষ্টি হয়।[৪] ১৯১৩ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্য অর্থনৈতিক সংকটে পড়ার কারণে কুয়েতের সাথে সমঝোতা সৃষ্টির জন্য ব্রিটেনের সাথে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।[৫] উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কুয়েতের শেখ ব্রিটিশকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন।[৬] এ সময়ে ইরাক সরকার ওয়ারবাহ্ ও বোবিয়ান দ্বীপদ্বয় এবং তৎসংলগ্ন উপকূল যুদ্ধের জন্য সুবিধাজনক হিসেবে উপলব্ধি করে। এমতাবস্থায় ইরাক কুয়েতকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে ইরাকের সাথে সংযুক্ত করা, অথবা শুধুমাত্র কুয়েতের দ্বীপগুলো এবং উপকূলীয় এলাকাগুলো ইরাকের সাথে সংযুক্ত করা, অথবা কুয়েতের নিকট থেকে কর আদায় করা ইত্যাদি ব্যাপারে ইরাক এবং ব্রিটেনের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৭] ফলে গ্রেট ব্রিটেন পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী সীমান্ত রেখা অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্রিটেন-কুয়েত চুক্তি ১৯৬১ সালে ঘোষিত হয়।[৮] কুয়েত স্বাধীন হয় ১৯৬১ সালের ১৯শে জুন।[৯] কিন্তু ইরাক উন্নয়নশীল উমকাসর বন্দরের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কুয়েতকে এবং বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলকে স্বীয় দেশের অধিভূক্ত করার জন্য দাবি অব্যাহত রাখে। কুয়েতিরা ৯৯ বছরের জন্য ওয়ারবাহ্ দ্বীপ লিজের কথা বিবেচনা করে এবং ১৯৬৬ সালে দুই দেশ একটা যুগ্ম সীমান্ত কমিটি গঠন করে।[১০] কিন্তু অনেক আলাপ আলোচনা এবং মতবিনিময়ের পরেও কোনো সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি এবং ১৯৭৩ সালে ইরাক প্রস্তাব দেয় যে বোবিয়ান দ্বীপ দুই ভাগে ভাগ করা হোক, যার পূর্ব অংশ থাকবে ইরাকের এবং পশ্চিমের অংশটি থাকবে কুয়েতের।[১১] ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা চলতে থাকে কিন্তু সমস্যা অমীমাংসিত থেকে যায়।

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন মনে করেছিলেন যে, আরববাসীরা তাঁকেই সবচেয়ে বেশি সমর্থন করে।[১২] কুয়েত এবং উপসাগরীয় অন্যান্য রাষ্ট্র হতে প্রচুর আর্থিক সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও ইরাকে বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সংকট ছিল প্রকট। কুয়েতের সাথে সীমান্ত বিবাদ পুনরায় আরম্ভের জন্য এটা ছিল ইরাকের জন্য উপযুক্ত সময়।[১৩]

এ দাবিগুলো ছাড়াও ইরাকের চিন্তাভাবনায় অপর দুইটি কারণ মারাত্মকভাবে কাজ করে। প্রথমত, কুয়েত ১৯৮৯ সালে ওপেক কোটার অতিরিক্ত তেল উত্তোলন করার ফলে তেলের মূল্য

---

[৩] Abdullah Yousef Al-Ghunaim, et al., *Kuwait Statehood and Boundaries* (Kuwait: Foundation for the Advanement of Sciences, 1992), p. 51.

[৪] *Ibid.* p. 64.

[৫] *Ibid.* p. 66.

[৬] *Ibid.* pp. 69-72.

[৭] Evan W. Anderson and Khalil H. Rashidian, *Iraq and Continuting Middle East Crists* (London: Pinter Publishers, 1991), p. 107.

[৮] *Ibid.* pp. 107-105.

[৯] Abdullah Yousef Al-Ghunaim, *op.cit.*, pp. 43-44.

[১০] A. G. Noorani, *The Gulf Wars Documents and Analysis* (Delhi: Konark Publishers Pvt. Ltd. , 1991), pp. 2-3.

[১১] Anderson and Rashian, *op.cit.*, p. 108.

[১২] *Ibid.*

[১৩] Anderson and Rashidian, *op. cit.*, p. 108.

স্বাভাবিক ভাবেই কমে যায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইরাক প্রতি ব্যারেল তেলের মূল্য ন্যূনতম ১৮ ডলার ধার্য করার প্রস্তাব করে। কিন্তু কুয়েত অতিরিক্ত তেল উত্তোলনের ফলে প্রতি ব্যারেলের মূল্য কমে মাত্র ১২ ডলারে দাঁড়ায়।[১৪] তাছাড়া সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরের ১২টি বৃহৎ তেলক্ষেত্রের মধ্যে রুমেইলা তেলক্ষেত্র অন্যতম। এর সীমানা ছিল বিতর্কিত। অধিকাংশ মানচিত্রে দেখা যায় সীমান্ত রেখা দ্বারা তেল ক্ষেত্রটির দক্ষিণ অংশ কাটা পড়েছে।[১৫]

এ সময়ে উমকাসরে বন্দর ও নৌঘাটি স্থাপনের পর ইরাক বোবিয়ান পেরিয়ে পাইপ লাইনের সাহায্যে সমুদ্র তীরবর্তী একটা তেল কেন্দ্র তৈরির জন্য কুয়েত সাগরে এবং কুয়েত রাজ্যে প্রবেশানুমতি দাবি করে।[১৬] কুয়েত এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে, কারণ কুয়েতের ভয় ছিল ইরাক হয়তো স্থায়ীভাবে কুয়েত দখল করে রাখবে। ১৯৭৩ সালের ২০শে মার্চ ইরাক উত্তর কুয়েতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে[১৭] এবং সামিতা (Samita) সীমান্ত খুঁটির চারপাশের এলাকাসহ বোবিয়ান দ্বীপ দখল করে ইরাক-কুয়েত সীমান্ত বন্ধ করে দেয়।[১৮] ১৯৭৫ সালের পর ক্রমান্বয়ে ইরাক-কুয়েত সম্পর্কের উন্নতি হয় এবং ইরাক কুয়েতের ওপর হতে তার দাবি যথারীতি প্রত্যাহার করে নেয়।[১৯]

পরবর্তীতে ইরাক-ইরানের ৮ বছরের যুদ্ধের সময় শাতিল-আরব এবং উমকাসর বন্দরটিকে অরক্ষণশীল বলে প্রমাণ করে। সুতরাং যুদ্ধ বিরতির পর ইরাক তেল রপ্তানি নিশ্চিত করার জন্য একটা নিরাপদ বন্দরের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর জন্য ইরাকের একমাত্র লক্ষ্যস্থান ছিল কুয়েতের ওয়ারবাহ্ এবং বোবিয়ান দ্বীপ। অধিকন্তু ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় ইরাক কুয়েতের নিকট থেকে প্রচুর টাকা ঋণ নিয়েছিল।[২০] ইরাকি প্রশাসন ১৯৯০ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রকাশ করে যে, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ইরাকের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শত্রুতা শুরু করেছে।[২১] ইরাকের এ ধরনের মনোভাবের জন্য পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহের তেলমন্ত্রীগণ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান কল্পে ১৯৯০ সালের ১লা আগস্ট জেদ্দায় এক আলোচনায় মিলিত হন। কুয়েত সরকার ইরাকের বেশকিছু দাবি মেনে নিতে সম্মত হলেও ইরাক কুয়েতের দ্বীপগুলো অধিকারের মানসিকতা পরিহার করতে পারেনি। জেদ্দা আলোচনার শেষ মূহুর্তে জাতিসংঘের লিখিত দলিলের মাধ্যমে সংকট নিরসনের প্রস্তাব আনীত হলেও ইরাক কৌশলে জেদ্দা সমঝোতা এড়িয়ে যায়।[২২] কারণ প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাকের পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সংকুলান করা এবং একই সাথে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদক দেশ হিসেবে ইরাকের অবস্থান সুদৃঢ় করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বিষয়টি কুয়েতের মনঃপূত হয়নি। কুয়েতের যুক্তি ছিল তেলের মূল্য বৃদ্ধি পশ্চিমা বাজারে তেল সরবরাহকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং পশ্চিমা দেশগুলো সেক্ষেত্রে তেলের বিকল্প জ্বালানি সম্ভাবনাকে যাচাই করতে শুরু করবে। এসব কারণে কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত তেল উৎপাদন ও রপ্তানি অব্যাহত রাখে। কিন্তু ইরাক মূল্য বৃদ্ধির যুক্তিতে ছিল অটল।

---

[১৪] *Ibid.* pp. 108-109.
[১৫] *Ibid.* p. 109.
[১৬] *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ঢাকা, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ১৭-১৮।
[১৭] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা , ১২ অক্টোবর, ১৯৯০, পৃ.১৩।
[১৮] *The Daily Observer*, Dhaka, 12 October 1990.
[১৯] *Ibid.*
[২০] http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ku.html. (24/11/2005).
[২১] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ২৫।
[২২] *The Daily Observer*, Dhaka, 21 November 1990.

২.২: ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল

এসব সমস্যা সমাধানের জন্য জেদ্দা আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পরই ২রা আগস্ট ১৯৯০ ইরাক সামরিক অভিযান চালিয়ে কুয়েত দখল করে নেয়।[২৩] তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে ইরাক অভিযোগ উত্থাপন করে যে, ওপেক নির্ধারিত কোটা লঙ্ঘন করে কুয়েত বিপুল পরিমাণ তেল বাজারে ছাড়ার কারণে ইরাকের ১৪ শত কোটি ডলার আর্থিক ক্ষতি হয়। তাছাড়াও ইরাক কুয়েতের বিরুদ্ধে রোমেইলা তেলক্ষেত্র হতে ২৪০ কোটি ডলার মূল্যের তেল চুরির অভিযোগ আনে।[২৪] ইরাক কুয়েতকে তার ১৯তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করে নিজ রাষ্ট্রভুক্ত করে।[২৫] ইরাকের সরকারি সংবাদপত্র 'আল জুমহুরিয়া' কুয়েতকে ইরাকের একটি প্রদেশ এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় ইরাকি শহর বসরার প্রশাসিনিক সীমানা উপসাগরের দিকে আরো সম্প্রসারিত করার ঘোষণা সংবলিত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের দুটি ফরমান প্রকাশ করে। উক্ত ফরমানে কুয়েতকে কাজিমাহ, আলজাহরা এবং আল-ফিদা—এ তিনটি জেলায় ভাগ করার কথা বলা হয়। আল ফিদা কুয়েতী শহর আল হামাদীর নতুন নাম বলেও ফরমানে উল্লেখ করা হয়।

জাতিসংঘ ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অত্যন্ত দ্রুত। প্রথমদিনেই নিরাপত্তা পরিষদ জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়ে অবিলম্বে কুয়েত থেকে ইরাককে সৈন্য প্রত্যাহারের আহবান জানিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২৬] দ্রুত গতিতে ইরাক-কুয়েত সংকট বিস্তার লাভ করতে থাকে। সৌদি আরবে আশ্রয় গ্রহণ করে কুয়েতের আমীর শেখ জাবের আল-আহমেদ আল-জাবের আস-সাবাহ ইরাকের আগ্রাসন হতে কুয়েতকে মুক্ত করার জন্য বিশ্ববাসীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ইরাকের কুয়েত দখলকে আগ্রাসন বলে বিবৃতি প্রদান অব্যাহত রাখে। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের পর সৌদি আরবে ইরাকের সম্ভাব্য আক্রমণের আশংকায় সৌদি বাদশা আমেরিকার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

২.৩: বহুজাতিক বাহিনী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশ (George Herbert Walker Bush) ইরাকের আগ্রাসন থেকে কুয়েতকে মুক্ত করার জন্য বহুজাতিক বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করেন। ৭ই আগস্ট (১৯৯০) প্রেসিডেন্ট বুশ উপসাগরে মার্কিন বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেন।[২৭] প্রেসিডেন্ট বুশের নির্দেশে আমেরিকান জেনারেল নরম্যান সোয়ার্জকফকে প্রধান অধিনায়ক করে বহুজাতিক বাহিনী গঠন করা হয়।[২৮] ইরাকের আগ্রাসন থেকে কুয়েতকে মুক্ত করার জন্য জর্জ বুশ বহুজাতিক বাহিনীতে অংশ গ্রহণের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানান।[২৯] এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ সম্মিলিত আরব বাহিনীতে অংশ গ্রহণ করে। বহুজাতিক বাহিনী উপসাগরীয় যুদ্ধের মহা-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত তিনটি মূল লক্ষ্য[৩০] হলো : প্রথমত, প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা অথবা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা; দ্বিতীয়ত, শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা এবং অবিলম্বে যুদ্ধবন্দী বিনিময়

---

[২৩] *Ibid.*
[২৪] সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ২ ডিসেম্বর, ১৯৯০, পৃ: ২১-২২।
[২৫] সাপ্তাহিক রোববার, ঢাকা, ১৬ সেপ্টেম্বর , ১৯৯০, পৃ. ১৮।
[২৬] তদেব।
[২৭] দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ২৯ আগস্ট,১৯৯০, পৃ. ১।
[২৮] দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ২৯ আগস্ট,১৯৯০, পৃ. ১।
[২৯] তদেব, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ১।
[৩০] সাপ্তাহিক রোববার, ঢাকা, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ২১।

করা; এবং তৃতীয়ত, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ জনসমষ্ঠির পুনর্বাসন ও যুদ্ধ-বিধস্ত দেশের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

উপসাগরীয় যুদ্ধে বহুজাতিক বাহিনীর মুখ্য সংগঠন ও প্রধান অধিনায়ক[৩১]

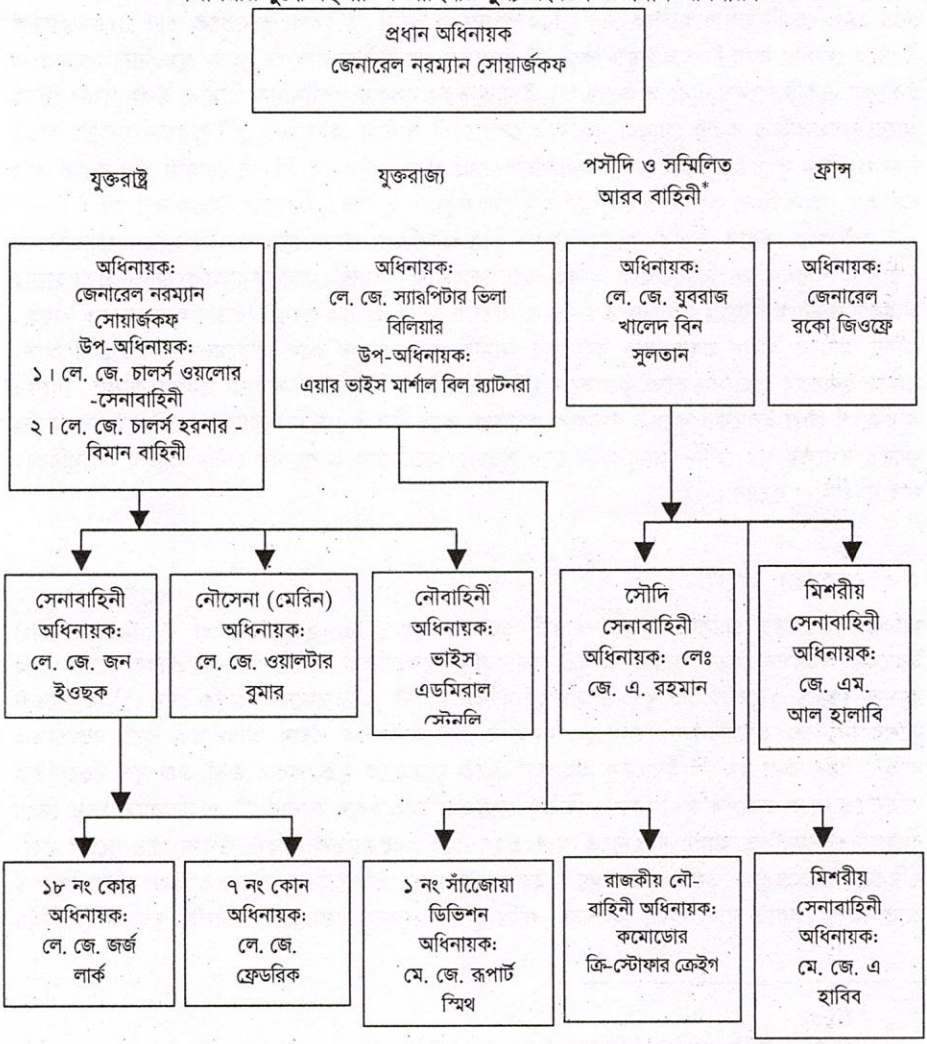

টীকা
*সৌদি আরব, বাহরাইন, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, বাংলাদেশ।

[৩১] http://www.army.mil/cmh-pg/books/www/windx.htm (২৫/১১/২০০৫)

২.৪: কুয়েত দখলের প্রতিক্রিয়া

এদিকে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উপসাগরীয় যুদ্ধে মুসলিম বিশ্ব মূলত দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জর্ডান, পিএলও, ইয়েমেন, আলজেরিয়া, লিবিয়া, সুদান এবং ইরান সমর্থন করে ইরাককে।[৩২] তবে এসব রাষ্ট্র ইরাককে সমর্থন করলেও তেমন কোনো কার্যকর সহযোগিতা করেনি। অপরদিকে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, মিশর, তুরস্ক, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশসহ বেশ কিছু রাষ্ট্র সর্বতোভাবে সমর্থন করে কুয়েতকে।[৩৩] ২৯শে নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ১২-২ ভোটে গৃহীত প্রস্তাবে কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য ইরাককে ৬ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ে ইরাক সৈন্য প্রত্যাহার না করলে বহুজাতিক বাহিনীকে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত প্রদান প্রদান করা হয় (সিদ্ধান্ত নং ৬৬০)।[৩৪]

বহুজাতিক বাহিনীর ক্রমাগত সমরসজ্জা অন্যদিকে ইরাক স্বদেশে এবং কুয়েতে তার সেনাবাহিনীর অবস্থান গ্রহণ যুদ্ধেরই ইঙ্গিত বহন করে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তাঁর নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের এক অধিবেশনে ঘোষণা করেন, ইরাক তার মাটি থেকে জেরুজালেম ও অন্যান্য পবিত্র স্থান মুক্ত করার লড়াই শুরু করবে। এ ঘোষণায় আরো বলা হয়, কুয়েতের অবস্থান থেকে ইরাকের পিছিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই।[৩৫] পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকের বিবৃতির প্রেক্ষিতে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে, বাগদাদের ওপর প্রয়োজন হলে আমেরিকাই প্রথম আঘাত করবে। তবে জাতিসংঘ কর্তৃক অবরোধের সুফল সম্পর্কে তিনি আশাবাদী।[৩৬] প্রেসিডেন্ট বুশ এবং সাদ্দাম হোসেনের এ ধরনের কথোপকথন থেকে অনুমান করা যায় উভয়েই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল।

৩. বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতা

স্বাধীনতা লাভের পর আরব দেশগুলোর মধ্যে ইরাক এবং কুয়েত বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে। ইরাকের সাথে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কারণ ভারতের সাথে বরাবর ইরাকের সম্পর্ক ভালো ছিল। যেহেতু ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সহযোগিতা প্রদান করে, সে কারণেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে ইরাক প্রথমেই স্বীকৃতি প্রদান করেছিল বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি পাকিস্তানকে সমর্থন এবং সহযোগিতা প্রদান করে। ইরাক ছিল মার্কিন বিরোধী; কাজেই ইরাকের সমর্থন পাকিস্তানের বিপক্ষে এবং বাংলাদেশের স্বপক্ষে হওয়াই স্বাভাবিক। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময়ে উভয় দেশের সাথে বাংলাদেশ ভারসাম্যমূলক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তবে ইরাক-ইরান যুদ্ধে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেও ইরাকের দিকেই বাংলাদেশের সহানুভূতি ছিল বেশি। কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে, সম্ভবত এসব কারণেই ইরাক বাংলাদেশের সম্ভাব্য সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করে যা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত। বাংলাদেশের যে কোনো প্রকার দুর্যোগে ইরাক সব সময়ই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের দক্ষ-অদক্ষ জনশক্তিকে ইরাক সরকার কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। কাজেই স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ইরাকের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক

---

[৩২] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা, ১ মার্চ ১৯৯১।
[৩৩] *তদেব*।
[৩৪] *তদেব*।
[৩৫] *তদেব*।
[৩৬] *সাপ্তাহিক সন্দীপ* (ঢাকা), ১৮-২৪ মার্চ, ১৯৯১ পৃ. ১৩।

সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। কিন্তু ২রা আগস্ট ১৯৯০ ইরাক প্রতিবেশী রাষ্ট্র কুয়েত দখল করলে বাংলাদেশ ইরাকের সাথে কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি।

পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে পূর্ণ স্বীকৃতি দানকারী রাষ্ট্র কুয়েতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কুয়েত সরকার প্রথম থেকেই সর্বপ্রকার সহযোগিতা অব্যাহত রাখে। ১৯৮২-১৯৯০ সালের মধ্যে কুয়েত হতে বাংলাদেশে যে বেসরকারি আর্থিক সাহায্য এসেছে তার পরিমাণ প্রায় পাঁচ কোটি টাকারও বেশি।[৩৭] ফলে দুদেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নিদর্শন হিসেবে বাংলাদেশ বিমানবহরকে সম্প্রসারিত করার জন্য কুয়েত সরকার একটি বোয়িং ৭০৭ বিমান উপহার দেয়। তাছাড়া বাংলাদেশের পল্লী বিদ্যুতায়নে সাহায্য প্রদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল নির্মাণ বাংলাদেশের প্রতি কুয়েতের বদান্যতারই প্রমাণ।

উপসাগরীয় সংকটের সুচনাই ছিল বাংলাদেশের জন্য এক চরম দুঃসংবাদ। এ সংকটের ফলে বাংলাদেশের প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার নাগরিক ইরাক এবং কুয়েতে আটকা পড়ে। এদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং পুনর্বাসন বাবদ যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অশনি সংকেত লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি উপসাগরীয় সংকট বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতি প্রবাহের ওপরই শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, এদেশের রাজনীতিতেও ব্যাপক প্রভাব ফেলে। মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা সকল রাজনৈতিক কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলো উপসাগরীয় সংকট নিয়ে যত রিপোর্ট, ফিচার, প্রবন্ধ, উপ-সম্পাদকীয় এবং সম্পাদকীয় লিখেছেন, সংশ্লিষ্ট এলাকার পত্র-পত্রিকাগুলো এ রকম ভিন্নধর্মী লেখালেখি করেছে কিনা সন্দেহ। অপর দিকে বন্ধুপ্রতিম আরব দেশগুলোর দ্বিধা-বিভক্তির মাঝে বাংলাদেশের জন্য নতুন সংকট বয়ে আনে তা হলো 'রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রশ্ন' উপসাগরীয় সংকটে বাংলাদেশের ভূমিকা কি হবে ?

এমতাবস্থায় উপসাগরীয় সংকট বাংলাদেশের জন্য একটি কূটনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ইরাক-কুয়েত ভাতৃপ্রতিম দুটি দেশই বাংলাদেশের প্রতি সংবেদনশীল। তবে যে বিবেচনায় বাংলাদেশ কূটনৈতিক সমর্থন দিয়েছে, তাহলো জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য। ফলে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে আন্তর্জাতিক সমস্যায় বাংলাদেশ জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী কুয়েতের প্রতি কূটনৈতিক সমর্থন প্রদান করে এবং ইরাকের আগ্রাসনের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে। কারণ বাংলাদেশ একটি ছোট্ট রাষ্ট্র, যে কারণে কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যায় বাংলাদেশের জাতিসংঘ সনদের প্রতি আনুগত্য থাকাই স্বাভাবিক।

জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে বাংলাদেশ সরকার ইরাকি আগ্রাসনের নিন্দা, কুয়েত হতে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহার এবং আল সাবাহ পরিবারের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন কামনা করে বিবৃতি প্রদান করে । এর মাত্র কয়েক দিন পর সৌদি বাদশাহ্ ফাহদের বিষেশ দূত সৌদী আরবকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রেরণের অনুরোধ জানান। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেন যে, বাদশাহ্ ফাহদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সৌদি আরব রক্ষাকারী আন্তর্জাতিক বাহিনীতে বাংলাদেশ প্রতীকী সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে।[৩৮]

---

[৩৭] *তদেব* ।

[৩৮] *সাপ্তাহিক বিক্রম*, ঢাকা, ১০-১৬৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ১৬।

উপসাগরীয় সংকটে এরশাদ সরকারের এ সিদ্ধান্ত দেশে-বিদেশে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে নতুন পরীক্ষার মাঝে ফেলে দেয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল প্রেসিডেন্ট এরশাদের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। নতুন আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে ইরাক বাংলাদেশকে তার বৈরী বলয়ে আবিষ্কার করে। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য সংকটজনিত প্রতিকূলতায় এরশাদ সরকারের জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রত্যাবসান ও অর্থনৈতিক চাপ সামলানো। মধ্যপ্রাচ্যে অবরুদ্ধ ১ লক্ষ ২০ হাজার নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদান এবং তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে অভূতপূর্ব সমস্যায় পড়তে হয় সরকারকে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ সরবরাহ বন্ধ, তেলের মূল্য বৃদ্ধি দরিদ্রতম বাংলাদেশের ভঙ্গুর অর্থনীতির জন্য প্রবল হুমকি হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে সকল বিরোধী দলগুলোর রাজনীতি গুটিয়ে পড়ে নিছক প্রতিবাদের মধ্যে। জাতির সংকটকালীন অবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থা ও গ্রহণযোগ্যতার হ্রাস বৃদ্ধির প্রেক্ষিত নির্মাণ করে। যদিও মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ফলে দেশের উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় সাহসী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দল-মত নির্বিশেষে অনুকূল ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিক মধ্যস্থতা রক্ষায় ব্যর্থ হবার ফলে বিরোধী দলগুলো কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ বিবৃতি প্রদানের ভূমিকাতেই নিজেদের আটকে রাখে।

৪. বাংলাদেশ রেজিমেন্টের ভূমিকা

ইরাক কর্তৃক দখলকৃত কুয়েতকে মুক্ত করা এবং সৌদি আরবে সম্ভাব্য ইরাকি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য গঠিত আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীতে বাংলাদেশ সরকার সেনাবাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরাসরি সৌদি আরবের পক্ষাবলম্বন করে। ফলে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ অতীতের ন্যায় মধ্যস্থতার ভূমিকা পালনের গ্রহণযোগ্যতা হারায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান ই লামি সম্মেলন সংস্থার বিশেষ শান্তি মিশনের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে মুসলিম বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। কিন্তু ইরাক-কুয়েত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্য নীতি থেকে কিছুটা ভিন্ন অবস্থানে ছিল, যে কারণে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মধ্যস্থতার ফলাফল সর্ম্পকে যথেষ্ট আশাবাদী হওয়ার সুযোগ ছিল না। যদিও প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে পরামর্শ করে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশের কূটনীতি সফল করার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ২৮শে আগস্ট ১৯৯০ সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান এবং সৌদি আরব সফর কারেন। ২৯শে আগস্ট সৌদি বাদশাহ্ ফাহদ বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা সফল করার জন্য একটি সৌদি রাজকীয় বিমান ব্যবহারের সুযোগ দেন। ৩০শে আগস্ট সৌদি বিমান যোগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা আসেন এবং প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করে তাঁর বার্তা নিয়ে দক্ষিণ এশীয় নেতৃবর্গের সাথে আলোচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৩৯]

বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৯০ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট' সৌদি আরবে অবস্থানরত বহুজাতিক বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে।[৪০] ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ২,২৯৫ জন বাংলাদেশী সৈন্য সৌদি আরবে বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করে। সৌদি আরবের কিং ফাহাদ মিলেটারি সিটিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শিবির স্থাপন করে। কিং ফাহদ মিলিটারি সিটির প্রধান ভবনে বাংলাদেশ সেনাদলের মূল অফিস স্থাপন করা হয়। এ অফিসের

---

[৩৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৩৩ আগস্ট, ১৯৯০, পৃ. ১।

[৪০] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ২৫।

দায়িত্বে ছিলেন সৌদি-বাংলাদেশ প্রধান সামরিক সমন্বয়কারী মেজর জেনারেল কে.এম.আব্দুল ওয়াহেদ, কামান্ডিং আফিসার ব্রিগেডিয়ার মাসুম হাসান চৌধুরী, ডেপুটি রিজিওনাল কমান্ডার কর্নেল জুবায়ের সিদ্দিকী ও মেজর আশরাফ। ২,২৯৫ জন সৈন্যের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করে একটা ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন, একটা ইঞ্জিনিয়ারিং রেজিমেন্ট, দুটো ফিল্ড হাসপাতাল, একটা সাপ্লাই ও ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি। উল্লেখ্য, ফিল্ড হাসপাতাল-গ্রুপ প্রয়োজনবোধে পঞ্চাশ বেডের দুটো হাসপাতাল চালাতে পারে এমনভাবে গঠন করা হয়েছিল। পদাতিক বাহিনীর সৈন্যগুলো হলো সিনিয়র টাইগারস অর্থাৎ ফাস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।[৪১] এ রেজিমেন্টের রয়েছে বিরোচিত ঐতিহ্য যার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ১৯৬৫ সালে খেমকরনের যুদ্ধে এবং ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে।

বাংলাদেশী সৈন্য সৌদি আরবে অবস্থানকালে সৌদি-বাংলাদেশ প্রধান সামরিক সমন্বয়কারী মেজর জেনারেল কে.এম.আব্দুল ওয়াহেদ সাপ্তাহিক বিচিত্রার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, 'কোনো রকম ভূমিকায় আমরা থার্ড কান্টির ভেতর যাব না। সাদ্দাম হোসেন সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি না এবং এতে বাংলাদেশ সেনাদলের কোনো ভূমিকা থাকবে না, ইরাক আক্রমণে আমরা যাব না'। তিনি আরো বলেন, 'সৌদি সরকারের সঙ্গে আমাদের সরকারের যে মত-বিনিময় হয়েছে তাতেও বলা হয়েছে যে, আমরা ডিফেন্সিভ কৌশলে সৌদি আরবের মাটিতে লড়াই করবো'।[৪২] এ সাক্ষাৎকার থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, বহুজাতিক বাহিনীতে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সেনাদের কাজ ছিল মূলত ডিফেন্সিভ কৌশলে সৌদি আরবের মাটিতে লড়াই করা।

সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের হেড কোয়ার্টারের দায়িত্বে ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার হাসান মাসুদ চৌধুরী। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশী সেনা হেড কোয়ার্টার পুরোপুরি কম্পিউটারাইজড এবং কন্টোল রুমের দেয়াল জুড়ে বড় বড় আঞ্চলিক মানচিত্র। যে রুটে ইরাকি বাহিনী ইচ্ছে করলেই সৌদি আরবে ঢুকতে পারতো সেই রুটের বিভিন্ন ডিফেন্সিভ পজিশনে বাংলাদেশের সৈন্যরা অবস্থান গ্রহণ করে। সৌদি আরবের পূবাঞ্চলীয় সীমান্তে বড় একটা বিল্ডিং-এ আর্মড ফোর্সেস হাসপাতাল স্থাপন করা হয়, যার কমান্ডিং অফিসার ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের লে. কর্নেল ডা. সহিদ খান। তিনি পাঁচ নম্বর ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের কমান্ডিং অফিসার। হাসপাতালের সমস্ত স্টাফ বাংলাদেশী সেনা। পঞ্চাশ বেডের এ হাসপাতালে বহুজাতিক বাহিনীর সব দেশের সেনাদেরই চিকিৎসা করা হতো। পিজি হাসপাতাল থেকে এফসিপিএস করা বাংলাদেশী ডাক্তারগণ বহুজাতিক বাহিনীতে সুচিকিৎসক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। হাসপাতালের বাইরেও তাঁবু খাটিয়ে এক হাজার স্পেয়ার বেড রাখা হয় জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য। এ ছাড়া কস্টামিনেশন চেম্বার কেমিক্যাল বোমায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়। বাংলাদেশী ডাক্তার এবং প্যারামেডিকরা অল্প সময়ের মধ্যেই আরবি ভাষা রপ্ত করে ফেলে। তাছাড়া বাংলাদেশী সেনাদের দায়িত্বে থাকে সপ্তম ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের সীমান্তে একটি ফিল্ড হাসপাতাল। এগারটি এইট্টিন হুইলার ট্রাকের ওপর এ মোবাইল হাসপাতাল অবস্থিত। ট্রাকগুলো সেল এবং বুলেট প্রুফ। এগারটি ট্রাককে আবার বিশেষ কায়দায় একটার সাথে একটা করিডোর পদ্ধতিতে জোড়া লাগিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি হাসপাতালে পরিণত করা হয়, যেখানে পঞ্চাশটি বেড এবং দুটি অপরেশন থিয়েটা ছিল। প্রায় একশত মিলিয়ন ডলারের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংবলিত এ হাসপাতাল পরিচলনার দায়িত্বে ছিলেন বাংলাদেশী সেনা ডাক্তারগণ।[৪৩]

---

[৪১] *তদেব।*

[৪২] *The Daily Observer*, Dhaka, 21 November 1990.

[৪৩] *Ibid.*

সৌদি আরবের মরুভূমির বিভিন্ন স্থানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইনফ্যান্ট্রি পোস্ট বিদ্যমান ছিল মরুভূমির বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো অবস্থায় ইস্টার্ন কমান্ডের অধীনে বিভিন্ন বাহিনীর ছোট ছোট দলগুলোর বাংকার পোস্ট এবং এর পরে আমেরিকার ডাবল পাখাওয়ালা হেলিকপ্টার মোতায়েন রাখা হতো। ইস্টার্ণ কমান্ডের অধীনে সৌদি, আমেরিক্যান, ব্রিটিশ, বাংলাদেশী, সব উপসাগরীয় আমিরাতগুলোর সেনাদল এবং মরক্কোর সেনাবাহিনী অংশগ্রহণ করে। সৌদি-ইরাক সীমান্তের কাছাকাছি একটি পাহাড়ের পাদদেশে ১ নম্বর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইনফ্যান্ট্রি ছাউনিগুলো মোতায়েন ছিল। এ সেনাদলের কমান্ডিং আফিসার ছিলেন প্যারট্রপার কমান্ডিং আফিসার লে. কর্নেল শাহ মোঃ সুলতান উদ্দিন ইকবাল বীর-প্রতীক। তাঁর কমান্ডে ছিল সীমান্ত পর্যন্ত ছড়ানো বাংলাদেশী সেনাদের অস্ত্রধারী বাহিনী।[৪৪]

বেঙ্গল রেজিমেন্টে পদাতিক বাংলাদেশী সেনাদের দায়িত্ব ছিল মূল কেন্দ্রের যাবতীয় প্রস্তুতি, বিভাগীয় প্রশাসনিক এলাকা, কেন্দ্রীয় সরবরাহ ব্যবস্থা, জ্বালানি ডিপো ইত্যাদির প্রতিরক্ষা করা। তাছাড়া বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটেলিয়ন মাইন ফিল্ড তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করে। কাজেই বলা যায় উপসাগরীয় সংকটে বাংলাদেশ রেজিমেন্ট মূলত প্রতিরক্ষার কাজে যোগদান করে। সৌদি চীফ অব স্টাফ জেনারেল খালেদ বিন সুলতান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুণগত মানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশী সৈন্যরা সৌদি-বাংলাদেশ কমান্ডে কাজ করতো। সৌদি আরবের বাইরের কোনো মাটিতে তাদের কোনো কাজ ছিল না। মূলত ডিফেন্সিভ কৌশলে সৌদি আরবের মাটিতে যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।[৪৫] বহুজাতিক বাহিনী বাংলাদেশ রেজিমেন্টের কৃতিত্বের প্রশংসা করেছে বহুবার। কাজেই বলা যায় বাংলাদেশ সরকারের সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্তকে অনেক মহল নিন্দা করলেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভূমিকায় বাংলাদেশের নামের সঙ্গে অনেক মর্যাদা এবং শ্রদ্ধা যুক্ত হয়।

এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ তুরস্ক ও সৌদি আরব সফর করেন। তিনি বাদশাহ্ ফাহদের সঙ্গে উপসাগরীয় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এর পর সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুদিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে স্বদেশ যাত্রার প্রাক্কালে আল-মুশরিক প্রাসাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি খোলাখুলিভাবে মন্তব্য করেন 'কুয়েতে বৈধ সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে এবং ইরাককে কুয়েত ছেড়ে যেতে রাজি করাতে একটি শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে এশিয়ার ৬টি দেশের (বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, মালদ্বীপ এবং পাকিস্তান) মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছে এবং শীঘ্রই এ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছা যাবে। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে এ সব এশীয় মুসলিম দেশে এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য পাঠিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন।'[৪৬]

বাংলাদেশের এ শান্তি পরিকল্পনা মুসলিম বিশ্বে 'প্যান ইসলামিক' পরিকল্পনা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশের সাথে ইরাকের সম্পর্ক এক পর্যায়ে ধমকে দাঁড়ায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র মত প্রকাশ করেন, ইরাক বাংলাদেশের কূটনীতিবিদদের বহির্গমনে রাজি হয়নি। কারণ হিসেবে জানা যায় বাংলাদেশ বহুজাতিক বাহিনীতে সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাগদাদ এবং ঢাকার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছন্ন হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে পর্যবেক্ষক মহল মন্তব্য করেন, 'এ শান্তি উদ্যোগের লাভ-ক্ষতি আছে কিনা তা ভাবতে হবে। কারণ কূটনৈতিক তৎপরতায় গায়ের জোরের সুযোগ নেই। শান্তি উদ্যোগের অন্যতম বিষয় হলো কুয়েত থেকে সরে আসতে ইরাককে রাজি করানো। বাংলাদেশের এ উদ্যোগ কার্যকর করতে হলে ৬টি এশীয় মুসলিম দেশের একমত

---

[৪৪] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা, ২ ডিসেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ২১-২২।

[৪৫] *সাপ্তাহিক রোববার*, ঢাকা, ১৬ সেপ্টেম্বর , ১৯৯০, পৃ. ১৮।

[৪৬] *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ঢাকা, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ১৭-১৮।

হবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। কূটনৈতিক উদ্যোগ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেও এটা কার্যকর সহজ হবে না। পর্যবেক্ষক মহল আরো ধারণা করেন যে, বাংলাদেশ সংকটের শুরু থেকে মধ্যস্থতার ভূমিকা নিলে তা ফলপ্রসূ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার ব্যাপারে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল না। উপরন্তু বহুজাতিক বাহিনীতে সৈন্য প্রেরণের ফলে বাগদাদের কাছে ঢাকার গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়।'[৪৭]

এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ ১লা অক্টোবর ১৯৯০ নিউইয়র্কের ওয়ালড্রু টাওয়ার হোটেলের স্যুটে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সাথে ৪০ মিনিট স্থায়ী এক বৈঠকে মিলিত হন। দুই নেতার আলোচনার মূল বিষয় ছিল উপসাগরীয় সংকট। এ ব্যাপারে নীতিগত ভূমিকা গ্রহণের জন্য এবং বহুজাতিক বাহিনীতে সৈন্য প্রেরণের জন্য জর্জ বুশ বাংলাদেশের প্রশংসা করেন।[৪৮] বৈঠকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ইরাকের কুয়েত দখলের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত ভূমিকার প্রতি বাংলাদেশের সংহতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা প্রথম বারের মতো শান্তি ও স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করেছে বলে প্রেসিডেন্ট এরশাদ জর্জ বুশকে ধন্যবাদ জানান।

উপসাগরীয় সংকটে বাংলাদেশ সরকারের এ সিদ্ধান্ত দেশে ও বিদেশে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে নতুন পরীক্ষায় ফেলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। এ প্রসঙ্গে সরকারি এক প্রেসনোটে বলা হয় 'বাংলাদেশ নীতিগতভাবে দখলকারীকে সমর্থন করতে পারে না। দুর্বল প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সৈন্য পাঠিয়ে তা দখল করা এবং পরে তা নিজ দেশের অঙ্গীভূত করে নেওয়াকে বাংলাদেশ নীতিগতভাবে সমর্থন করে না। আগ্রাসন, দখল ও সরকার পরিবর্তনে বল প্রয়োগ করার কাজ কোনো ক্রমেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। বাংলাদেশ তাই এর বিরুদ্ধে। বাংলাদেশ নীতিগতভাবে সৌদি আরবকে সহায়তা করতে রাজি, যে কারণে সৌদি আরবের অনুরোধেই বাংলাদেশ সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাছাড়া জাতিসংঘ যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, বাংলাদেশ তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশী সৈন্য কেবলমাত্র প্রতিরক্ষার কাজে লাগানো হবে বলে প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়।'[৪৯]

বাংলাদেশ সরকারের জন্য দায়িত্বশীলতার ব্যাপকতর ক্ষেত্রটি ছিল নতুন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে নিজ দেশের জন্য সুবিধাজনক অবস্থান নির্ধারণ। সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে আর্থিক সহযোগিতা নিশ্চিত রাখতেই মূলত সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে পর্যন্ত ইরাকের সামরিক প্রভুর ভূমিকা থেকে সরে এসে বিরোধী ভূমিকা নিতে হয়েছে। তাছাড়া এক সময়ের কমিউনিস্ট ব্লকের দেশগুলো এ সংকটে ইরাকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পরিহার করে। ইরাকের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ পালন করতে গিয়ে ইউরোপীয় গোষ্ঠী, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইরাক-বিরোধী আরবদেশগুলো নতুন অর্থনৈতিক মৈত্রী বন্ধন সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত একটি দেশের জন্য মধ্যপ্রাচ্য সংকটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এ নতুন মৈত্রী ব্যবস্থার। আর এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় ইরাক বিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তি সমাবেশে বাংলাদেশ অংশ নেবে কিনা ? এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে ইরাক বিরোধী কূটনীতি গ্রহণ করে। তবে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গতিশীলতা সব সময়েই কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ থাকে এবং গতিশীলতার মধ্যে অবস্থান উত্তরণের সুযোগও নিহিত থাকে। সৌদি আরবে সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বাংলাদেশ সরকারের প্রথম

---

[৪৭] *তদেব*, পৃ. ১৯।

[৪৮] *The Daily Observer*, Dhaka, 12 October, 1990.

[৪৯] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা, ১২ অক্টোবর, ১৯৯০, পৃ.১৩।

কাজ ছিল ইরাক ও কুয়েতে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা পূর্ব সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক অর্থপূর্ণ প্রমাণিত করা।[৫০]

প্রেসিডেন্ট এরশাদ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করে বাংলাদেশীদের সীমান্ত অতিক্রমের জটিলতা নিরসন করেন, এমন কি মধ্যপ্রাচ্য সংকটজনিত কারণে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থনৈতিক সংকট নিরসনার্থে দাতাদেশ ও সংস্থাগুলোর সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হন। উল্লেখ্য, উপসাগরীয় সংকটে বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। কেননা দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বাংলাদেশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ শক্তি হিসাবে নতুন পরিচয় লাভ করে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণ মর্যাদায় বরণীয় হয়েছে। এ জন্য আশা করা হয় বাংলাদেশের নতুন ভূমিকা বিশ্ব শক্তিগুলোকে যেভাবে প্রভাবিত করে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তাছাড়া কুয়েত আগ্রাসন মুক্ত হলে মিত্র দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রাধান্য পাবে এমন সম্ভাবনাও লক্ষ করা যায়।

৫. উপসাগরীয় যুদ্ধের সমাপ্তি

শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের দেওয়া চরম সময়সীমা ১৫ই জানুয়ারি অতিবাহিত হবার পর ১৭ই জানুয়ারি ১৯৯১ বাংলাদেশ সময় মধ্যরাত ২.৩০ মি. বহুজাতিক বাহিনী কর্তৃক আমেরিকার সবচেয়ে গোপনীয় ও মূল্যবান এফ-১১৭ জঙ্গি বিমান ২০০০ পাউন্ড ওজনের একটি লেজার নিয়ন্ত্রিত বোমা ইরাকি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তরে নিক্ষেপ করে।[৫১] ফলে বিমান আক্রমণ দিয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় উপসাগরীয় যুদ্ধ। ভোর রাত পর্যন্ত বিমান ও ক্রুজ মিসাইলগুলো রাজধানী বাগদাদ, বাথ পার্টির সদর দপ্তর, প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ, প্রধান ডাকঘর, নিরাপত্তা সদর দপ্তর এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে একের পর এক আঘাত হেনে সফলতা অর্জন করে।[৫২]

উপসাগরীয় যুদ্ধের কিছু আগের অবস্থায় ফলাফলের সম্ভাব্য অবস্থার বিবেচনায় উল্লেখিত তিনটি মূল লক্ষ্য স্থির করা হয়ে থাকলেও যুদ্ধের বাস্তবতা প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে পরাজিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। উপসাগরীয় যুদ্ধের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো পূর্বের কোনো যুদ্ধই এতো ধীর অগ্রগতির উপর বিশ্লেষণ হয়নি।[৫৩] উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বশর্ত পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধে জোটগত সামরিক বাহিনীর প্রাধান্য প্রতিরোধ করার মধ্য দিয়ে ইরাকি বাহিনী নিজেদের আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করে। যে কারণে ইরাক কুয়েতের চারপার্শ্বে ব্যাপক দুর্গ নির্মাণ করে এবং ভূমিতে ও সমুদ্রে প্রচুর মাইন স্থাপন করে।[৫৪]

বহুজাতিক বাহিনী শুরু থেকেই উপসাগরীয় যুদ্ধে একটা কৌশল অবলম্বন করেছে, তাহলো বিমান যুদ্ধে প্রাধান্য বিস্তার। এ ছাড়াও ইরাকের পারমানবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু সুবিধাদি ধ্বংসের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। উপসাগরীয় যুদ্ধ মাত্র ৪০ দিন অর্থাৎ ৯৬০ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। বহুজাতিক বাহিনী পুরো যুদ্ধের সময়ে ইরাক ও কুয়েতের লক্ষ্যবস্তুসমূহের ওপর ব্যাপক ও অব্যাহত বিমান আক্রমণ করে। বহুজাতিক বাহিনীর বিমান হামলায় সমগ্র ইরাক ও কুয়েতের সড়ক যোগাযোগ ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে ইরাকি ইউনিটগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইরাকি সেনাবাহিনীর সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদ

---

[৫০] *Ibid.*

[৫১] এম. কামাল উদ্দিন, *অপারেশন ডেজার্টস্ট্রম*, চট্টগ্রাম (জনতা প্রেস), ১৯৯২, পৃ. ১৭।

[৫২] *তদেব*, পৃ. ১৭।

[৫৩] Anderson and Rashidian, *op. cit.*, p. 124.

[৫৪] *Ibid.* p. 125.

কিংবা কোনোরূপ সরবরাহের ঘাটতি না থাকলেও অব্যাহত বোমা বর্ষণের ফলে ইরাকি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে। সর্বোপরি, বিমান শক্তির সঠিক, সাহসী ও প্রলয়ংকারী ব্যবহার উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলাফল সূচনা থেকেই স্থির হয়ে যায়। সম্ভবত এটাই প্রথম যুদ্ধ যাকে বলা যেতে পারে 'বিমান শক্তিতে বিজয়ী যুদ্ধ'।[৫৫]

এদিকে ইরাক যুদ্ধের জন্য কয়েক মাস যাবৎ বিমান প্রতিরক্ষা, কামান, ক্ষেপণাস্ত্র ও জঙ্গি বিমানের একটি ব্যাপক সমাবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ইরাকের বিমান প্রতিরক্ষা রাশিয়ান ও পাশ্চাত্য উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে উদ্ভাবিত। বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আকাশ সীমা পর্যবেক্ষণ ও জঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমগ্র ইরাককে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।[৫৬] বাগদাদে অবস্থিত প্রধান কেন্দ্র হতে সমগ্র ইরাকের আকাশ সীমা পর্যবেক্ষণ, বিমান যুদ্ধের প্রতি মূহূর্তের গতি, কৌশল, ব্যাপকতা ফলাফল অবলোকন ও নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা হয়। এরূপ একটি সুপরিকল্পিত ও পরীক্ষিত পদ্ধতির দ্বারা সুসজ্জিত বিমান বাহিনী থাকা সত্ত্বেও বহুজাতিক বাহিনীর সাথে বিমান যুদ্ধে ইরাক টিকে থাকতে সক্ষম হয়নি।[৫৭]

১৯৯১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি গ্রিনিচমান সময় রাত ১টায় বহুজাতিক বাহিনী সম্মুখ সমরে নিয়োজিত হয়।[৫৮] প্রথম ১০ ঘন্টায় মিত্র বাহিনী কুয়েত ও ইরাকের ২০ মাইলেরও বেশি অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এ সময়ের মধ্যে ১৪০০০ জনেরও বেশি ইরাকি সৈন্যকে যুদ্ধবন্দী করা হয়। মিত্র বাহিনী ইরাকিদের বিশাল ও দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যূহ তছনছ করে দেয়। ক্ষিপ্রগতিতে মিত্রবাহিনী অগ্রসর হয়। স্থলযুদ্ধের ৪৮ ঘণ্টা অতিবাহিত হতেই বাগদাদ বেতার থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, ইরাক কুয়েত হতে বিনাশর্তে সৈন্য প্রত্যাহার করতে সম্মত। ৬০ ঘণ্টার মধ্যে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বেতারে ঘোষণা দেন ইরাক, কুয়েত হতে বিনাশর্তে সৈন্য প্রত্যাহার করবে এবং ইতোমধ্যে প্রত্যাহার শুরু হয়েছে।[৫৯] ২৭শে ফেব্রুয়ারি কুয়েতি সৈন্য কুয়েত শহরে প্রবেশ করে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট বুশের নির্দেশে উপসগারীয় যুদ্ধ বন্ধ হয়।[৬০]

৬. বাংলাদেশে প্রভাব

মধ্যপ্রাচ্যের অনিশ্চিত পরিস্থিতির কারণে আটকে পড়ে বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রের নাগরিকের সাথে লক্ষাধিক বাংলাদেশী। এরা কর্মস্থলে ব্যস্ত ছিল কুয়েত ও ইরাকে। সর্বস্ব হারিয়ে এসব বাংলাদেশীরা স্বদেশে ফিরে আসার জন্য আটকা পড়ে তুরস্ক, সৌদি আরব ও জর্ডান সীমান্তে। মরুভূমির তপ্ত বালুর ওপর খোলা আকাশের নীচে অনাহারে, অর্ধাহারে, মশার কামড়ে কালাতিপাত করতে থাকে, অনেকে মারা যায় সাপের কামড়ে।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজণীয় অর্থের সংস্থান করতে না পারায় বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতা কামনা করে আন্তর্জাতিক রেডক্রস, জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন দাতা দেশের নিকট। বাংলাদেশ সরকার ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯০ থেকে বাংলাদেশীদের দেশে ফিরিয়ে আনতে শুরু করে। ঐ দিন থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক-জর্ডান ও ইরাক-তুরস্ক সীমান্ত থেকে আটকা পড়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রত্যাবাসন ব্যাপকহারে শুরু হয়। ইইসি, আইওএম ইত্যাদি আন্তর্জাতিক

---

[৫৫] এম কামাল উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫।

[৫৬] *তদেব*, পৃ. ১০।

[৫৭] Anderson and Rashidian, *op. cit.*, pp. 125-126.

[৫৮] Abdullah Yousef Al-Ghunaim, *The Iraqi Agression on Kuwait*, *op. cit.*, p. 64.

[৫৯] *Ibid.* pp. 81-82.

[৬০] *Ibid.*

সংস্থা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে। সরকার প্রত্যাবাসনের সঙ্গে সঙ্গে আটকে পড়া এশীয় ক্যাম্প সমূহে খাদ্য ও ঔষধ প্রেরণ করে।[৬১] ১০ই ডিসেম্বর ১৯৯০ পর্যন্ত ইরাক ও কুয়েত থেকে প্রায় দশ সহস্রাধিক বাংলাদেশী দেশে ফিরে আসে। ১৮৬টি বিশেষ ফ্লাইটে ইরাক-কুয়েতে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের ফিরিয়ে আনা হয়। আনুমানিক ১ লক্ষ ২০ হাজার বাংলাদেশী কর্মরত ছিল ইরাক ও কুয়েতে। এ হিসাব অনুযায়ী অধিকাংশ বাংলাদেশীরই স্বদেশ ফেরার সঠিক সংবাদ না পেয়ে বাংলাদেশ সরকার ফ্লাইটের সংখ্যা বাড়াতে থাকে এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সকল বাংলাদেশীদের দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন।

এদিকে উপসাগরীয় যুদ্ধের সর্বগ্রাসী সংকট বাংলাদেশের সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য একটি ইস্যু এনে দেয়। সরকারের তৎপরতা শুরু হয় দ্রুত কিন্তু তৎকালীন বিরোধী দলসমূহ যেমন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল (বিএনপি) ও জামায়াতই ইসলামী বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তবে অনেক দলই নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের আহবান জানায়। বাংলাদেশকে উপসাগরীয় সংকট থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে কোনো পরস্পরবিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে সরকারি এবং বিরোধী দলসমূহের ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও মধ্যপ্রাচ্য সংকটে বিরোধী দলগুলোর প্রতিক্রিয়া ছিল একেবারেই গতানুগতিক।

বাংলাদেশ সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীর পক্ষে থাকলেও এদেশের অধিকাংশ মানুষ প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন করে। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর প্রথম দিকে ইরাকের সাথে সুসম্পর্ক অব্যাহত রেখেছিলেন কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ করে উপসাগরীয় সংকটের সময়ে ইরাক-বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ এরশাদ সরকার আমেরিকাপন্থী নীতি গ্রহণ করার প্রেক্ষিতেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ ধারণা জনমনে ব্যাপক আলোচিত হয়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সমর্থন ছিল ইরাকের প্রতি। গ্রাম বাংলায় এমনকি শহরেও নবজাতকের নাম সাদ্দাম হোসেন রাখার যে প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তা থেকেও এ সমর্থনের প্রমাণ মেলে। শহরের রাস্তা-ঘাটে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের প্রতিকৃতিকে ফাঁসিতে ঝুলানো এবং 'বাপের বেটা সাদ্দাম'-এর পোস্টার এ সমর্থনের পক্ষে একটি বাস্তব প্রমাণ। সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে জেহাদে শরিক হবার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গণস্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়।[৬২] মধ্যপ্রাচ্য সংকটে বাংলাদেশের ডানপন্থী দলগুলো বিশেষ করে বিএনপি'র সাথে সৌদি আরবের সম্পর্ক বরাবরই ঘনিষ্ঠ। অপরদিকে ইরাকের সাথে বামপন্থী দলগুলো বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও বাম গণতান্ত্রিক দলগুলোর সম্পর্ক উষ্ণ। তবে প্রাথমিক অবস্থায় ডানপন্থী দলগুলো ইরাকের আগ্রাসনে উদ্বেগ প্রকাশ করে।[৬৩] আন্তর্জাতিক জনমত যখন সম্পূর্ণভাবে বিপক্ষে, তখন ইরাকের প্রতি সহানুভূতিশীল দলগুলো আগ্রাসনের নিন্দা করে। কিন্তু শুধুমাত্র কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ এ ধরনের বিবৃতির বাইরে বিরোধী দলগুলো মধ্যপ্রাচ্য সংকটে সৃষ্ট জাতির মহাদুর্যোগে কোনো গঠনমূলক বা সক্রিয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। সমস্যা সমাধানের মূল স্রোত থেকে বিরোধী দলগুলো পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থাকে। সরকার সৌদি আরবে সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আটদল, পাঁচদল, কমিউনিস্ট পার্টি, ঐক্য প্রক্রিয়া ও জনতা পার্টি ১৯৯০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর সারা দেশে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।[৬৪] বিএনপি এ হরতালে সাড়া দেয়নি। কারণ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের সমর্থন ছিল ইরাকের

---

[৬১] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ২৫।

[৬২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৮ অক্টোম্বর, ১৯৯০, পৃ. ১

[৬৩] *তদেব।*

[৬৪] *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ২৯ আগস্ট, ১৯৯০, পৃ. ১।

প্রতি। কাজেই বিএনপি সাধারণ মানুষের আস্থা পাবার জন্যেই হরতালে সাড়া দেয়নি বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন। এ হরতাল পালিত হয় মধ্যপ্রাচ্য থেকে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার, ইরাক-কুয়েত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং সৌদি আরবে বাংলাদেশের সৈন্য পাঠানোর প্রতিবাদে।

৭. উপসংহার

উপসাগরীয় যুদ্ধে মিত্র শক্তির বোমা আক্রমণ ইরাকের বেশির ভাগ তেল ক্ষেত্র বিনষ্ট করে। সাদ্দাম হোসেনের কোনো নিউক্লিয়ার অস্ত্র ছিল না এবং রাসায়নিক যুদ্ধের যোগ্যতাও ছিল সামান্য। রিপাবলিক্যান গার্ডের ক্ষমতা ও ইরাকের সামরিক অস্ত্রের গুণাগুণ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত খবর প্রকাশ করা হয়। ইরাকি পক্ষে মিত্রপক্ষের ক্ষমতা সর্ম্পকে ভুল অনুমান করা হয় এবং ইরাকি বাহিনীর ক্ষমতা সম্পর্কেও বেশি ধারণা প্রদান করা হয়। সাদ্দাম হোসেনের লক্ষ্য ছিল নিশ্চিত পরাজয় পর্যন্ত বিরোধ চালিয়ে যাওয়া কিন্তু তিনি ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করতে পারেননি। উপসাগরীয় সংকটের ওপর জাতিসংঘের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অভাব সত্ত্বেও ধারণা করা হয় জাতিসংঘ পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কুয়েতের পুনর্গঠনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপ দুর্বল জাতিসংঘের শক্তি বৃদ্ধি করবে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান থাকে।

এদিকে ইসরাইল, মিশর, তুরস্ক এবং সৌদি আরব সকলেই মিত্র বাহিনীকে সমর্থন দিয়েছে পুরস্কৃত হওয়ার আশায়। যুদ্ধ বিরতির পরেই প্রকাশ পায় যে, মধ্যপ্রাচ্য উন্নয়নে একটি বহুজাতিক 'মধ্যপ্রাচ্য ব্যবস্থা' গড়ে তোলা হবে। কিন্তু এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পশ্চিমা জগতে অস্পষ্টতা বিরাজ করে। কুর্দিরা স্বায়ত্তশাসনের আশা পুনর্ব্যক্ত করে। তবে উপসাগরীয় যুদ্ধ ঐ অঞ্চলে একটি স্থায়ী সংঘর্ষের ক্ষেত্র হিসেবে ইতিহাসে প্রতীয়মান হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল, সাম্প্রতিক ইরাকে ইঙ্গো-মার্কিন আগ্রাসন তারই প্রতিফলন। উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রকাশ্য দুটো পক্ষ ছাড়াও ক্রিয়াশীল ছিল একটি অদৃশ্য পক্ষ। তারা শুধূ যুদ্ধ নয়, বরং সব রকমের বড় বড় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংঘাতের নেপথ্যে ভূমিকা পালন করে থাকে। স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পরবর্তী পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণের ফলে বিগত কিছু দিনের জন্য বিশ্ব বাজারে অস্ত্র ব্যবসায় কিছুটা মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল, যে কারণে উন্নত বিশ্বের একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বিপাকে পড়ে যায়। এ গোষ্ঠীকে বলা হয়েছে Military Bureaucratic Industrial Corporate Complex বা সংক্ষেপে MBICC অস্ত্রশিল্প ও যুদ্ধের জন্য অস্ত্র সরবরাহ ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করে এ গোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা চলে। তেল সম্পদ ও ইসরাইলের অস্তিত্বের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে সব সময় একটি সংকটপূর্ণ এলাকা এবং অস্ত্রের বিপন্ন ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত। উপসাগরীয় সংকটের ফলে এ বাজারটি বেশ সরগরম হয়ে ওঠে।

উপসাগরীয় সংকটের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে মারাত্মক সংকট সৃষ্টি করে। তবে বহুজাতিক বাহিনীতে বাংলাদেশ রেজিমেন্টের ভূমিকা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রসংশিত হয়। উপসাগরীয় সংকটের মধ্য দিয়ে নতুন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দিকগুলোই জোরালো বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে প্রাণ ও সম্পদের যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। গঠনমূলক রাজনৈতিক আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে এ যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হতো।

ভূ-খণ্ডগত স্বত্বাধিকার এবং নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভের পর এক রাষ্ট্রের ওপর অপর রাষ্ট্রের আগ্রাসন আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। এর মূল ধারাটি যাতে সাময়িক ভাবাবেগ বা উদ্দেশ্যমূলক প্রচারে ব্যাহত না হয়ে বরং মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার লবণ শিল্প : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মো. রেজাউল করিম*

Abstract: British East India Company as a commercial organization had a keen interest to maximize benefit through imposing monopoly upon the agricultural, commercial and industrial sectors of the country. The salt manufacture was one of the indegeneous industries in Bengal, which was completely monopolised. The Company initiated to get salt fraudulently from the producers (*molungees*) by giving a lump sum price. The *molungees* aware to the exploitation upon them and began to protest through the movement against the oppressive system, which affected the salt production. On the other hand, the Company started importation of salt from England that was cheaper as well as better than the indegeneous product. It affected the Bengal salt industry and had driven away its product from the market. The manufacture of salt decreased rapidly and at last the industry turned off.

ভূমিকা

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের সূচনা হয়। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির প্রধান লক্ষ্য ছিল মুনাফা অর্জন। কোম্পানি এদেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার আরোপ করে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াসী হয়।[১] আরম্ভ হয় আর্থিক শোষণ ও প্রবঞ্চনা। বাংলার অন্যান্য শিল্পের মতো লবণ শিল্পও কোম্পানির এই শোষণ নীতির শিকার হয়। লবণ উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার আরোপ করে কোম্পানি মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। লবণ উৎপাদনে নিয়োজিত মলঙ্গিদের[২] ওপর নেমে আসে আর্থিক নিষ্পেষণ। লবণ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত কোম্পানি কর্মচারীরাও মলঙ্গিদের শোষণের পথ বেছে নেয়। মলঙ্গিরা এই শোষণ ও প্রবঞ্চনা সম্পর্কে সচেতন ছিল। ফলে তা সহজে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মলঙ্গিদের ওপর এই শোষণ অব্যাহত রাখতে বিভিন্ন নির্যাতন ও নিপীড়ন চালানো হয়। অবশ্য মলঙ্গিরা বিনা বাধায় এমনতর শোষণ-নির্যাতন মেনে নেয়নি। তারা এর বিরুদ্ধে আনন্দোলন আরম্ভ করে। এতে বাংলার লবণ উৎপাদন ব্যাহত হয়। শিল্প বিপ্লবের যুগে অন্যান্য শিল্পের পাশাপাশি ব্রিটেনে লবণ শিল্পেরও অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসকরা এদেশকে তাদের শিল্প পণ্যের বাজারে পরিণত করার কৌশল অবলম্বন করে। তারা ব্রিটেন থেকে লবণ আমদানি শুরু করলে এদেশের লবণ শিল্প ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হতে থাকে। ঔপনিবেশিক বাংলায় লবণ শিল্পের এই ক্রমাবনতির ইতিহাস বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আলোচ্য প্রবন্ধে এ

---

* ড. মো. রেজাউল করিম, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সরকারী শহীদ বুলবুল কলেজ, পাবনা।

[১] N.H. Choudhury, *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal: The Faraizi, Indigo and Pabna Movements* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2001), p. 5.

[২] লবণ উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকদের মলঙ্গি বলা হতো।

সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। তবে মূল বিষয়ে যাবার আগে ভারতের লবণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলাচনা করা দরকার।

ভারতের লবণ

লবণের বৈজ্ঞানিক নাম *Sodium Chloride*।[৩] অতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষ খাদ্য উপাদান হিসেবে লবণ ব্যবহার করে আসছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও লবণ একটি অতি প্রাচীন ভোজ্য পদার্থ। কৃষি কাজের উৎপত্তির সাথে সাথে ভারতের মানুষ খাদ্য হিসেবে লবণের ব্যবহার আরম্ভ করে বলে মনে করা হয়।[৪] লবণ (*Lavana*) শব্দটি তৎসম। প্রাচীন লেখক ও ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক (*Father of the Indian medicine*) সুশ্রুতের মতে, প্রাচীন কালে ভারতে চার ধরনের লবণ প্রচলিত ছিল। এসব লবণ হলো : সৈন্ধব লবণ, সামুদ্র লবণ, রোমক বা সাকম্বরী লবণ এবং পানসুজ বা উষাসুটা লবণ। সুশ্রুত গুণাগুণের পার্থক্যের চেয়ে বরং উৎসের ওপর ভিত্তি করে লবণের এই শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। তিনি সৈন্ধব লবণ বলতে সিন্ধু ও কোহাটের খনি থেকে আহরিত লবণকে বুঝিয়েছেন। সামুদ্র লবণ বলতে বুঝিয়েছেন সমুদ্র থেকে আহরিত লবণকে। একই ভাবে তিনি সম্ভার হ্রদ থেকে প্রাপ্ত লবণকে বলেছেন রোমক বা সাকম্বরী লবণ। আবার লবণাক্ত মাটি থেকে আহরিত লবণকে তিনি পানসুজ বা উষাসুটা লবণ বলে অভিহিত করেছেন।[৫] সম্ভবত, প্রাচীন কালে ভারতের মানুষ লবণকে উপরোক্ত চার শ্রেণীতে ভাগ করতো। মধ্যযুগেও বাংলায় লবণ উৎপাদন অব্যাহত ছিল। এ সময়ে ভারতে লবণকে নতুনভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়েছিল কি-না তা বলা মুশকিল। ইংরেজ অধিগ্রহণের পর ভারতে ইংল্যান্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লবণ আমদানি করা হয়। এতে লবণের উৎসের সংখ্যা বাড়ে, সেই সঙ্গে মানের ভিত্তিতে লবণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।[৬]

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে (১৮৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে) পরিচালিত পরিসংখ্যান মোতাবেক ভারতে লবণের মোট চাহিদা ছিল ২৪.২ মিলিয়ন মণ। এই চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে আশির দশকের প্রারম্ভে (১৮৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দে) ২৭.৯ মিলিয়ন মণে উন্নীত হয়।[৭] ভারতীয় জনগোষ্ঠীর লবণের চাহিদার শতকরা ৭০ ভাগ পাওয়া যেতো দেশীয় উৎস থেকে। বাকি ৩০ ভাগ লবণ অন্যান্য দেশ থেকে সমুদ্র পথে আমদানি করা হতো।[৮] ভারতে লবণের প্রধান উৎস সমূহের বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ। পাঞ্জাবের লবণ এলাকা (*Salt range*) ও কোহাটের লবণ খনি এবং সীমান্ত প্রদেশ। এসব স্থানে খনি থেকে লবণ পাওয়া যেতো। রাজপুতনার সম্ভার হ্রদ এবং অন্যান্য স্থানে লবণাক্ত পানি ও কাদা থেকে লবণ উৎপাদন করা হতো। কুচের ছোট র‍্যান সীমান্ত (*Boarder of the lesser Rann of Cutch*) এলাকা আর একটি লবণ উৎপাদন কেন্দ্র। এখানে অধোমৃত্তিকা (*Sub-soil*) থেকে লবণ উৎপাদন করা হতো।[৯] অবশ্য ভারতে সমুদ্রের পানি থেকেও লবণ উৎপাদিত হতো। সামুদ্রিক উৎস থেকে লবণ পাওয়া যেতো মাদ্রাজ ও বোম্বাই উপকূল এবং বাংলার গাঙ্গেয় মোহনায়। ১৯০৩ সালের পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের হিসেবে দেখা

---

[৩] George Watt, *The Commercial Products of India* (London: John Murry, 1908), p. 963; *Encyclopaedia Britannica*, Vol. XIX, p. 954.

[৪] *Ibid*, p. 963.

[৫] *Ibid.*

[৬] সমকালীন লেখক এ.এস. জাজ ঔপনিবেশিক শাসনামলে কলকাতার লবণকে মানের ওপর ভিত্তি করে ১৩ ভাগে বিভক্ত করেছেন। দেখুন, George Watt, *op.cit,* p. 963.

[৭] *Imperial Gazetteer of India*, Vol. IV, pp. 251-252. (এর পর থেকে *IGI* হিসেবে উল্লেখ করা হবে)।

[৮] *IGI*, Vol. IV, p. 248; George Watt, *op.cit,* p. 970.

[৯] *IGI*, Vol. IV, p. 248; George Watt, *op.cit* p. 964.

যায় যে, ভারতের মোট লবণের শতকরা ৬০ ভাগ আসতো মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সামুদ্রিক উৎস থেকে। শতকরা সাত ভাগ আসতো কুচের র‍্যান থেকে।[১০] পাঞ্জাব অঞ্চলে সিস-ইন্ডাসের (*Cis-indus*) খনিসমূহে প্রায় নয় শতাংশ লবণ উৎপাদিত হতো। এছাড়া শতকরা ১৮ ভাগ লবণ আসতো সম্ভার হ্রদ ও রাজপুতনার উৎসসমূহ থেকে।[১১]

বাংলার লবণ

প্রাচীন কাল থেকে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রেও পানি থেকে লবন উৎপন্ন হতো। চট্টগ্রাম থেকে জলেশ্বর পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর উপকূলের প্রায় সাত'শ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে লবণ ক্ষেত্রসমূহ বিস্তৃত ছিল।[১২] এসব এলাকায় মলঙ্গিরা লবণ উৎপাদন করতো। উৎপাদিত লবণ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণ করতো। শুধু তাই নয়, এর পরও কিছু লবণ অবশিষ্ট থাকতো যা যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বাজরে রপ্তানি হতো।[১৩]

লবণ ক্ষেত্রসমূহকে স্থানীয় ভাষায় চর বলা হতো।[১৪] বাংলার লবণের চরগুলো বিভিন্ন লবণ উৎপাদন ইউনিটে বিভক্ত ছিল। এসব ইউনিটকে বলা হতো আড়ং। আড়ংসমূহ আবার ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে খলাড়ি বলা হতো।[১৫] তিন-চারটি লবণ ক্ষেত্র সমন্বয়ে এক একটি খলাড়ি গড়ে উঠেছিল। বাংলায় প্রতিটি খলাড়িতে গড়ে সাতজন করে মলঙ্গি লবণ উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল।[১৬] এক একটি খলাড়িতে প্রতি বছর গড়ে ২৫০ মণ লবণ উৎপন্ন হতো।[১৭]

লবণ ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের সাধারণত মলঙ্গি বলা হতো। বাংলার মলঙ্গিরা ছিল মূলত চাষি। এরা চাষাবাদের পাশাপাশি বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় লবণ উৎপাদন করতো। তারা আজুরা মলঙ্গি এবং ঠিকা মলঙ্গি—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ব্রিটিশদের আগমনের অনেক পূর্ব থেকে এদেশে বংশানুক্রমিকভাবে লবণ উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকদের আজুরা মলঙ্গি বলা হতো। এদের বসতি ছিল খলাড়ি সংলগ্ন স্থানে। আজুরা মলঙ্গিদের পরিবারের সক্ষম সব পুরুষ সদস্যই লবণ ক্ষেত্রে কাজ করতো।[১৮] ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর অনেক মলঙ্গি খলাড়ি ছেড়ে পলায়ন করেছিল। এসব খলাড়িতে লবণ উৎপাদনের জন্য নতুন মলঙ্গির প্রয়োজন হয়। এছাড়া কোম্পানি নতুন নতুন খলাড়ি স্থাপন করে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির পায়। এতে নতুন মলঙ্গির প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় কোম্পানি দূরবর্তী অঞ্চল থেকে মলঙ্গি সংগ্রহ করে লবণ ক্ষেত্রে আনয়ন করে। এসব মলঙ্গিদের ঠিকা মলঙ্গি বলা হতো। ১৭৭০ সালে হিজলি এজেন্সিতে ঠিকা ব্যবস্থাপনার সূচনা হয়েছিল। এর পর

---

[১০] এ সময়ে কুচের র‍্যান'র লবণ বারোগড়া লবণ নামে পরিচিত ছিল।

[১১] *IGI*, Vol. III, p. 248.

[১২] J.K. Nag, 'History of Bengal's Salt Industry', *The Modern Review*, July-December 1939, p. 300.

[১৩] *Ibid.*

[১৪] W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. III, (Delhi: D.K. Publishing House, 1973), p. 150.

[১৫] J.K. Nag, *op.cit,* p. 300.

[১৬] W.W. Hunter, *op.cit*, Vol. III, p. 150.

[১৭] J.K. Nag, *op.cit*, p. 301; পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে খলাড়ি প্রতি ২৩৩ মণ লবণ উৎপন্ন হতো বলে মন্তব্য করা হয়। অন্যদিকে সমসাময়িক কালের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, খলাড়ি প্রতি বছরে লবণের উৎপাদন ছিল ২৫০ থেকে ৩০০ মণ। দেখুন, W.W. Hunter, *op.cit*, Vol. III, pp. 150-155. এবং *Calcutta Review*, jauary-june, 1847, p. 527.

[১৮] B. Barui, *The Salt Industry of Bengal, 1757-1800* (Calcutta: KP Bagchi & Company, 1985), pp. 34-35.

মেদিনীপুরের অন্য এজেন্সিতেও ঠিকা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। তবে, ব্যবস্থাটি মেদিনীপুর জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, বাংলার অন্য অঞ্চলে তা তেমন ছড়িয়ে পড়েনি।[১৯]

লবণ উৎপাদনের সময় ছিল অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বছরের শুষ্ক মৌসুম। লবণ উৎপাদনে প্রথমে লবণক্ষেত্রের মাটি আলতোভাবে কুপিয়ে নিয়ে তাতে সমুদ্রের পানি ঢুকিয়ে নেওয়া হতো। পানি কয়েকদিন আটকে রাখলে তা থিতিয়ে নিচে লবণের স্তর পড়তো। লবণক্ষেত্র থেকে পানি বের করে দেওয়ার পর মলঙ্গিরা কাদা মিশ্রিত লবণ উঠিয়ে নিয়ে কাপড়ে করে টাঙিয়ে দিতো। কাপড়ের নিচে রাখা বড় বড় চাড়িতে[২০] লবণের রস চুইয়ে জমা হতো। বিশেষ এক ধরনের ভাড়ে করে এই রস বৃহদাকার চুলায় জ্বাল করা হতো। খুলনা এলাকায় লবণ জ্বাল করার ভাড়কে বলা হতো মলঙ্গা। আর চুলাকে বলা হতো বাইন।[২১] লবণের রস মলঙ্গাতে করে বাইনে জ্বাল করার পর লবণ পাওয়া যেতো। মলঙ্গিরা লবণ জ্বাল করার প্রয়োজনীয় খড়ি সংগ্রহ করতো পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে।[২২] মনে রাখা দরকার, এ সময়ে বাংলার উপকূলীয় এলাকাসমূহ ছিল জঙ্গলাকীর্ণ।[২৩] বাংলার লবণ-এলাকাসমূহ সম্পর্কে হুগলীর ইংরেজ লবণ ব্যবসায়ী কিয়ার মন্তব্য করেছেন:

> The place where the salt was then made in Bengal, were called jungle or woods ... The salt-makers or malangis cultivated and inhabited the adjacent areas, which were cleared, and the salt water were kept out from them by means of banks of earth.[২৪]

১৭৮০ সালে কোম্পানি বাংলার সমগ্র লবণ অঞ্চলকে ছয়টি এজেন্সিতে বিভক্ত করে। এগুলো হলো হিজলি, তমলুক, ২৪-পরগনা, রায়মঙ্গল, বুলুয়া ও চট্টগ্রাম এজেন্সি। হিজলি এজেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয় জ্বালামুটা, দুরাদুমনা, সুজামুটা, বীরকুল, সাবাঙ্গ, মোহার, কাঁকড়াচর, ল্যামফে, বলসাই, মীরগুদা ও ময়নাচরা লবণক্ষেত্র। মহিষাদল ও মণ্ডলঘাট লবণক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত হয় তমলুক এজেন্সির। বয়গাঁতি, মঈহাটি, বেলিয়া, বালিন্দা, তালা, ভুলকা ও পারদুলিয়াপুর ২৪-পরগনা এজেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয়। রায়মঙ্গল এজেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয় রায়মঙ্গল, শিবপুর, সেলিমাবাদ ও গরোনোর। ভুলুয়া, দক্ষিণ শাহবাজপুর, সন্দ্বীপ, হাতিয়া ও বামনা লবণক্ষেত্র ভুলুয়া এজেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম কালেক্টরশিপের সব নিমক মহালকে (Salt mahals) চট্টগ্রাম এজেন্সির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২৫]

কোম্পানি প্রতিটি এজেন্সিতে একজন করে এজেন্ট নিয়োগ করে।[২৬] এজেন্টদের জন্য খুবই লোভনীয় বেতন প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। চার জন সল্ট এজেন্টের বেতন বছরে ৪২,০০০ রুপি নির্ধাতির হয়। অন্য দুজন এজেন্টের বেতন ছিল যথাক্রমে ৩৬,০০০ এবং ৩০,০০০ রুপি।[২৭] প্রতিকূল পরিবেশে চাকরির জন্য এধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হলেও এর মূল উদ্দেশ্য ছিল যোগ্যতর ও দক্ষ কর্মকর্তাদের লবণ এজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করা। কোম্পানির এই উদ্দেশ্য সফল হয়। দক্ষ

---

[১৯] *Ibid.* p. 37.

[২০] মাটির পাত্র বিশেষ।

[২১] সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (কলকাতা: শিবশঙ্কর মিত্র, ১৯৬৫), ২য় সং, পৃ. ৬৯৮।

[২২] J.K. Nag, *op.cit,* p. 300.

[২৩] গুল্মাচ্ছাদিত এসব অঞ্চলকে জলপাই মহাল বলা হতো।

[২৪] A. Keir, *Thoughts on the Affairs of Bengal*, 1772; উদ্ধৃত, B.Barui, *op.cit*, p. 5.

[২৫] *Ibid*, p. 25.

[২৬] *The Calcutta Review*, Vol. III, January-June 1845, p. 196.

[২৭] *The Calcutta Review*, Vol. III, January-June 1845, p. 197.

বেসামরিক কর্মকর্তাগণ এক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন এবং সল্ট এজেন্ট হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[২৮] এজেন্টদের দায়িত্ব ছিল মলঙ্গিদের লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ তদারক এবং সরবরাহকৃত লবণের মান অবলোকন করা। বাজারে লবণের দাম বেশি হওয়ায় মলঙ্গিরা বেশি পরিমাণে লবণ তৈরি করে গোপনে বিক্রি করতো।[২৯] চুক্তির চেয়ে বেশি লবণ তৈরি করে মলঙ্গিরা যেন বাজারজাত করতে না পারে তা নিশ্চিত করাও লবণ এজেন্টদের দায়িত্ব ছিল। এর পাশাপাশি তারা ভূমি রাজস্বের কালেক্টরও ছিলেন।[৩০] এজেন্সির ওপরে অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করা সল্ট এজেন্টের একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এজন্য এজেন্টদের অধীনে অনেক দেশীয় কর্মচারী নিয়োগ করা হয়।[৩১] এসব কর্মচারীর মাধ্যমে সল্ট এজেন্টগণ কোম্পানির লবণ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করেন। সল্ট এজেন্টগণ বিভিন্ন ঠিকাদারদের সঙ্গে লবণের চুক্তি সম্পাদন করতেন।[৩২] বাংলায় এ রকম অসংখ্য ঠিকাদার ছিল।[৩৩] এজেন্টগণ লবণ সরবরাহের জন্য ঠিকাদারকে আগাম হিসেবে নগদ অর্থ প্রদান করতেন। অন্যদিকে ঠিকাদাররা মলঙ্গিদের লবণের দাদন দিতো।[৩৪] অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে সল্ট এজেন্টগণ নিজেরাই মলঙ্গিদের দাদন দিয়ে চুক্তিবদ্ধ করতেন।[৩৫] উভয় ক্ষেত্রেই দাদনের শর্ত মোতাবেক মলঙ্গিরা উৎপাদিত সমুদয় লবণ নির্ধারিত মূল্যে কোম্পানিকে প্রদান করতে বাধ্য ছিল।

কোম্পানি আমলে বাংলার উল্লেখযোগ্য লবণ উৎপাদনকারী জেলাসমূহ হলো যথাক্রমে মেদিনীপুর, ২৪-পরগনা, বুলুয়া বা নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও যশোর।[৩৬] মেদিনীপুর জেলার লবণ ক্ষেত্রসমূহ হিজলি ও তমলুক নামক দুটি স্বতন্ত্র এজেন্সিতে বিভক্ত ছিল। তবে, অন্য জেলায় একটির বেশি এজেন্সি ছিল না। বাংলায় উৎপাদিত লবণের অর্ধেকের বেশি উৎপন্ন হতো মেদিনীপুরে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লবণ উৎপাদন হতো সুন্দরবন অঞ্চলে। নিচে বাংলার লবণ উৎপাদন এলাকাসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

তমলুক এজেন্সি: তমলুক এজেন্সির সদর দপ্তর ছিল তমলুক। এজেন্সিটি তমলুক ও মহিষাদল নামক দুটি আড়ং-এ বিভক্ত ছিল। এ এজেন্সিতে হুগলী নদীর পশ্চিম তীর এবং হলদি, টেংরাখালি ও রাইখালি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে লবণ উৎপাদন করা হতো।[৩৭] এসব বৃহদাকার নদীর উভয় তীরে লবণ উৎপাদনের খলাড়িসমূহ অবস্থিত ছিল। তমলুক এজেন্সির আড়ংসমূহকে আবার বিভিন্ন হুড়ায় বিভক্ত করা হয়েছিল। তমলুক ও মহিষাদল যথাক্রমে চার ও সাতটি হুড়ায় বিভক্ত ছিল। লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এসব হুড়া ছিল স্বাধীন। তমলুক এজেন্সির কেন্দ্রীয় গুদাম নির্মাণ করা হয়েছিল ঘাটনারায়ণপুর নামক স্থানে। টেংরাখালি ও রূপনারায়ণ নদী এবং প্রতাপখালি খাল দিয়ে বিভিন্ন আড়ং থেকে ঘাটনারায়ণপুরের কেন্দ্রীয় গুদামে লবণ আনয়ন করা হতো। এজেন্সির প্রায় সব লবণই

---

[২৮] *The Calcutta Review*, Vol. III, January-June 1845, p. 197.

[২৯] প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

[৩০] *The Calcutta Review*, Vol. III, January-June 1845, p. 196.

[৩১] *The Calcutta Review*, Vol. III, January-June 1845, p.197.

[৩২] *British Parliamentary Papers,* 1831-32, Vol. IX, p. 79. (এর পর থেকে *BPP* হিসেবে উল্লেখ করা হবে; সব ক্ষেত্রেই *East India Colonies* সিরিজ ব্যবহৃত হয়েছে)।

[৩৩] *BPP*, 1831-32, Vol. IX, p. 36.

[৩৪] *BPP* 1831-32, Vol. IX, p. 79.

[৩৫] *Calcuuta Review*, Vol. III, January-June 1845, 196; *BPP*, 1831-32, Vol. IX, p. 79.

[৩৬] B. Barui, *op.cit.,* pp. 5-6; *BPP*, 1831-32, Vol. IX, p. 77.

[৩৭] *BPP,* 1856, Vol. XXVI, p. 411.

নৌকাযোগে পরিবাহিত হয়ে কেন্দ্রীয় গুদামে আসতো। অবশ্য স্বল্প পরিমাণ লবণ পরিবাহিত হতো গরুর গাড়ির মাধ্যমে।[৩৮]

হিজলি এজেন্সি: হিজলি ছিল বাংলার সর্ববৃহৎ এজেন্সি। এর সদর দপ্তর কোনটাই নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। বীরকুল, বাহারিমুটা, নুরুয়ামুটা, এরাঁচ, মাজনামুটা, বোগরাই, জ্বালামুটা, আওরঙ্গনগর ও গুমগড় নামক নয়টি আড়ং সমন্বয়ে এজেন্সিটি গঠিত হয়েছিল।[৩৯] প্রথমোক্ত ছয়টি আড়ং ৮৩টি হুডায় বিভক্ত ছিল। শেষোক্ত তিনটি আড়ং কয়টি হুডায় বিভক্ত ছিল, সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা দুষ্কর। কারণ এ সংক্রান্ত তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। হিজলি এজেন্সিতে বোগরাই থেকে খেজরী পর্যন্ত রসুলপুর, পিচাবানী, বাগদা, বোরোজ ও সুরপাই নদীর তীরবর্তী এলাকা জুড়ে খলাড়িসমূহ বিস্তৃত ছিল।[৪০] এজেন্সিটির কেন্দ্রীয় গুদাম ছিল হিজলিতে।[৪১] এখানকার বেশিরভাগ লবণও নৌকাযোগে কেন্দ্রীয় গুদামে আনয়ন করা হতো। প্রচুর পরিমাণ লবণ উৎপাদিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় গুদাম ছাড়াও এজেন্সিটির এলাকাধীন বিভিন্ন স্থানে লবণের ডিপো স্থাপন করতে হয়। এসব সরকারি ডিপো রসুলপুর, কৃষ্ণগড়, রামনগর, উত্তর কালীনগর ও পুরীঘাটা ঘাটে স্থাপন করা হয়েছিল।[৪২]

২৪-পরগনা: ২৪-পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে লবণ উৎপাদিত হতো। এছাড়া কলকাতা পরগনার কুলবেড়িয়া ছিল উল্লেখযোগ্য লবণ উৎপাদন কেন্দ্র। জেলার হাতিয়াগড়, শাহপুর, ময়দানমল, মাগড়া, মুড়াগাছা, পেঁচাকুলি, আজিমাবাদ, মাঈদা, হাসিমাবাদ, বালিয়া, দক্ষিণ সাগর, কোদেয়া ও কসিপুর ছিল গুরুত্বপূর্ণ লবণ উৎপাদন কেন্দ্র।[৪৩] ১৭৭৪ সালের একটি হিসেবে দেখা যায়, ২৪-পরগনা এজেন্সিতে খলাড়ির সংখ্যা ২,৬০০-এর ওপরে। এসব খলাড়িতে ১৮,৬৫৫ জন মলঙ্গি নিয়োজিত ছিল এবং এর বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৪,৬৫,০০০ মণ।[৪৪]

বুলুয়া বা নোয়াখালি: বুলুয়া বা নোয়াখালির উল্লেখযোগ্য লবণ উৎপাদন ক্ষেত্রগুলো হলো—লালগঞ্জ, নিজ ভুলুয়া, দক্ষিণ শাহবাজপুর, ধনিয়া-মনিয়া, বামনা, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, চরহাজারী ও জগদিয়াদুরা। নোয়াখালি অঞ্চলে চরের লবণ ক্ষেত্রসমূহ তদারকের জন্য ১৭৯০ সালে কোম্পানি সুধারামে একজন এজেন্ট নিয়োগ করে।[৪৫] কোম্পানি আমলে নোয়াখালিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লবণ উৎপাদিত হতো এবং তা চট্টগ্রাম হয়ে কলকাতার বাজারে চলে আসতো।

যশোর: ঔপনিবেশিক আমলে যশোর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবন অঞ্চলে লবণ উৎপাদিত হতো। এ অঞ্চলসমূহ রায়মঙ্গল এজেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর সদর দপ্তর ছিল খুলনায়। এজেন্সিটির উল্লেখযোগ্য লবণ ক্ষেত্র হলো খুলনা, রায়মঙ্গল, শিবপুর, সৈয়দপুর, কঙ্গী, হাসনাবাদ, সূতীবন্দর, বালিয়া পয়লাহাটি, হোগলা এবং ইউসুফপুর।[৪৬]

---

[৩৮] B. Barui, *op.cit.*, p. 6.

[৩৯] *BPP*, 1856, Vol. XXVI, p. 469.

[৪০] B. Barui, *op.cit.*, p. 7.

[৪১] *Ibid.*

[৪২] *Ibid.*

[৪৩] *Ibid*, p. 8.

[৪৪] *Calcutta Committee of Revenue Proceedings*, November 1776, Vol. XV, Appendix; উদ্ধৃত, B. Barui, *op.cit.*, p. 8.

[৪৫] W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. VI, (Delhi: D.K. Publishing House, 1973, First Pub. London: Trubner & Co., 1876) p. 247.

[৪৬] B. Barui, *op.cit.*, p. 8.

চট্টগ্রাম এজেন্সি: চট্টগ্রাম এজেন্সির সদর দপ্তর ছিল চট্টগ্রাম। জেলার সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় লবণ উৎপন্ন হতো। এ এজেন্সির দু'টি উল্লেখযোগ্য আড়ং হলো জুলদা ও বাহারচর। চট্টগ্রাম এজন্সিতে আড়ংসমূহ মোকাম নামক উপবিভাগে বিভক্ত ছিল। মোকামসমূহ আবার ছিল বিভিন্ন কিতাবুত-এ বিভক্ত। পাঁচ'শ-এর বেশি খলাড়ি সমৃদ্ধ চট্টগ্রাম এজেন্সির জুলদা আড়ং দশটি মোকামে বিভক্ত ছিল। এ আড়ং-এ প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদিত হতো। কুতুবদিয়া এবং মধুরবাড়ি নামক দু'টি দ্বীপ নিয়ে বাহারচর আড়ং গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহ এর আওতাভুক্ত হয়। ২১টি মোকামে বিভক্ত এই আড়ং-এ পাঁচ'শ খলাড়িতে লবণ উৎপন্ন হতো। এর বাৎসরিক গড় উৎপাদন ছিল তিন থেকে চার লক্ষ মণ।[৪৭] চট্টগ্রাম এজেন্সিতে জাট এবং তেলিনিয়া নামক দুই ধরনের লবণ উৎপন্ন হতো।[৪৮] জাটের তুলনায় তেলেনিয়া লবণ অধিকতর মানসম্পন্ন ছিল। চট্টগ্রাম জেলার স্থানীয় মলঙ্গিরা তেলেনিয়া লবণ উৎপাদন করতো। অন্যদিকে জাট লবণ তৈরি করতো অন্য জেলা থেকে আগত মলঙ্গিরা। চট্টগ্রাম এজেন্সিতে উৎপাদিত মোট লবণের তিন-চতুর্থাংশ ছিল জাট এবং এক-চতুর্থাংশ ছিল তেলিনিয়া।

চট্টগ্রামে সামুদ্রিক উৎস ছাড়া লবণাক্ত ঝর্না ও অন্যান্য পাহাড়ি উৎস থেকে লবণ পাওয়া যেতো। এক্ষেত্রে লবণাক্ষ নামক লবণ ঝর্নার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ঝর্নাটি সীতাকুণ্ডের তীর্থস্থান[৪৯] থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।[৫০] সেন্দুস নামক উপজাতি ঝর্না থেকে লবণ আহরণ করতো।[৫১] চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলেও কয়েকটি লবণ ক্ষেত্র (salt-licks) ছিল। জেলার উত্তরাঞ্চলের ভাঙামুড়া ও পূর্বাঞ্চলের মাও ডাং ক্ল্যাং পাহাড়ের লবণ ক্ষেত্রের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। কুকি নামক এক শ্রেণীর মানুষ এসব ক্ষেত্র থেকে লবণ আহরণ করেতো। ধূসর রঙের এই লবণ স্থানীয় চাহিদা মেটাতো।

লবণ শিল্পে কর্মসংস্থান

বাংলার লবণ শিল্পে নিয়োজিত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল মলঙ্গি ও কুলি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, লবণ উৎপাদন কেন্দ্র খলাড়ি থেকে গোলায় লবণ পরিবহন করা হতো নৌকার মাধ্যমে। প্রতিটি নৌকায় গড়ে পাঁচ জন করে লোক নিযুক্ত থাকতো। খলাড়ি নদী বা খাল থেকে দূরে অবস্থিত হলে লবণ পরিবহনের ক্ষেত্রে গরুর গাড়ির সাহায্য নেওয়া হতো। প্রতিটি গাড়িতে একজন করে ঠিকাদার ও গাড়োয়ান থাকতো। লবণ ওজনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল কয়াল। কয়াল ছাড়াও প্রতিটি লবণ ইউনিটে এক জন মুহরি ও ছয় জন চপ্পাদার থাকতো। চপ্পাদাররা ওজনের স্থানে লবণ বয়ে আনতো। এছাড়া সল্ট এজেন্টের অধীনে অনেক স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারী নিযুক্ত ছিল।[৫২] তাই এই শিল্পে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

বাংলার লবণ শিল্পে কর্মরত মানুষের সংখ্যা কম ছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত হতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সুপ্রকাশ রায় মন্তব্য করেছেন যে, বাংলার লবণ শিল্পে নিয়োজিত মলঙ্গির সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ মতো।[৫৩] অবশ্য তিনি এই পরিসংখ্যানের কোনো উৎস

---

[৪৭] *Ibid*, p. 9.

[৪৮] *BPP*, 1856, Vol. XXVI, p. 478.

[৪৯] সীতাকুণ্ডের একটি ঝর্নাকে হিন্দুরা পবিত্র তীর্থ স্থান বলে মনে করতো। এখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হিন্দুরা পুণ্যার্জনের জন্য আগমন করতো।

[৫০] W.W. Hunter, *op.cit*, Vol. VI, pp. 132-133.

[৫১] B. Barui, *op.cit.*, p. 10.

[৫২] *BPP*, 1856, Vol. XXVI, p. 447.

[৫৩] সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* (কলকাতা: বুকওয়ার্ল্ড, ১৯৯৩), পৃ. ৯৯।

উল্লেখ করেননি। সেই সঙ্গে কোন সময়ে এতো বেশি মানুষ লবণ শিল্পে কর্মরত ছিল তাও তিনি বলেননি। ১৭৬৭ সালে বাংলার জনসংখ্যা ছিল ১,৫০,০০,০০০। উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে এই সংখ্যা ৪,১৫,০০,০০০-এ উন্নীত হয়।[৫৪] এর প্রায় অর্ধেক ছিল নারী যারা পুরুষদের মতো কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসেনি। আবার পুরুষ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল শিশুসহ অপ্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ, যাদেরকেও কর্মজীবী হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। তাই কর্মজীবী মানুষ পুরুষ জনগোষ্ঠীর শতকরা ষাট বা সত্তর ভাগের বেশি হবার কথা নয়, যা মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ শতাংশ মাত্র। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হলে ১৭৬৭ সালে বাংলায় কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০,০০,০০০। শেষোক্ত হিসেব বিবেচনায় আনলেও এ সংখ্যা ১,৪০,০০,০০০-এর বেশি হয় না। এই ক্ষুদ্রায়তনের কর্মজীবী জনগোষ্ঠীতে শুধুমাত্র মলঙ্গির সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ—এমন মনে করা যৌক্তিক হবে না।

১৮৫০-এর দশকের একটি হিসেবে দেখা যায়, ভারতের লবণ শিল্পে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা লক্ষাধিক। বাংলায় এ সংখ্যা ষাট থেকে সত্তর হাজারের মধ্যে।[৫৫] অবশ্য এ হিসেব থেকেও বাংলার লবণ শিল্পে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। কারণ বাংলায় লবণ উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে এ সময়ে অর্ধেকে অবনমিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে হ্রাস পেয়েছিল। এর আগে আরো বেশি সংখ্যক মানুষ শিল্পটিতে নিয়োজিত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

১৮৩২ সালে পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য প্রদান কালে মি. ক্রোফুর্ট বাংলায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার মানুষ লবণ উৎপাদনে নিয়োজিত আছে বলে মন্তব্য করেন।[৫৬] এ সংখ্যা যৌক্তিক বলে মনে করা যেতে পারে। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে সুন্দরবন অঞ্চলে এক লক্ষ মতো শ্রমিক লবণ উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৭] ১৮৫৩ সালে তমলুকের এজেন্ট একটি জরিপ পরিচালনা করেন। তার হিসেব মোতাবেক এজেন্সিটিতে কর্মরত মানুষের সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার ছয় শত পঁচিশ জন।[৫৮] এই দুটি হিসেব বিবেচনা করলে সমগ্র বাংলায় লবণ ক্ষেত্রে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা লক্ষাধিক হওয়া স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

কোম্পানি প্রবর্তিত ব্যবস্থাদি

মুসলিম আমলে লবণ শিল্প ছিল বাংলার অন্যতম বৃহৎ শিল্প।[৫৯] এ সময়ে লবণ উৎপাদনের এলাকা সমূহকে নিমক মহাল বলা হতো। বিভিন্ন জমিদারির অন্তর্ভুক্ত এসব মহালে হাজার হাজার মলঙ্গি লবণ

---

[৫৪] *Appendix to the Report from the Select Committee on Salt, British India, 1836*, p. 194; উদ্ধৃত, B. Barui, *op.cit,* p. 62.

[৫৫] *Ibid,* pp. 61-62.

[৫৬] *BPP,* 1856, Vol. XXVI, p. 447.

[৫৭] Edward Balfour (ed.), *Cyclopaedia of India and of Eastern and Southern Asia; Commercial, Industrial and Scientific Products of the Mineral, Vegetable and Animal Kingdoms, Useful Arts and Manufacture* (Madras: Lawrence and Adelphi Presses, 1873), p. 83.

[৫৮] মলঙ্গি ২,৩০৩; কুলি ১৪,৪০৭; মাঝি-মাল্লা ২,৫০০; গাড়োয়ান ১০০; অস্থায়ী জনশক্তি ৫৭৫; ওজনক্ষেত্রে নিযোজিত ৬৪০ এবং স্থায়ী জনশক্তি ১০০; মোট ২০,৬২৫। *BPP,* 1856, Vol. XXVI, p. 447.

[৫৯] J.K. Nag, *op.cit,* p. 300; †মাগল শাসনামলে বাংলায় লবণের ব্যাপক চাহিদা ছিল বলে আবুল ফজল মন্তব্য করেছেন। দেখুন, Abl Fazl-i-Allami (tr. by Jerrett), *Ain-i-Akbari* (Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, n.d.), p 135.

উৎপাদন করতো। লবণ উৎপাদন তদারকের দায়িত্ব ছিল সংশ্লিষ্ট জমিদারের ওপর।[৬০] উৎপাদন শেষে মলঙ্গিরা জমিদারের গোলায় লবণ জমা দিতো। জমিদার সেখান থেকে বিভিন্ন বণিকের নিকট লবণ বিক্রি করতো। আর বণিকেরা দেশের বাজারসমূহে তা সরবহার করতো। ব্রিটিশ অধিগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত লবণ উৎপাদন এবং বিপননের এই ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত ছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভের পর কোম্পানি আর্থিক সুবিধা আদায়ে সচেষ্ট হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করা ছিল এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কোম্পানি কর্মচারীরাও এই সুযোগ গ্রহণে প্রয়াসী হয়। তারা লবণসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রীর বিনাশুল্ক বাণিজ্যাধিকার লাভে সচেষ্ট হলে নবাবের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। ১৭৬৪ সালে কোম্পানি নবাব মির কাশিমের সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধের পেছনে লবণ বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধার প্রশ্ন অন্তর্নিহিত ছিল। যুদ্ধে মির কাশিম পরাজিত হন। এর পর কোম্পানি মির জাফর আলী খানকে দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় বসায়। ১৭৬৩ সালের ১০ জুলাই কোম্পানি মির জাফরের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তিটির ৩ নং ধারা মোতাবেক কোম্পানির কর্মচারীগণের জন্য লবণ ব্যবসার শুল্ক শতকরা আড়াই (২.৫%) রুপিতে অবনমিত করা হয়।[৬১] উল্লেখ করা দরকার যে, চুক্তিটিতে কোম্পানি কর্মচারীগণকে লবণ ভিন্ন অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে বিনাশুল্ক বাণিজ্যাধিকার প্রদান করা হয়েছিল।[৬২]

অবশ্য কোম্পানির 'কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স' কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যাধিকার প্রদানের পক্ষপাতী ছিল না। ১৭৬৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি 'কোর্ট' কোম্পানি কর্মচারীদের যে কোনো ধরনের ব্যক্তিগত বাণিজ্য (Private trade) নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একটি আদেশ জারি করে।[৬৩] এই আদেশের পরেও কোম্পানি কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের বিলুপ্তি ঘটেনি। তারা বেনামিতে লবণসহ অন্যান্য পণ্যের বাণিজ্য অব্যাহত রাখে। কোম্পানির কর্ণধার রবার্ট ক্লাইভ কোর্টের আদশের তোয়াক্কা না করে লবণ, সুপারি ও তামাকের ব্যবসা পরিচালনার জন্য কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি 'ট্রেড সোসাইটি' গঠন করেন।[৬৪] সোসাইটির ওপর উপরোক্ত পণ্যসমূহের একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার অর্পন করা হয়। স্থির হয় যে, সোসাইটি লবণ বিক্রির অর্থের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ (৩৫%) কোম্পানিকে রাজস্ব হিসেবে প্রদান করবে। রবার্ট ক্লাইভ এ সময়ে লবণের দামও নির্ধারণ করে দেন। পূর্ববর্তী কুড়ি বছরের গড় দামের চেয়ে শতকরা

---

[৬০] J.K. Nag, *op.cit,* p. 300.

[৬১] *The Calcutta Review*, January-June, 1847, p. 528, 530.

[৬২] মির জাফরের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে বলা হয়: 'But the English were to carry on their trade free from all duties, taxes, and impositions in all parts of the country, excepting the article of salt, on which a duty of 2.5 per. cent. should be levied on the Hugli market price'. দেখুন, G. Forrest, *The Life of Lord Clive*, Vol. II, (London: Cassel & Co., 1918), p. 298.

[৬৩] কোর্ট এ আদেশে বলে: ' That from the receipt of this letter, a final and effectual end be forthwith put to the inland trade in salt, beetle nut, tobacco, and in all other articles whatsoever, produced and consumed in the country; and that all European and other Agents, or Gomastahs, who have been concerned in such trade, be immidiately ordered down to Calcutta, and not suffered to return, or be replaced as such, by any other persons.' দেখুন, G. Forrest, *op.cit*, p. 298; আরো দেখুন, *The Calcutta Review*, January-June, 1847, p. 530.

[৬৪] কেরানি (writer), মেজরের নিচের র‍্যাংকের সামরিক কর্মকর্তা, ধর্মযাজক (chaplian) ও সার্জন ছাড়া যে কোন কোম্পানি কর্মচারী এই সোসাইটির সদস্য হতে পারবে বলে নিয়ম রাখা হয়। এর মূলধন প্রদানের দায়িত্বও ছিল সদস্যদের। সদস্যদের দু'টি এবং গভর্নরের পাঁচটি শেয়ার ছিল। দেখুন, G. Forrest, *op.cit,* p. 302.

পনের ভাগ (১৫%) কম দাম নির্ধারিত হয়।[৬৫] নিয়ম করা হয় যে, ট্রেড সোসাইটির মাধ্যমে দেশের সমস্ত লবণ উৎপাদন ও বিপণন করা হবে। সোসাইটির হুকুমের বাইরে কোনো লবণ উৎপাদন বা বিক্রি করা যাবে না।[৬৬] ১৭৬৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর একটি আইনের (Regulation) মাধ্যমে এ ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়।[৬৭] এতে লবণ বাণিজ্যে সোসাইটির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ট্রেড সোসাইটি' মলঙ্গিদের উৎপাদিত লবণের একমাত্র ক্রেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সোসাইটি মলঙ্গিদের দাদন দেয় এবং তাদের উৎপাদিত লবণ ইচ্ছামতো দামে ক্রয় করে। মলঙ্গিদের ওপর শুরু হয় আর্থিক শোষণ।

'ট্রেড সোসাইটি'কে লবণ বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার প্রদান কোম্পানির কর্মচারীরা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। ইংল্যান্ড থেকে কর্মচারী সংগ্রহের সময়ে কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দিতো। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ছিল বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করতে দেয়ার প্রলোভন।[৬৮] বাংলায় আগমনের পর বেশিরভাগ কর্মচারী বিভিন্ন বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এধরনের একটি কর্মচারী গোষ্ঠীর পক্ষে লবণের মতো লাভজনক ব্যবসা থেকে দূরে থাকা সম্ভব ছিল না। সোসাইটিকে লবণ বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করায় এরা, বিশেষ করে নবীন ইংরেজ কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ হয়। এরা লবণ উৎপাদন ও বিপনন ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের সুযোগ দানের দাবি উত্থাপন করে। এদের দাবির মুখে কোম্পানি ট্রেড সোসাইটির পাশাপাশি ব্যক্তিগত বণিকদেরকেও লবণ ব্যবসায়ের অনুমতি দেয়। ১৭৬৮ সালে 'কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স' আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে একটি আদেশ জারি করে ট্রেড সোসাইটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে। সেই সঙ্গে কোম্পানি কর্মচারীদের পাশাপাশি দেশীয় বণিক এবং জমিদারদেরকেও লবণের ব্যবসা করার সুযোগ দেয়।[৬৯] সেই সঙ্গে কোম্পানি প্রতি শত মণ লবণের জন্য ৩০ রুপি পরিবহণ শুল্ক আরোপ করে। ইউরোপীয় এবং দেশীয় সব বণিকদের ওপর এই শুল্ক প্রবর্তিত হয়।[৭০] মনে রাখা দরকার, পরিবহণ শুল্ক ছাড়াও লবণের ওপরে 'খলাড়ি কর' নামক এক ধরনের উৎপাদন কর প্রচলিত ছিল। লবণ উৎপাদনকারীগণকে সরকারি রাজস্ব বিভাগে এই কর জমা দিতে হতো।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে লবণের ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করা হলে কেম্পানির কর্মচারীরা লবণ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব কর্মচারী দেশীয় গোমস্তাদের সাহায্যে লবণের ব্যবসা পরিচালনা করে।[৭১] সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দেশীয় বণিকেরা এক্ষেত্রে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। লবণের ব্যবসায় আগ্রহী কর্মচারীদের কোম্পানি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করায় দেশীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারা ক্রমান্বয়ে লবণ ব্যবসা থেকে বিতাড়িত হয়। ফলে ব্যবসাটিতে ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আপাত দৃষ্টিতে অবস্থাটি কোম্পানির জন্য সুখকর মনে হলেও এর ফলাফল হয় ভিন্ন। কোম্পানির কর্মচারীরা বিভিন্ন ভাবে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে লবণের ব্যবসা চালিয়ে যায়। ফলে কোম্পানি রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়।

---

[৬৫] H.R. Ghosal, *Economic Transition in the Bengal Presidency (1793-1833)* (Calcutta: Firma KL Mukhopadhyay, 1966), p. 95.

[৬৬] *The Calcutta Review*, January-June, 1847, p. 539.

[৬৭] H.R. Ghosal, *op.cit*, p. 95.

[৬৮] সুপ্রকাশ রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯২।

[৬৯] *The Calcutta Review*, January-June 1847, p. 542; H. R. Ghosal, *op.cit*, pp. 95-96.

[৭০] N.K. Sinha, *Economic History of Bengal*, Vol. I (CAlcutta: Firma KL Mukhopadhyay, 1965), p. 217; H.R. Ghosal, *op.cit*, p. 96.

[৭১] B. Barui, *op.cit,* p. 21.

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর লবণ উৎপাদনের ব্যক্তিগত অধিকার হরণ করেন। তখন থেকে কোম্পানি লবণ উৎপাদনের একমাত্র মালিক।[৭২] তবে, কোম্পানি নিজে লবণ উৎপাদন না করে বিভিন্ন ব্যক্তিকে পাঁচ বছরের জন্য খলাড়িসমূহ পত্তনি প্রদান করে। পত্তনির শর্ত মোতাবেক প্রত্যেক পত্তনিদার উৎপাদিত সমূদয় লবণ নির্ধারিত মূল্যে কোম্পানির নিকট বিক্রি করতে বাধ্য ছিল। ক্রয়কৃত লবণ সরকারি গুদামে সংরক্ষণপূর্বক কোম্পানি দেশীয় ব্যবসায়ীদের তা সরবরাহ করতো।[৭৩] সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বাজার দাম বেশি হওয়ায় এবং খলাড়িসমূহের ওপরে পূর্ণ কর্তৃত্ব আরোপ করতে না পারায় লবণ বাণিজ্যে 'কালোবাজারি'র সূচনা হয়। লবণের ওপর কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ ক্রমাগত শিথিল হতে থাকে। এমতাবস্থায় হেস্টিংস পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। ১৭৭৬ সালে তিনি পত্তনির মাধ্যমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে লবণ উৎপাদন ও বিপননের অধিকার প্রদান করেন।[৭৪] অবশ্য পত্তনিদারদের জন্য ব্যবস্থাটি তেমন সুবিধাজনক ছিল না। তারা ক্রমান্বয়ে অনীহ হয়ে পড়লে হেস্টিংসের এই পরিকল্পনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোম্পানি নতুনভাবে একচেটিয়া অধিকার আরোপ করে লবণ উৎপাদন ও বিপননের সার্বিক দায়িত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করে।[৭৫] ইউরোপীয় ঠিকাদারদের আনয়ন করে বাংলার লবণ-জেলাসমূহে বসিয়ে দেওয়া হয়। উৎপাদিত লবণ কোম্পানি নির্ধারিত দামে ক্রয় করে তা নগদ মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করে। প্রথমদিক থেকেই কলকাতার কাউন্সিল গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে এক্ষেত্রে একমত হতে পারেনি। কাউন্সিল এই ব্যবস্থাটি পরিবর্তনের দাবি জানায়। তবে, প্রত্যাশিত পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ নিশ্চিত হওয়ায় গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের বিরোধিতা উপেক্ষা করে ব্যবস্থাটি অপরিবর্তিত রাখেন। কর্নওয়ালিসের সময়ে নিয়ম কানুনের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হলেও ১৮৬২ সালে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রত্যার্পনের পূর্ব পর্যন্ত এ ব্যবস্থা অপরিবর্তিত ছিল।

কোম্পানির লাভ-ক্ষতি

সরকারি গুদামে পৌঁছা পর্যন্ত প্রতি শত মণ লবণের জন্য কোম্পানিকে খরচ করতে হতো একশত রুপির মতো। অর্থাৎ প্রতি শত মণ লবণ সংগ্রহে কোম্পানির খরচ হতো এক রুপি।[৭৬] বাংলার জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারি গুদাম থেকে বছরে চার বার লবণ বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে এসে এ নিয়ম পরিবর্তন করে প্রতি মাসে একবার করে লবণ বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়।[৭৭] কোম্পানি কলকাতা থেকে প্রতিবার পাঁচ'শ মণের বেশি লবণ বিক্রি করতো।[৭৮] বিক্রির সময়ে লবণের দাম সরবরাহকৃত লবণের পরিমাণ, লবণের মান এবং ক্রেতার সংখ্যার ওপরে ভিত্তি করে ওঠানামা করতো। ১৮৩২ সালের হিসেবে মোতাবেক এর পূর্ববর্তী দশ বছরে প্রতি মণ লবণের গড় দাম ছিল তিন রুপি আট আনার ওপরে।[৭৯] তাই বলা চলে, প্রতি মণ লবণে কোম্পানির দুই রুপি আট আনার বেশি লাভ হতো। এক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ বিনিয়োগের শতকরা আড়াই শত ভাগের (২৫০%) ওপরে।

---

[৭২] H. R. Ghosal, *op.cit,* p. 96.
[৭৩] B. Barui, *op.cit,* pp. 22-24.
[৭৪] H. R. Ghosal, *op.cit,* p. 96.
[৭৫] *Ibid.*
[৭৬] *BPP*, 1831-32, Vol. IX, p. 79.
[৭৭] *BPP*, 1831-32, Vol. IX, p. 79.
[৭৮] *BPP*, 1831-32, Vol. IX, p. 80.
[৭৯] *BPP*, 1831-32, Vol. IX, p. 80.

উপরের পরিসংখ্যান থেকে একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, লবণ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির নিকট অত্যন্ত লাভজনক কারবার ছিল। যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন হতে থাকায় লবণ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির অন্যতম প্রধান রাজস্ব আয়ের উৎসে পরিণত হয়। উনিশ শতকে এটি ছিল কোম্পানি সরকারের দ্বিতীয় প্রধান রাজস্ব আয়ের খাত। উল্লেখ করা দরকার যে, এ সময়ে দেশের প্রধান রাজস্ব আয়ের খাত ছিল ভূমি রাজস্ব। লবণ খাতের অবস্থান ছিল ঠিক এর পরেই। নিচের সারণিতে ১৮০৩-৪ থেকে ১৮২৬-৭ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলায় কোম্পানির লবণ থেকে আহরিত আয়ের পরিমাণ প্রদর্শিত হলো।

সন	খ্রিস্টাব্দ	মোট gross আয় রুপি	মোট net আয় রুপি
১২০৯	১৮০৩-৪	১,৪৮,৩৩,৮৬৬	১,২১,৯৯,৩৯০
১২১০	১৮০৪-৫	১,৪৭,৫৭,৪৮৯	১,১৩,২৫,৭৫২
১২১১	১৮০৫-৬	১,৪০,৭৩,২৩৯	১,০৬,১৩,৮৮৩
১২১২	১৮০৬-৭	১,২০,৮৫,৮১২	৮৮,২৬,৫২২
১২১৩	১৮০৭-৮	১,৬০,১৫,৪৪১	১,২৩,০৭,৩৫৯
১২১৪	১৮০৮-৯	১,৬৫,১২,১৬৮	১,২৮,৭৭,৫০২
১২১৫	১৮০৯-১০	১,৪২,৫৬,৫৬০	১,০৬,২১,৬৫৫
১২১৬	১৮১০-১১	১,৫৪,০৭,৫৯৪	১,১৪,৬৩,৪১৯
১২১৭	১৮১১-১২	১,৫০,৯১,৮৯৩	১,১৩,৫৩,৩৯৪
১২১৮	১৮১২-১৩	১,৫৯,৫১,৫৯২	১,১৫,৮৪,৫৭৫
১২১৯	১৮১৩-১৪	১,৬৯,৬৬,১১৬	১,২১,৯৬,০৮৪
১২২০	১৮১৪-১৫	১,৪২,৫৫,৯৫৬	১,০১,৮৭,৬৬৭
১২২১	১৮১৫-১৬	১,২১,৮৮,২৯৪	৮৮,৩৪,৫৬৮
১২২২	১৮১৬-১৭	১,৪২,৩৫,৩১২	৯৬,৫৭,২৫১
১২২৩	১৮১৭-১৮	১,৪৭,৬৮,৩২০	১,০৪,৬৬,০৩০
১২২৪	১৮১৮-১৯	১,৬০,৯০,৭৯৫	১,১১,৪২,৬৩৯
১২২৫	১৮১৯-২০	১,৬৮,৬৩,০৪০	১,১৭,০৭,৩৫২
১২২৬	১৮২০-২১	১,৭২,৬৩,৮৬২	১,২৩,২৭,৫৮৭
১২২৭	১৮২১-২২	১,৯২,৫৫,৬১১	১,৪০,৯৭,৩৮৭
১২২৮	১৮২২-২৩	২,০০,১২,৪৩৬	১,৫৩,৪৭,০৪৯
১২২৯	১৮২৩-২৪	১,৮৪,৮৮,০৮০	১,২৯,৪৭,৩৯৭
১২৩০	১৮২৪-২৫	১,৭৭,৯৫,৮৯৭	১,১৩,৬৭,৩২৬
১২৩১	১৮২৫-২৬	১,৭০,৩৬,০০৯	১,১৩,৪৬,৮২৫
১২৩২	১৮২৬-২৭	২,১১,৩৪,০৩৮	১,৫১,২৬,৮৬৬

উৎস: *British Parliamentary Papers,* 1831-32, Vol. IX, Appendix 138, p. 684.

দ্বিতীয় বৃহত্তর রাজস্ব আয়ের খাত হিসেবে বিপুল পরিমাণ অর্থাগমের বিষয় হওয়ায় লবণ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির নিকট খুবই গুরুত্ববহ ছিল। এটি শুধুমাত্র বাণিজ্যই ছিল না, বরং ইতোমধ্যেই রাজস্ব বিষয়ে পরিগণিত হয়েছিল। বাংলা সরকারের ভূমি বিভাগের সচিব (Secretary to the territorial department of Bengal) হল্ট ম্যাকেঞ্জি পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দান কালে লবণ ব্যবস্থাপনাকে, "with a view to revenue, not trade" বলে মন্তব্য করেন।[৮০]

মলঙ্গিদের অবস্থা

ব্রিটিশ পূর্ব আমলে জমিদাররা মলঙ্গিদের মাধ্যমে লবণ উৎপাদন করাতো। লবণের বণিকেরা এক্ষেত্রে জমিদারকে আগাম অর্থ প্রদান করতো। এই অর্থ থেকে জমিদাররা গ্রাম প্রধান মুকাদ্দমদের মাধ্যমে

[৮০] H.R. Ghosal, *op.cit*, p. 95.

মলঙ্গিদের দাদন দিতো। দাদন বিতরণের ক্ষেত্রে মুকাদ্দমরা মলঙ্গি প্রধানের সহায়তা নিতো। দাদনের শর্ত মোতাবেক মলঙ্গিরা নির্দিষ্ট মূল্যে নির্ধারিত পরিমাণ লবণ উৎপাদন করে তা জমিদারের গোলায় উঠিয়ে দিতে বাধ্য ছিল। চুক্তির চেয়ে বেশি লবণ উৎপাদন করলে জমিদার অতিরিক্ত লবণের মূল্য প্রদান করতো। অন্যদিকে, লবণ উৎপাদন কম হলে মলঙ্গিকে দাদন থেকে অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিতে হতো।[৮১] লবণ উৎপাদনের জন্য জমিদাররা মলঙ্গিদের নিকট থেকে খলাড়ির ভাড়া নিতো। এছাড়া তারা মলঙ্গিদের নিকট থেকে লবণ ক্রয় করে বণিকদের নিকট তা বেশি দামে বিক্রি করতো। এভাবে লবণের কারবার থেকে অনেক অর্থ আহরণ করে জমিদাররা বেশ প্রতিপত্তির মালিক হয়ে বসেছিল। মুসলিম শাসকগণ লবণ মহালের অধিকারী জমিদারদের বিশেষ মর্যাদার চোখে অবলোকন করতেন। তারা লবণ-জমিদারদের *বাকার-উল-তাজ্জাব, মালি-উল-তাজ্জাব* প্রভৃতি সম্মানিত খেতাবে ভূষিত করেন।[৮২] মোগল শাসনামলে লবণের ব্যবসাকে রাজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মোগল শাসকগণ সরকারি নিয়ন্ত্রণে লবণ উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার পত্তন ঘটান।[৮৩] অবশ্য, এ সময় পর্যন্ত লবণ উৎপাদনকারী মলঙ্গিদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়নি। মলঙ্গিরা বছরের মাত্র তিন মাস সময় লবণ উৎপাদন করতো। এর পাশাপাশি তারা চাষাবাদও করতো। জমিদারগণ তাদেরকে বিশেষ হ্রাসকৃত খাজনায় চাষাবাদের জমি দিতেন। ফলে এ সময় পর্যন্ত লবণ উৎপাদন মলঙ্গিদের জন্য তেমন কোন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি।

ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তনের পর লবণ উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন সাধিত হয়। কোম্পানি প্রবর্তিত নতুন ব্যবস্থা মলঙ্গিদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সমসাময়িক কালের একটি হিসেব থেকে জানা যায় যে, প্রতি শত মণ লবণের উৎপাদন ব্যয় ছিল ৫০ রুপির মতো।[৮৪] বলা বাহুল্য কোম্পানি মলঙ্গিদের নিকট থেকে প্রায় একই মতো দামে লবণ ক্রয় করতো। ফলে উৎপাদন করে মলঙ্গিদের তেমন লাভ হতো না। ১৭৮৯ সালের একটি হিসেবে দেখা যায়, ২৪-পরগনা জেলার কলকাতা পরগনার ভালো খলাড়িতে সাত মাসের মৌসুমে এক জন মলঙ্গি আয় করতো ১০ রুপি ১৪ আনা ৯ পাই। অর্থাৎ এসব খলাড়িতে এক জন মলঙ্গির মাসিক আয় ছিল ১ রুপি ৬ আনা ৯ পাই। অন্যদিকে মন্দ খলাড়িতে কর্মরত একজন মলঙ্গির সাত মাসের মৌসুমে আয় ছিল ৩ রুপি ১০ আনা। অর্থাৎ এদের মাসিক আয় দাঁড়ায় মাত্র ৭ আনা ৬ পাই।[৮৫] মনে রাখা দরকার, মলঙ্গিদের এই আয় প্রচলিত মজুরির চেয়ে অনক কম ছিল। ফলে মলঙ্গিরা লবণ উৎপাদনে অনীহ হয়ে পড়ে। হিজলির এজেন্ট ডব্লিউ. হেওয়েটের (W. Hewett) মন্তব্য থেকে একথার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৯২ সালের ৩০ জুন বোর্ড অব ট্রেডকে লেখা একটি পত্রে তিনি লেখেন, "... as the molungies fall by death it is next to impossible to replace them at the present rates of pay..."[৮৬]

অবশ্য এটি মলঙ্গিদের লবণ উৎপাদনে অনীহার একমাত্র কারণ ছিল না। পূর্বে মলঙ্গিরা বছরে তিন মাস লবণ উৎপাদন করতো। শাসন ক্ষমতা লাভের পর তাদের ছয় থেকে সাত মাস লবণ উৎপাদন করতে বাধ্য করা হয়। এর ফলে মলঙ্গিরা চাষাবাদের জন্য সময় দিতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে,

---

[৮১] B. Barui, *op.cit,* p. 52.

[৮২] J.K. Nag, *op.cit*, p. 301.

[৮৩] সুলতান সুজার রাজস্ব ফাইলসমূহে নিমক মহালের উল্লেখ আছে। দেখুন, J.K. Nag, *op.cit,* p. 300.

[৮৪] B. Barui, *op.cit,* pp. 45-47.

[৮৫] *Ibid*, p. 48.

[৮৬] উদ্ধৃত, N. K. Sinha (ed.), *Midnapore Salt Papers*, 1781-1807 (Calcutta: 1954), pp. 53-54.

লবণ উৎপাদন তদারকে দায়িত্বে নিয়োজিত কোম্পানি কর্মচারী এবং তাদের সহকারীরা মলঙ্গিদের নিকট থেকে অনেক ধরনের সেলামি গ্রহণ করে তাদের আর্থিক ক্ষতি আরো বাড়িয়ে দেয়। সমসাময়িক কালের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, দাদন প্রদান কালে গোমস্তারা চুলা প্রতি পনের রুপি করে কেটে রাখতো। সেই সঙ্গে তারা চুলা প্রতি সাড়ে বারো রুপি করে মহতুত এবং এক রুপি করে সেলামি গ্রহণ করতো।[৮৭] গোমস্তাদের উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করেই মলঙ্গিরা রেহাই পেতো না। তাদের আরো অনেক ধরনের কর ও সেলামি প্রদান করতে হতো। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : বাড়ি বাসা সেলামি, খড়ি পোটা সেলামি, জ্বাল খুন্তি সেলামি, খুঁটি সেলামি এবং পুলিশ সেলামি।[৮৮] লবণ ওজনকারী কয়ালকে খলাড়ি প্রতি ছয় মণ লবণ দিতে হতো। কয়ালের কেরানি এবং ব্রাহ্মণ রাঁধুনিকে দিতে হতো ২০ সের করে লবণ। এছাড়া আরো ২০ সের লবণ দিতে হতো কাস্টমস্ হাউজ অফিসার শাহ্বন্দরের কর্মচারীকে।

শুধু তাই নয়, কোম্পানি কর্মচারীগণ প্রতারণার মাধ্যমে মলঙ্গিদের শোষণ আরম্ভ করে। লবণ ওজনের দায়িত্বে নিয়োজিত কয়ালরা বেশি মাপের বাটখারা ব্যবহার করে মলঙ্গিদের প্রতারণা করে। বিভিন্ন আড়ং-এ ভিন্ন ভিন্ন মাপের বাটখারা ব্যবহার করায় সব ক্ষেত্রে প্রতারণার মাত্রা এক ছিল না। ১৭৭৪ সালে কোম্পানি লবণ ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেছিল। কমিটির ভাষ্য মোতাবেক, কয়ালরা বেশি মাপের বাটখারা ব্যবহার করে মণ প্রতি ১০ থেকে ১৫ সের বেশি লবণ গ্রহণ করতো।[৮৯] কমিটির নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্যে কয়ালরা একই ধরনের স্বীকারোক্তি প্রদান করে। গোমস্তা ওজনের সময়ে কয়ালদের শতকরা ২৫ ভাগ বেশি লবণ গ্রহণ করার নির্দেশ দিতো বলে তারা উল্লেখ করে।[৯০] এ ধরনের প্রতারণার বিরুদ্ধে সচেতন থাকা সত্ত্বেও মলঙ্গিরা তেমন কোনো কার্যকর বিরোধিতা করতে পারতো না। এর বিরুদ্ধে কোনো কথা বললে তাদের ওপর নির্যাতন মেনে আসতো; তাদেরকে মারধোর করা হতো। তদন্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্য দান কালে ২৪ পরগনার দয়ারাম হালদার নামক জনৈক মলঙ্গি অভিযোগ করে যে, "...for trying this experement the salt gomastas gave me ten blow on the back with a shoe."।[৯১] আবার এই অনিয়ম উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জানাতেও দেওয়া হতো না। মলঙ্গিরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট যেতে উদ্যত হলে বল প্রয়োগ করে তাদের ফিরিয়ে আনা হতো। পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মলঙ্গিরা কলকাতার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট

---

[৮৭] *Ibid,* p. 54.

[৮৮] T. Banarjee, *Internal Market of India, 1834-1900* (CAlcutta: 1966), pp. 227-228; চুক্তির চেয়ে বেশি লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যে অননুমোদিত খলাড়ি স্থাপনের জন্য আড়ং দারোগাকে খলাড়ি প্রতি ১ রুপি প্রদান করতে হতো। একে বলা হতো *বাড়ি বাসা সেলামি*। এজেন্ট নির্দেশিত মোতাবেক লবণ পরিশোধন এবং শুষ্ককরণের আদেশের প্রয়োগ রোধ করার জন্য দারোগাকে খলাড়ি প্রতি ১ রুপি করে প্রদান করতে হতো। একে বলা হতো *খড়ি পোটা সেলামি*। এজেন্ট আরোপিত জরিমানা থেকে রেহাই পাবার জন্য দারোগাকে খলাড়ি প্রতি ১ রুপি করে প্রদান করতে হতো। একে বলা হতো *জ্বাল খুন্তি সেলামি*। দারোগার অনিয়মিত পরিদর্শনে লবণ উৎপাদনের অনিয়মের অভিযোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য খলাড়ি প্রতি চার আনা করে প্রদান করতে হতো। এর নাম ছিল *খুঁটি সেলামি*। এছাড়া মলঙ্গিদের খলাড়ি থেকে বাড়িতে আসা যাওয়ার স্বাধীনতার কন্য এলাকার পুলিশ, জমাদার ও বরকন্দাজকে খলাড়ি প্রতি চার আনা করে প্রদান করতে হতো। এর নাম ছিল *পুলিশ সেলামি*। দেখুন, B. Barui, *op.cit,* p. 54.

[৮৯] ১৭৭৪-৭৫ সালের রাজস্ব বিভাগের Miscellaneous Records থেকে B. Barui কর্তৃক উদ্ধৃত। দেখুন, B. Barui, *op.cit,* p. 53.

[৯০] B. Barui, *op.cit,* p. 53.

[৯১] *Ibid,* p. 57; পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টেও স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, মলঙ্গিদের ওপরে অত্যাচার করা হতো। দেখুন, *BPP*, 1831-32, Vol. IX, p. 16.

অভিযোগ প্রদানের জন্য অগ্রসর হলে লবণ এজেন্টগণ সিপাহিদের সাহায্যে বল প্রয়োগ করে তাদের ফিরিয়ে আনতেন।[৯২] শুধু তাই নয়, এধরনের প্রচেষ্টায় মলঙ্গিদের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হতে হতো। ১৭৯৯ সালের ১১ এপ্রিল সল্ট কমিটির নিকট হিজলির মলঙ্গিদের প্রদত্ত একটি দরখাস্ত থেকে এর প্রমাণ মেলে। মলঙ্গিরা অভিযোগ করে যে, তারা সল্ট এজেন্ট চ্যাপম্যানের নিকট অভিযোগ জানাতে গেলে তাদের অভিযোগ না শুনে বরং এজেন্টের নাজির রামহরি সিং তাদের আটক করে। এর পর তাদের পাঁচ দিন ধরে একটি কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখে। এ সময়ে তাদের কোন খাবার দেওয়া হয়নি।[৯৩] এমনতর অত্যাচার ও নিপীড়নের জন্য মলঙ্গিরা সাময়িকভাবে দমে গেলেও পরবর্তী সময়ে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে এগিয়ে আসে।

মলঙ্গিদের আন্দোলন

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর মলঙ্গিদের ওপর শোষণ-নিপীড়ন আরম্ভ হলে তারা আন্দোলন শুরু করে। প্রথম আন্দোলন দেখা দেয় যশোর জেলার অন্তর্গত রায়মঙ্গল এজেন্সিতে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এজেন্সিটির সদর দপ্তর ছিল খুলনায়। একে নিমক চৌকি বলা হতো। সুন্দরবনের লবণাক্ত অঞ্চলে এজেন্সিটির লবণ ক্ষেত্রসমূহ বিস্তৃত ছিল।[৯৪] এসব স্থানে তেমন কোন জনবসতি ছিল না। পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষকে দিয়ে এখানে লবণ উৎপাদন করিয়ে নেয়া হতো। বাংলার অন্যান্য এলাকায় লবণ শ্রমিকদের মলঙ্গি বলা হলেও এ অঞ্চলে তাদের বলা হতো মাহিন্দার। অন্যদিকে, এজেন্সির পক্ষ থেকে মাহিন্দার সংগ্রহে নিয়োজিত ঠিকাদারকে বলা হতো মলঙ্গি। খুলনার লবণ চৌকির প্রধান ছিলেন এওয়ার্ট নামক একজন ইংরেজ। তিনি মলঙ্গিদের সাহায্যে মাহিন্দারদের দাদন দিয়ে লবণ উৎপাদন করাতেন। রায়মঙ্গল এজেন্সির লবণ উৎপাদন ক্ষেত্রসমূহ ছিল বসবাসের অনুপযোগী, অস্বাস্থকর ও ভীতিসংকুল। প্রতি বছর অনেক মাহিন্দার রায়মঙ্গলে গিয়ে মারা যেতো। ফলে সহজে কেউ মাহিন্দারী করতে রাজি হতো না। মলঙ্গিরা জোরপূর্বক দাদন দিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে মাহিন্দার সংগ্রহ করতো। লবণকর্তা এওয়ার্ট এক্ষেত্রে তাদের প্রত্যক্ষভাবে মদদ যোগাতেন। যশোর-খুলনার ইতিহাস প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, "এজন্য মলঙ্গিরা লোক সংগ্রহ জন্য জোর জুলুম করিতেন এবং ইউয়ার্ট সাহেব নিজের সিপাহী দিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইতেন।"[৯৫] এসব অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের জন্য মাহিন্দারগণ জেলা জজের নিকট আবেদন জানায়। আন্দোলন ক্রমান্বয়ে সংগঠিত হয়ে উঠলে কোম্পানি চৌকি প্রধান এওয়ার্টকে বাখেরগঞ্জে বদলি করে এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে লবণ চৌকির ভার যশোরের কালেক্টর হেস্কেলের ওপর অর্পণ করে। এ সময়ে কালেক্টরের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, ১. শুধুমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে মাহিন্দার সংগ্রহ করা হবে। ২. কোনো ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাদন প্রদান করা হবে না। ৩. কোনো মাহিন্দার এক বছরের দাদনের জন্য অন্য বছর দায়ী থাকবে না। সেই সঙ্গে কোম্পানির পক্ষ থেকে আর একটি বিষয় সংযোজন করা হয় যে, জনগণ স্বেচ্ছায় লবণ উৎপাদনে

---

[৯২] G. W. Forrest, *Selections from the Letters, Despatches and Other State Papers Preserved in the Foreign Department of the Government of India* (Calcutta: 1890), Vol. I, p. 196.

[৯৩] N.K. Sinha (ed.), *op.cit,* p. 180; উদ্ধৃত, B. Barui, *op.cit,* p. 56.

[৯৪] প্রবন্ধের লবণক্ষেত্র অংশ দ্রষ্টব্য।

[৯৫] সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯৮-৬৯৯।

এগিয়ে না এলে এ অঞ্চলে লবণ উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হবে।[৯৬] ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিস এই ঘোষণাকে আইনে পরিণত করেন।[৯৭]

মলঙ্গিদের আন্দোলন শুধুমাত্র রায়মঙ্গলে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বাংলার অন্যান্য এজেন্সিতে একই ধারায় আন্দোলন আরম্ভ হয়। বিভিন্ন নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মলঙ্গিরা আন্দোলনে এগিয়ে আসে। মেদিনীপুরের এজেন্ট চ্যাপম্যানের মালীর ভ্রাতা বলাই কুণ্ডু এ ধরনের একজন মলঙ্গি নেতা। তিনি লবণ কর্মচারীদের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের বীরকুল, বলসাই ও মিরগুদার মলঙ্গিদের সংগঠিত করেন। তার নেতৃত্বে মলঙ্গিরা বোর্ড অব ট্রেডের নিকট দরখাস্ত প্রেরণ করে লবণের দাম বৃদ্ধির দাবি জানায়। সেই সঙ্গে তারা বোর্ডকে প্রদত্ত অতিরিক্ত লবণ বা সার্ফ হ্রাস করার দাবিও উত্থাপন করে।[৯৮] ১৭৯৮ সালের ৬ জানুয়ারি ২৪-পরগনা জেলার মুড়াগাছার মলঙ্গিরা একইভাবে বোর্ডের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করে। এতে তারা অভিযোগ করে যে, হুডাদার রামতনু দত্ত ১৭৯৫ সাল থেকে তাদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি অবৈধভাবে তাদের নিকট থেকে লবণ ও অর্থ আদায় করে আসছেন।[৯৯] দরখাস্তে মলঙ্গিরা তাকে অপসারণ করে একজন ভালো হুডাদার নিয়োগ করার দাবি জানায়। মনে রাখা দরকার, তখন পর্যন্ত ২৪-পরগনার মলঙ্গিরা তেমন সংগঠিত হতে পারেনি। বলাই কুণ্ডু তাদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে তারা সংগঠিত হয়ে এগিয়ে এলে মলঙ্গিদের আন্দোলন ব্যাপকতর রূপ লাভ করে।

বলাই কুণ্ডু ছাড়া উল্লেখযোগ্য মলঙ্গি নেতৃদ্বয় হলেন হিজলির প্রেমানন্দ সরকার এবং তার ভ্রাতা পাল কুতিব। ১৮০৪ সালে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হিজলির সল্ট এজেন্ট ফারকুহারসনের পত্র থেকে এই দুজনের নাম জানা যায়। তিনি লেখেন :

> With Premanada Sarkar at their head, they first Proceeded to the mofassil and having prevailed upon a number of the lower class of malangis to join them, came with about three hundred followers to my cachary in a most clamorous unprecedented manner insisting upon an immediate compliance with their claims or that they would leave off work and from information of my darogas in different parts and the head Malanges many more were preparing to follow their compel at the instigation of Premanada sarker and his Brother Pawl Cutiva.[১০০]

আন্দোলনের মুখে কোম্পানি হিজলি থেকে ফারকুহারসনকে প্রত্যাহার করে নেয়। ম্যাসন নামক জনৈক ইংরেজ কর্মচারী তার স্থলাভিষিক্ত হন।

মলঙ্গিদের আন্দোলন অব্যাহত থাকলে কোম্পানি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোম্পানি ঘোষণা দেয়—প্রথমত, মলঙ্গিদের ওপর কোনো রকম অত্যাচার করা হবে না। দ্বিতীয়ত, গোমস্তা, বেপারী বা লবণ কর্মকর্তারা জবরদস্তিমূলক ভাবে দাদন প্রদান করলে সল্ট এজেন্টগণ তাঁদের প্রতিহত করবেন। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত গোমস্তা, বেপারী বা কর্মকর্তা প্রদত্ত দাদনের সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। তৃতীয়ত, জমিদার, ফার্মার বা কালেক্টরগণ পাট্টা বা কিস্তিবন্দীতে উল্লেখিত খলাড়ি ভাড়া ছাড়া মলঙ্গিদের নিকট থেকে কোন অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে প্রথম বারের জন্য

---

[৯৬] ঐ, পৃ. ৬৯৯।

[৯৭] ১৭৯৩ সালের ২৯ নং আইন (Regulation 29 of 1793)।

[৯৮] N.K. Sinha (ed.), *op.cit,* p. 119; উদ্ধৃত, B. Barui, *op.cit,* pp. 57-58.

[৯৯] B. Barui, *op.cit,* p. 58.

[১০০] N.K. Sina (ed.), *op.cit.* P. 136.

গৃহীত অর্থের দ্বিগুণ এবং দ্বিতীয় বারের জন্য তিন গুণ অর্থ ফেরত দিতে হবে।[১০১] কিন্তু এতোসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেও অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। মলঙ্গিদের ওপরে অত্যাচার ও শোষণ অব্যাহত থাকে। সেই সঙ্গে মলঙ্গিরাও আন্দোলন চালিয়ে যায়। অবস্থা মোকাবেলায় ১৮১৯ সালে কোম্পানি দশম আইন প্রবর্তন করে। আইনটির ৭নং ধারায় বলা হয়, কোনো ব্যক্তিকে জোরপূর্বক লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ ক্ষেত্রে নিয়োজিত করা যাবে না। এর ৮নং ধারায় উল্লেখ করা হয় যে, কোনো এজেন্সিতে অনুরূপ ঘটনা সংঘটনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট সল্ট এজেন্ট চাকরিচ্যুত হবেন।[১০২] তা সত্ত্বেও মলঙ্গিদের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৮৩২ সালে পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটির নিকট সাক্ষ্য প্রদান কালে মলঙ্গিদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তুকার মন্তব্য করেন, "They were among the worst-conditioned of the native subjects, from climate, situation, and nature of their work"[১০৩]

শোষণ ও অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের জন্য মলঙ্গিরা আন্দোলনের পাশাপাশি বাসস্থান ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে আরম্ভ করে। মেদিনীপুরের মলঙ্গিরা নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে ২৪-পরগনা এবং মারাঠা জেলাসমূহে পালিয়ে যায়।[১০৪] শুধুমাত্র মেদিনীপুরেই নয়, অন্যান্য জেলায়ও মলঙ্গিদের এই পলায়ন প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়। ১৭৯৪ সালে বোর্ড অব ট্রেডের নিকট প্রেরিত একটি পত্রে হিজলির দুরাদুমনার দারোগা রামহরি দাস জানান যে, আগের বছরের চৈত্র-বৈশাখ মাসে মলঙ্গিরা সে অঞ্চল থেকে ২৪-পরগনার মুড়াগাছায় পালিয়ে যায়।[১০৫] মলঙ্গিদের এই পলায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে সল্ট এজেন্ট সিপাহিদের সহায়তায় তা রোধে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তা সত্ত্বেও মলঙ্গিদের পলায়ন রোধ করা সম্ভব হয়নি। বেভারিজের রিপোর্ট থেকে জানতে পারা যায় যে, ১৮১৮ সালে বাখেরগঞ্জের ৩৫০টি মলঙ্গি পরিবার বসতবাড়ি ত্যাগ করে পালিয়ে যায়।[১০৬] পার্লামেন্টোরি সিলেক্ট কমিটির রির্পোটেও মলঙ্গিদের এই পলায়নের বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। এতে বলা হয়:

> On the consulation of the Calcutta revenue, it appears that these poor people had fled from theit habitations and had abandoned the khalaries to take refuse in the woods, where many of them have been devoured by tigers.[১০৭]

বাঘের হাত থেকে জীবন রক্ষা করা মলঙ্গিদের পলায়নের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও এটি একমাত্র কারণ ছিল, এমন মনে করা যৌক্তিক হবে না। কোম্পানির লবণ কর্মচারীরা ইতোমধ্যেই যে অত্যাচার ও শোষণের রাজত্ব কায়েম করেছিল তা মলঙ্গিদের পলায়ন করতে বাধ্য করে বলে মনে করা যেতে পারে।

যেসব মলঙ্গি খলাড়ি থেকে পলায়ন করতে পারেনি, তারা চুক্তির চেয়ে বেশি পরিমাণ লবণ উৎপাদন করে অননুমোদিত বেপারীদের নিকট তা বিক্রি করে।[১০৮] এ সময়ে কোম্পানি প্রদত্ত দামের

---

[১০১] N.K. Sinha (ed.), *op.cit,* p. 12; উদ্ধৃত, B. Barui, *op.cit,* pp. 59-60.

[১০২] *Appendix to the Report from the Select Committee on Salt, British India, 1836, p. 26*; উদ্ধৃত, B. Barui, *op.cit,* p. 61.

[১০৩] উদ্ধৃত, H.R. Ghosai, *op.cit*, p. 102; আরো দেখুন, *BPP*, 1831-32, Vol. IX, p. 37.

[১০৪] N.K. Sinha (ed.), *op.cit,* p. 20; উদ্ধৃত, B. Barui, *op.cit,* p. 57.

[১০৫] N.K. Sinha (ed.), *op.cit,* p. 62; উদ্ধৃত, B. Barui, *op.cit,* p. 57.

[১০৬] H. Beveridge, *History of Bakharganj*, p. 105; উদ্ধৃত, সুপ্রকাশ রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫।

[১০৭] G.W. Forrest, *op.cit,* p. 196.

[১০৮] একে কোম্পানি কালোবাজারি হিসেবে উল্লেখ করে। দেখুন, *BPP*, 1831-32, Vol. IX, p. 79.

চেয়ে বাজারে লবণের দাম অনেক বেশি ছিল। আমারা আগেই দেখেছি, লবণ সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীগণ, বিশেষ করে কয়াল ও জাওনদাররা মলঙ্গিদের নিকট থেকে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি লবণ আদায় করতো। তারা এই অতিরিক্ত লবণ দেশীয় পাইকারদের নিকট চড়া দামে বিক্রি করতো। আবার কোম্পানির নামে গৃহীত সমুদয় লবণও তারা সরকারি গোলায় জমা দিতো না। এর একাংশ দেশীয় পাইকারদের নিকট বিক্রি করে দিতো।[১০৯] মলঙ্গিরা এ বিষয়টি অনুধাবন করে জীবন ধারণের স্বার্থে এ পথ অনুসরণ করে। তারা অতিরিক্ত লবণ উৎপাদন করে দেশীয় পাইকারদের নিকট তা বিক্রি করে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টির ব্যাপক প্রচলন ঘটে। লবণ কর্মচারীদের সহায়তায় নতুন নতুন খলাড়ি স্থাপন করে মলঙ্গিরা লবণ উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়।[১১০] কোম্পানির পাশাপাশি তারা পাইকারদের নিকট থেকে দাদন নিয়ে অতিরিক্ত লবণ উৎপাদন আরম্ভ করে। পাইকাররা তাদের নিকট থেকে লবণ ক্রয় করে স্থানীয় বাজারে তা বিক্রি করে। কালক্রমে অবস্থাসম্পন্ন মলঙ্গিরাও এই লাভজনক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। একটি হিসেবে দেখা যায়, একশত থেকে দেড়শত মণ লবণ উৎপাদন করে এক একটি খলাড়ি মাত্র কুড়ি থেকে ত্রিশ মণ লবণ কোম্পানির গোলায় জমা দিতো।[১১১] এভাবে লবণ সরবরাহ অব্যাহত থাকায় স্থানীয় বাজারে কোম্পানির লবণের চাহিদা হ্রাস পায়। আবার বাংলায় লবণের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় অন্য প্রদেশ থেকে অননুমোদিত প্রক্রিয়ায় লবণ আসা অব্যাহত থাকে। এতে বাজারে কোম্পানির লবণের চাহিদা আরো কমে যায়। ১৮০১ সালের ৪ জুলাই এজেন্টদের নিকট প্রেরিত একটি সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়, "...that the public revenue had been essentially injured by the large quantities of salt illigally made or imported, and introduced into the market for some years past"[১১২] অবস্থাটি কোম্পানির জন্য কমনীয় ছিল না। বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে কোম্পানি অবস্থা উন্নয়নের প্রয়াস পায়। ১৮১৯ সালে কোম্পানি লবণ বিভাগের দায়িত্ব বোর্ড অব কাস্টম্স, সল্ট এন্ড ওপিয়ামের ওপর ন্যস্ত করে। সেই সঙ্গে সুপারিনটেন্ডেন্ট, সল্ট এজেন্ট এবং অন্যান্য লবণ কর্মকর্তাদের আকস্মিক পরিদর্শনের মাধ্যমে 'অবৈধ' লবণ আটকের নির্দেশ দেয়। এই ব্যবস্থাপনায়ও আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় কোম্পানি বাংলার তিনটি সুপারিনটেন্ডেন্সিকে ভেঙে ষোলটি বিভাগে বিভক্ত করে। এসব বিভাগের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টর ও সল্ট এজেন্টদের ওপর ন্যস্ত হয়।[১১৩] কালেক্টরেটের কর্মচারীদের ওপরে পূর্ববর্তী দায়িত্বের পাশাপাশি লবণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এতে তাদের দায়িত্বের বোঝা বৃদ্ধি পায়। এসব দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার যোগ্যতাও অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর ছিল না।[১১৪] ফলে লবণ ক্ষেত্রে বিরাজিত অবস্থার তেমন কোনো উন্নয়ন সম্ভব হয়নি।[১১৫]

---

[১০৯] B. Barui, *op.cit,* p. 55.

[১১০] লবণ কর্মচারীরা ঘুষ নিয়ে নতুন খলাড়ি তৈরি করতে দিতো। এ ঘুষকে *বাড়ি বাসা সেলামি* বলা হতো। প্রবন্ধের আগের অংশ দ্রষ্টব্য।

[১১১] B. Barui, *op.cit,* p. 55.

[১১২] উদ্ধৃত, H.R. Ghosal, *op.cit,* p. 99.

[১১৩] এসব বিভাগ হলো : বাকেরগঞ্জ, বারইপুর (২৪-পরগনা), বাউগুন্দি, ভুলুয়া (নোয়াখালি), চট্টগ্রাম, কলকাতা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা জেলা), হিজলি, হুগলী, যশোর, মেদিনীপুর, সালকিয়া, তমলূক, পশ্চিম বিভাগ (Western division) এবং বর্ধমান। দেখুন, H.R. Ghosal, *op.cit,* p. 109.

[১১৪] *Ibid,* p. 102.

[১১৫] লবণের কালোবাজারি অব্যাহত থাকে। ১৮৭০ সালে শুধুমাত্র হাওড়াতেই ২১টি লবণ কালোবাজারির মামলা হয়। এসব মামলায় ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এদের মধ্যে ২০ জনের সাজা হয়। এক্ষেত্রে আটককৃত

বাজারে অননুমোদিত ব্যবস্থায় লবণ আসা অব্যাহত থাকলে কোম্পানি লবণ বিক্রির ক্ষেত্রে জটিলতার মুখোমুখি হয়। প্রতি বছর কোম্পানির সংগৃহীত লবণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অবিক্রিত থাকে। ১৮৩০ সাল থেকে এমনতর অবস্থার সূচনা হয় এবং ক্রমান্বয়ে সরকারি গোলাসমূহে লবণের মাত্রাতিরিক্ত মজুদ বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় লবণ বিক্রির ক্ষেত্রে কোম্পানি বিশেষ ছাড় প্রদান করে।[১১৬] এতে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও বাজারে কোম্পানির লবণের দুরবস্থা পুরোপুরি কেটে ওঠা সম্ভব হয়নি।

লবণ উৎপাদনের ক্রমাবনতি

বাজারে লবণ বিক্রিজনিত জটিলতার পাশাপাশি আর একটি বিষয় কোম্পানির লবণ ব্যবস্থাপনাকে হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ১৮১৩ সালে সনদ আইন প্রবর্তিত হবার পর ভারতের বাণিজ্য ইউরোপীয়দের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ভের্দা অন্তরীপের দ্বীপসমূহ থেকে সস্তা লবণ আমদানি হয়ে ভারতের বাজার বিনষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দেয়।[১১৭] অবস্থা মোকাবেলার জন্য ১৮১৭ সালে কোম্পানি আমদানিকৃত লবণে প্রতিরোধমূলক শুল্ক আরোপ করে। প্রতিমণ আমদানিকৃত লবণের ওপর তিন রুপি করে শুল্ক আরোপ করা হয়।[১১৮] ব্রিটেন থেকে আমদানিকৃত লবণের ওপরে এই শুল্ক না বর্তালেও ইংল্যান্ডের লবণ উৎপাদনকারীরা এর সমালোচনা আরম্ভ করে। তারা অভিযোগ করে যে, লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলা সরকারের সংরক্ষণমূলক নীতি ১৮১৩ সালের সনদ আইনের সুনির্দিষ্ট লঙ্ঘন। উচ্চ হারে শুল্কারোপের কারণে বাংলায় লবণের দাম খুবই বেশি। এতে দেশীয় ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া কোম্পানি প্রদেশটিতে মলঙ্গিদের দিয়ে উৎপীড়নের মাধ্যমে জোরপূর্বক লবণ উৎপাদন করিয়ে নিচ্ছে। এই উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থার তিরোধান এবং দেশীয় ভোক্তাদের নিষ্কৃতি দানের জন্য বাংলায় লবণের অবাধ আমদানি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

কোম্পানি ব্রিটেনের লবণ উৎপাদনকারীদের দাবির মুখে পূর্বতন নীতি পরিবর্তন করে বাংলায় অবাধে লবণ আমদানির সুযোগ দেয়। ১৮৩৫ সালে কলকাতায় ব্রিটেনের চেশায়ার থেকে লবণ আমদানি আরম্ভ হয়। বাংলার লবণের চেয়ে অধিক পরিশোধিত ও সস্তা হওয়ায় এই লবণ ক্রমান্বয়ে বাংলার বাজার দখল করে ফেলে। বাংলায় লবণ উৎপাদন সংকুচিত হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমদানিকৃত ব্রিটিশ লবণ বাংলার মোট চাহিদার প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ পূরণ করে।[১১৯] শতকের শেষের দিকে চেশায়ারের পাশাপাশি ইডেন থেকে লবণ আমদানি আরম্ভ হলে দেশীয় লবণের পক্ষে বাজারে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ লবণের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে ঔপনিবেশিক সরকার বাংলার লবণের ওপর আরোপিত শুল্ক

লবণের পরিমাণ ৭ শত ওজন (7 hundred weight)। মামলায় জরিমানাকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১০ পাউন্ড, ১৭ শিলিং, ৬ পেনি। ১৮৭১ সালে একই ধরনের ১৩টি মামলা হয়। ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে সাত জনকে চূড়ান্তভাবে অভিযুক্ত করা হয়। এ সময়ে আটককৃত লবণের পরিমাণ ছিল এক শতওজনের এক-তৃতীয়াংশ। জরিমানাকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৫ পাউন্ড, ২ শিলিং, ৬ পেনি। দেখুন, W.W. Hunter, *op.cit*, Vol. III, p. 387.

[১১৬] H.R. Ghosal, *op.cit,* p. 103.

[১১৭] *The Calcutta Review*, March, 1930, p. 352.

[১১৮] H.R. Ghosal, *op.cit,* p. 101.

[১১৯] J.K. Nag, *op.cit,* p. 302.

বৃদ্ধি করে। এতে দেশীয় লবণের বাজার দর বেড়ে যায়।[১২০] এমনতর পরিস্থিতিতে বাংলার লবণ বাজারে টিকে থাকতে পারেনি। বাংলায় লবণ শিল্পের ধ্বংস নেমে আসে। আর.সি. দত্তের ভাষায়:

> In working out the principle the company went too far and gave an undue advantage to the British manufacturers. For they included the expences of securing and protecting revenues in the cost price and added to the selling price of Bengal salt. The British manufacturers obtained the full advantage of this blander, and the sale of British salt went up by leaps and bounds. [১২১]

ঔপনিবেশিক সরকার মলঙ্গিদের লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশিষ নিষেধাজ্ঞা জারি করলে শিল্পটি নিশ্চিহ্ন-প্রায় হয়ে পড়ে। আমদানিকৃত লবণ বাংলার মানুষের লবণের চাহিদা পূরণের প্রধানতম উৎস হয়ে দাঁড়ায়।[১২২] নিচের সারণিতে বাংলায় লবণ আমদানির পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো।

বছর	মোট আমদানিকৃত লবণের পরিমাণ (মণ)	ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত লবণের পরিমাণ (মণ)
১৮৪৪-৪৫	৯,৭০,৫৯৫	৭৯১
১৮৪৫-৪৬	১৫,৮১,৯৬৮	৫,০৫,৬১৬
১৮৪৬-৪৭	১৪,৬৬,৭৪৪	৩,৫২,৮৩৫
১৮৪৭-৪৮	১৬,১৫,০৮৪	৭,৫২,৯৯৮
১৮৪৮-৪৯	১৬,২৬,৭০৬	৪,৫৯,৮০৩
১৮৪৯-৫০	২১,২৬,৮৪৮	৬,২৪,৬৭৩
১৮৫০-৫১	১৪,৫৫,০০৭	৬,৭২,০৯২

উৎস: Edward Balfour (ed.), *Cyclopaedia of India and of Eastern and Southern Asia; Commercial, Industrial and Scientific Products of the Mineral, Vegetable and Animal Kingdoms, Useful Arts and Manufacture* (Madras: Lawrence and Adelphi Presses, 1873), p. 85.

উপসংহার

রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি বাংলার লবণ উৎপাদন ও বিপণন ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার আরোপ করে মুনাফা অর্জনের প্রয়াস পেলে এদেশের মানুষ আর্থিক শোষণের শিকার হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি শোষণের শিকার হয়েছিল লবণ উৎপাদনে নিয়োজিত মলঙ্গিরা। তারা ক্রমান্বয়ে লবণ উৎপাদনে অনীহ হয়ে পড়লে কোম্পানির লবণ-কর্মচারীরা অত্যাচার ও নিপীড়নের মাধ্যমে তাদের লবণ উৎপাদন করতে বাধ্য করে। এই উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মলঙ্গিরা আন্দোলন গড়ে তোলে। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত লবণ উৎপাদন এবং তা অননুমোদিত ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করে টিকে থাকার প্রচেষ্টা চালায়। এসব লবণ বাজারে এলে কোম্পানির লবণের চাহিদা হ্রাস পেতে থাকে। অন্যদিকে, কোম্পানি ইংল্যান্ড থেকে লবণ আমদানি বৃদ্ধি করলে বাংলার লবণ প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা প্রকট আকার ধারণ করে। বাংলার লবণ শিল্প ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।

---

[১২০] R.C. Dutt, *Economic History of India: In the Victorian Age*, Vol. II (London: Routledge & Kegan Paul, n.d.), 153.

[১২১] উদ্ধৃত, J.K. Nag, *op.cit*, p. 302.

[১২২] *BPP*, 1831-32, Vol. IX, p. 63.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় প্রবর্তিত ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ

মো. শামসুজ্জোহা এছামী*

Abstract: With the coming of the Muslims as traders, religious missionaries and conquerors in Bengal since the 8th and 9th centuries A.C. the fate of Bengal was altogether changed in her multidimensional aspects. The egalitarian spirit of Islam opened the shut door of the educational arena to all irrespective of religion, cast and creed. The system of education introduced by the *Ulama-Mashaikh* and the rulers was hailed by the multitudes of Bengali population for uplifting their mundane and ethical aspects of life. This paper aims at focusing on main points of the system introduced under the Muslim rule of Bengal.

ভূমিকা

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না এবং জ্ঞান অর্জনও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর দেশের জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়, বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল বাধা-বিপত্তি অপসৃত হয়। কোনো প্রকার ভেদাভেদ ব্যতীত শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল দক্ষ মানুষ তৈরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এ প্রসঙ্গে হান্টার বলেন, 'আমরা এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মুসলমানেরা কেবল রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীই ছিল না, বরং জ্ঞান বিজ্ঞানের বুদ্ধি ও মেধাগত দিক দিয়েও তারা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল। তাদের হাতে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল যাকে কোন অবস্থাতেই খাটো করে দেখা যায় না। এতে উন্নত নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা ছিল।'[১] আলোচ্য প্রবন্ধে মুসলিম শাসনাধীন বাংলার কালপর্বে শিক্ষার স্বরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলায় ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার স্তরবিন্যাস

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম শাসনামলে বাংলায় প্রচলিত ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস সূচনা পর্ব, স্বর্ণ যুগ, পতন যুগ এবং পুনর্গঠন যুগ এই চারটি বিশেষ অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। অষ্টম শতকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে যখন আরবীয় ও পারসিক বণিকেরা এবং ধর্ম প্রচারক সুফি-দরবেশগণ এ অঞ্চলে পরিভ্রমণে আসেন তখন থেকেই মূলত ইসলামি শিক্ষার প্রথম পর্বের সূত্রপাত

---

* ড. মো. শামসুজ্জোহা এছামী, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] W.W. Hunter, *The Indian Musalmans* (Dacca: Barnalipi Mudrayan, 1975), p. 160.

হয়। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি বাংলা বিজয় থেকে শুরু করে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলার দেওয়ানি হস্তান্তরের সময় পর্যন্ত ইসলামি শিক্ষার দ্বিতীয় যুগ বিস্তৃত। এ কালপর্বে বাংলায় তুর্কি, পারসিক, আরব, আফগান এবং মুঘলদের শাসন বিদ্যমান ছিল। এই শাসন পর্বকে বাংলায় ইসলামি শিক্ষার স্বর্ণযুগ হিসেবে গণ্য করা হয়।[২] ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে প্রধান সেনানায়ক মীর জাফর আলী খান ও অন্যান্য অমাত্যদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজদৌল্লাহর বিপর্যয়ের পর থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় ইসলামি শিক্ষার তৃতীয় যুগ। এ সময় ক্রমান্বয়ে বাংলার সমগ্র মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে। এ যুগটিকে বাংলায় ইসলামি শিক্ষার পতনের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।[৩] ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে সময়কালকে বাংলায় ইসলামি শিক্ষার পুনর্গঠনের যুগ বলা হয়। বস্তুতপক্ষে এ যুগটি একটি নতুন জাতির পক্ষে পশ্চিমা আদর্শের গোলামি ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের জিঞ্জির মুক্তির পদক্ষেপ হিসেবেই চিহ্নিত।

মুসলিম শাসনামলে সাধারণত বাংলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্‌রাসা নামে অভিহিত হতো এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মক্তব নামে আখ্যায়িত হতো। পবিত্র কুরআন তাজবিদসহ বিশুদ্ধভাবে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে বিশেষ মক্তব, ফুরকানিয়া মক্তব এবং কুরআন হিফ্‌জ করার মানসে হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা ছিল। শিক্ষা ব্যবস্থা পার্থিব ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত ছিল। সাধারণত মসজিদেই মক্তব বসত। আবার কখনও কখনও কোন মুসলমানদের কাচারি ঘর বা বৈঠকখানায়ও মক্তব বসত। মক্তবে অঙ্কের প্রাথমিক জ্ঞান, আরবি ব্যাকরণের সূত্র ও ইতিহাস শিক্ষা প্রদান করা হতো। মক্তবে নারী-পুরুষ উভয়েই শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেত।[৪]

বাংলায় ইসলাম প্রচার ও ইসলামি শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে সিন্ধু ও মুলতানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ইসলামি শিক্ষা চালু হয়।[৫] নবম শতকের পূর্বে বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আরব-পারসিক বণিক, মুসলিম ধর্মপ্রচারক এবং সুফি-দরবেশগণ এ সময় বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচার ও ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৬] সপ্তম শতাব্দী থেকে আরব বণিকগণ ভারত, সিংহল, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং চীন দেশে প্রচুর পরিমাণে নৌ-বাণিজ্য সম্ভার সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। অনেক বছর ধরেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে তাদের একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য বিদ্যমান ছিল। মহানবী (স.) তথা ইসলামের আবির্ভাবের পর এসব আরব বণিকগণ নিজেদের বাণিজ্য সম্ভারের সাথে ইসলামের সুমহান আদর্শ ও শিক্ষা বহন করে

---

[২] A.K.M. Ayub Ali, *History of the Traditional Islamic Educations in Bengal* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983), p 6.

[৩] *Ibid*, p. 7.

[৪] *Ibid*, p. 15.

[৫] তারা চাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, অনুবাদ এস. মুজিবউল্লাহ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ৩৮; গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সুফি-সাধক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯), পৃ. ১১২।

[৬] তারা চাঁদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

এদেশে আসেন।[৭] বাংলাদেশের প্রাচীন নৌবন্দর চট্টগ্রামের সাথে আরব-চীন নৌবাণিজ্যের অন্যতম যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলায় এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাংলার কতিপয় অভ্যন্তরীণ নৌবন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্রেও প্রসার লাভ করে। এ সম্পর্ককে এদেশে ইসলামি প্রভাবের স্রোতধারা বজায় থাকার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। খ্রিস্টীয় দশম ও দ্বাদশ শতকের আরব ভূগোলবিদগণ বাংলার এমন অনেক শহরের উল্লেখ করেছেন যেগুলো উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এসব শহরে মুসলমানগণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রয়াসে অনেক মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও মক্তব নির্মাণ করেছিলেন। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এ অঞ্চলে অনেক ধর্মপ্রচারক সুফি-সাধক আগমন করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ, খানকা এবং ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে উলেখযোগ্য হলেন বিখ্যাত ইরানী সুফি-সাধক সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী (মৃত্যু ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ),[৮] হযরত শাহ সুলতান বলখী,[৯] শেখ মীর সুলতান মাহমুদ,[১০] শেখ মুহাম্মদ সুলতান রুমী,[১১] বাবা আদম শহীদ,[১২] শাহ নিয়ামতউল্লাহ বুতশিকন এবং মখদুম শাহদৌল্লাহ।[১৩] এছাড়া বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের পূর্বে সুফি-সাধক ও

---

[৭] মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০২), পৃ. ৪১২; বাংলাদেশে সুফি-সাধক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩।

[৮] তিনি নবম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে সুফিবাদের দীক্ষা নিয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে নাসিরাবাদ পর্বত চূড়ায় আস্তানা করে সেখান থেকেই বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে ইসলামি শিক্ষা প্রদান করেন। বিপুল সংখ্যক ভক্ত তাঁর অনুগামী হয়। এ নির্জন এলাকাটিতে তাঁর একটি খানকা ছিল। এটি ছিল তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনাস্থল। দ্রষ্টব্য, মো. আব্দুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ১০১-১০২।

[৯] তিনি ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে বাংলায় আগমন করেন। তিনি বাংলা ভূখণ্ডের বহুস্থানে ইসলামি শিক্ষা প্রদানের মানসে খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ এবং ঢাকা জেলার হরিরামপুরে ইসলাম প্রচার করেন। হরিরামপুরের বহু লোক তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বগুড়ার মহাস্থানগড়ে এসে ইসলাম প্রচার করেন। এক পর্যায়ে রাজা পরশুরামের সাথে যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে শাহ সুলতান বলখী জয়ী হন। এখানেও বহুলোক তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে তাঁর মাজার আছে। দ্রষ্টব্য, বাংলাদেশে সুফি-সাধক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫।

[১০] শেখ মীর সুলতান মাহমুদ যিনি সুলতানুল বলখী হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু শেখ তাওফিকের আদেশে তিনি একাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। তাঁর চরিত্র, মাহাত্ম্য, সরল জীবনধারা এবং ইসলামের শাশ্বত ও সাম্যবাদী জীবনধারায় মুগ্ধ হয়ে সর্বস্তরের মূর্তিপূজারী ও বিপুল সংখ্যক বর্বর লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঢাকা ও বগুড়া জেলার হিন্দু রাজন্যবর্গের কঠোর প্রতিবন্ধকতার মুকাবিলা করে তিনি সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হন। দ্রষ্টব্য: *History of the Traditional Islamic Educations in Bengal, Op. cit.*, p. 10.

[১১] একাদশ শতকে শেখ মুহাম্মদ সুলতান রুমী ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিপুল সংখ্যক শিষ্য তাঁর সাথে বাংলায় আসেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্থানীয় রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এক বিরাট অংশ ইসলামে দীক্ষিত হন। দ্রষ্টব্য, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

[১২] দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে বাবা আদম শহীদ এবং তাঁর অনেক সঙ্গী সাথী ঢাকা জেলার স্থানীয় হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধে বাবা আদম শহীদ হন। তিনি ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও আসাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। দ্রষ্টব্য, বাংলাদেশে ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৯; বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২-৬৩।

[১৩] ত্রয়োদশ শতকে শাহ নিয়াময়উল্লাহ বুতশিকন এবং মখদুম শাহদৌল্লাহ বাংলায় আগমন করেন। তাঁরা ঢাকা ও পাবনা জেলায় ইসলাম প্রচারের অদম্য উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশের জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। দ্রষ্টব্য, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪।

ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে যাঁরা এদেশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে শেখ আহমদ বিন হামযাহ নিশাপুরী (মৃত্যু ২৮৮ হিজরি/৯০০ খ্রিস্টাব্দ), শেখ ইসমাঈল বিন নাযানদ নিশাপুরী (মৃত্যু ৩৪১ হিজরি /৯৫২ খ্রিস্টাব্দ) এবং শেখ আহমদ তকী (মৃত্যু ৫৬৫ হিজরি/ ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৪] কাজেই বলা যায় যে, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক হতে বাংলায় আরব বণিকদের মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। আর নবম শতকের প্রথমভাগে মুসলিম সুফি-সাধকদের মাধ্যমে বাংলায় ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

মুসলিম শাসনামলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনাপর্ব বিশেষণ করে বলা যায় যে, এ পর্বের ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা কোন প্রাতিষ্ঠানিকরূপ লাভ করেনি। এপর্বে সুফি-সাধকগণ নিজেদের খানকার মাধ্যমে শিষ্যদের মধ্যে মহান আলাহর তাওহীদ, মানব জাতির বিশ্বভ্রাতৃত্ব, শান্তি, প্রেম এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের বাণী প্রচার করতেন। নামায, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা মসজিদ ও খানকা নির্মাণ করেন। এসকল মসজিদ ও খানকাই ছিল মুসলিম শাসনামলে বাংলায় ইসলামি শিক্ষার মূল কেন্দ্র। এসকল মসজিদ ও খানকাগুলোতে অসংখ্য নওমুসলিম পবিত্র কুরআন পাঠসহ ইসলামের মৌলিক জ্ঞান, নামায, রোযার প্রয়োজনীয় মাসলা-মাসায়েল, ধর্মীয় জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতেন। তৎকালে বাংলায় এসকল মসজিদ ও খানকা মক্তবের প্রয়োজন পূরণ করত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এগুলোর প্রভাবে বাংলায় ইসলামের বিজয়ের পথ সহজ হয়।

বাংলায় ইসলামি শিক্ষার স্বর্ণযুগ

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলা ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত বছরাধিক কাল এদেশে মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে।[১৫] এটি বাংলায় ইসলামি শিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব। এ সময় কালপর্বে ছিয়াত্তর জন আফগান, তুর্কি, মুঘল, পারসিক ও আরব মুসলিম সুলতান ও শাসক বাংলা শাসন করেন। এসময় তাদের রাজধানী ছিল লক্ষ্মণাবতী (গৌড়), সাতগ্রাম, তান্দা, ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া), সোনারগাঁও এবং মুর্শিদাবাদ।

বাংলার মুসলিম শাসকবর্গ কলা, বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য এবং স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাষ্ট্রীয় নীতির শীর্ষদেশে ছিল শিক্ষা। প্রতিটি পরগনায় কসবা বা গ্রামেই মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও মক্তব নির্মাণ করা হয়েছিল। কারণ তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মসজিদ ভিত্তিক। সমগ্র দেশে এমন কোনো মসজিদ ছিল না যাকে কেন্দ্র করে কোনো মক্তব কিংবা মাদ্‌রাসা গড়ে উঠেনি।[১৬] এছাড়াও দেশের বিভিন্ন এলাকায় সুফি-সাধকদের অসংখ্য খানকা ও হুজরা ছিল। এগুলোর প্রত্যেকটির সাথে মাদ্‌রাসা ও লঙ্গরখানা সংযুক্ত ছিল।

তৎকালীন সময়ে বর্তমানের সরকারি কলেজ কিংবা বোর্ড নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ের মতো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিলনা, বরং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন

---

[১৪] *History of the Traditional Islamic Educations in Bengal, Op. cit.*, p. 16.

[১৫] আব্দুল সাত্তার, তারীখ-এ-মাদ্‌রাসা-এ-আলিয়া (ঢাকা: মাদ্‌রাসা-এ-আলিয়া পাবলিকেশন, ১৯৫৯), পৃ. ৩০।

[১৬] M. Mohar Ali, *History of the Muslim of Bengal*, Riyadh, 1985, Vol. IB, p. 827.

ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে মহাবিদ্যালয়সহ শিক্ষার সর্বস্তর সম্পূর্ণ অবৈতনিক ছিল।[১৭] বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যানুরাগী মুসলিম রাজ-রাজড়া ও বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ বিদ্বান ব্যক্তিদের এবং মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও খানকার পৃষ্ঠপোষকতা করাকে নৈতিক দায়িত্ব ও ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। করমুক্ত ভূমি দান করে আমীর ও বিত্তবান ব্যক্তিগণ মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও খানকার ব্যয় নির্বাহের জন্য উদার বৃত্তির ব্যবস্থা করতেন। এগুলোর আয় থেকে মসজিদ, মক্তব, মাদ্‌রাসা ও খানকাসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা হতো। প্রতিটি গ্রাম প্রধান নিজেদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার নিমিত্তে মাদ্‌রাসা পরিচালনা করতেন। দরিদ্র ছেলেমেয়েরাও সে মাদ্‌রাসায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। মুসলিম শাসনামলে প্রায় প্রতিটি কসবা বা গ্রামেই সাধারণ অধিবাসীদের শিক্ষা উপকরণ ও সামাজিক চাহিদা পূরণের মানসে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ সম্পন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ মাদ্‌রাসা বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৮] গৌড়, পাণ্ডুয়া, দরসবাড়ি, রংপুর, রাজশাহী, চট্টলা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, সিলেট, সোনারগাঁও ও বিভিন্ন স্থানে পণ্ডিতগণ ধর্মীয় বিষয় এবং বিশেষ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। উচ্চ শিক্ষার নিমিত্তে এসব অঞ্চলে অনেক প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছিল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান এমনকি বাহির থেকেও জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীগণ আসত।

একাধিক বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিতদের সমাবেশকে কেন্দ্র করে মাদ্‌রাসা গড়ে উঠত। বিভিন্ন বিষয়ে এমন অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীগণ এ সকল পণ্ডিতদের পরিবেষ্টন করে জ্ঞান তৃষ্ণা নিবারণ করতেন। প্রথম দিকে মসজিদ কিংবা তৎসংলগ্ন স্থানে মাদ্‌রাসা বসত। পরবর্তীতে পৃথক ও স্বতন্ত্র ইমারতে মাদ্‌রাসা গৃহ নির্মাণ করা হয়। উন্নতমানের ব্যবস্থাপনা, উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার প্রশিক্ষণ, প্রচুর অর্থভাণ্ডার সহকারে এসকল মাদ্‌রাসা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতো। বাংলায় মুসলিম শাসনামলে স্থাপিত মাদ্‌রাসার সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিশগণ এক জরিপের মাধ্যমে বাংলায় আশি হাজার মাদ্‌রাসার সন্ধান পেয়েছিলেন।[১৯]

সে সময় সুফি-সাধকদের খানকা এবং শীয়াদের ইমামবাড়াও বিদ্যাপীঠ হিসেবে কাজ করত। এসকল স্থানে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে এবং কঠোর সাধনার ভিত্তিতে ব্যক্তির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন করা হতো। এসব প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষক, আধ্যাত্মিক গুরু এবং ইসলাম প্রচারক বের হয়ে আসতেন। শিক্ষার মাধ্যম ফার্সি হলেও শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আরবি ভাষা প্রাধান্য লাভ করেছিল। পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ছিল আরবি।

ইসলামি শিক্ষার বিষয়সূচি

মুসলিম শাসনামলে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর এই তিনটি স্তরে বিভক্ত ছিল। মসজিদে অনুষ্ঠিত মক্তব, পৃথক বাড়ি ও দোকান-পাট, কিংবা নিজ ঘরেই প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হতো। প্রত্যেকটি শিশুর বয়স চার বছর চার মাস চার দিন হলে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে প্রাথমিক জ্ঞানের তালিম দেওয়া হতো। এ ব্যবস্থাকে 'বিসমিল্লা খানি' বলা হতো। এ সময় তার জন্য একখানা রুপার শ্লেট তৈরি করা হতো। শিক্ষক শ্লেটের উপর 'সূরাহ ইকরা' লিখে দিতেন এবং শিশুকে সেটি বারবার পড়তে বলতেন। তার জন্য এ সময় একজন শিক্ষকও নিযুক্ত করা হতো।[২০]

---

[১৭] *History of the Traditional Islamic Educations in Bengal*, *Op. cit.*, p. 14.

[১৮] *History of the Traditional Islamic Educations in Bengal, Op. cit.*, p. 15.

[১৯] W. Adam, *Reports on the State of Education in Bengal* (Calcutta, 1941), Report No. 3, 1838, p. 438.

[২০] এস.এম. জাফর, *মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ৯২।

প্রাথমিক স্তরে প্রথমে উচ্চারণের সাথে বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হতো এবং তারপর শিক্ষার্থীকে ছোট ছোট বাক্য পড়তে ও শেটে লিখতে দেওয়া হতো। এমনিভাবে শিশু আস্তে আস্তে লিখতে ও পড়তে শিখত। এ পদ্ধতিতে লেখাপড়া শিখার পর একজন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে অধ্যয়নের সুযোগ পেত। মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, অর্থনীতি, কৃষিবিজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হতো।[২১] আরবি ও ফার্সি এ দুটি শ্রেণীতে মাদ্‌রাসাগুলো বিভক্ত ছিল। ব্যাকরণের নানা তত্ত্ব, অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক, যুক্তিবিদ্যা, আইনশাস্ত্র এবং ইসলামের মূলনীতিসমূহ ইউক্লিডের জ্যামিতি, টলেমির জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক দর্শন প্রভৃতি মাদ্‌রাসায় শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রাথমিক ও উচ্চ পর্যায়ের ফার্সি, মাদ্‌রাসায় ব্যাকরণ, চিঠিপত্রাদি লেখা, অলংকারশাস্ত্র, ধর্ম, দর্শন কিংবা চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল।

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় প্রচলিত শিক্ষা বিষয়সমূহ উলুম আল-নাকলিয়া[২২] তথা প্রচলিত বিজ্ঞান অন্য অর্থে ধর্মীয় বিজ্ঞান এবং উলুম আল-আকলিয়া[২৩] তথা গবেষণাধর্মী বিজ্ঞান এই দুভাগে বিভক্ত ছিল। বর্তমানকালের কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আলোচ্য উলুম আল-আকলিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যাসহ সকল বিষয় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠদান করা হতো। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্ররা বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। স্কলারশীপের ব্যবস্থা ব্যতীত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপকরণ প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। দরিদ্র ও ইয়াতিম ছাত্রদের জন্য সরকার স্কুল ও ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করে। অভিজাত শ্রেণীর লোক নিজ খরচে দরিদ্র ও ইয়াতিমদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধনী ও দরিদ্র সন্তানের মাঝে কোন প্রকার বিভেদ ছিল না। মুসলিম শাসনামলে নারী শিক্ষার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হতো। মুসলমানগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের কন্যাদের লেখাপড়া করাতেন। মেয়েরা ব্যাপক হারে মক্তবে কুরআন শিক্ষা করত। অভিজাত ঘরের মেয়েরা গৃহে শিক্ষক নিয়োগ করে উচ্চ শিক্ষা লাভ করত।[২৪]

মুসলিম আমলে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তারা সমাজের উচ্চস্তরের লোক ছিলেন। তাঁদেরকে আহল-ই-খায়র, আহল-ই-ফযল, আহল-ই-সাদাত এবং আহল-ই-কলম নামে আখ্যায়িত করা হতো।[২৫] আহল-ই-কলমের সৈয়দগণ টুপি পরতেন। তাঁরা 'কুলাহ দারা' অভিহিত হতেন। আলিমগণের মধ্যে যাঁরা পাগড়ি বা দস্তার পরতেন তাঁরা 'দস্তার বন্দা' নামে অভিহিত ছিলেন। আলিমগণ ছিলেন আইনের প্রবক্তা। সুলতানগণ বিভিন্ন বিষয়ে সমাধানের জন্য আলিমদের সাহায্য নিতেন। আলিমরা সদর-ই-সুদুর, কাযী, শায়খুল ইসলাম, শিক্ষকতা, ইমামতির পদ অধিকার করতে পারতেন।

তৎকালীন সময়ে কোন কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল না। সংশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন ছাত্রের প্রধানতম বিচারক। ছাত্রের শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেই তিনি ছাত্রকে দস্তার কিংবা সনদ ও ইজাজত দিতেন। বেতনধারী শিক্ষকগণ রাষ্ট্র পরিচালিত স্কুল ও প্রতিষ্ঠানে চাকুরি

---

[২১] *ভদেব*, পৃ. ২৯।

[২২] উলুম আল-নাকলিয়ার অধিভুক্ত বিষয়গুলো হলো ইলম আল-কিরআত, ইলম আল-তাফসীর, ইলম আল-তাওহীদ, আল-আদাব আল-আরাবী, কাওয়াইদ আল-আরাবী, ইলম আল-বায়ান এবং ইলম আল-মিরাস।

[২৩] উলুম আল-আকলিয়ার অধিভুক্ত বিষয়গুলো হলো: ইলম আল-মানতিক, ইলম আল-ইকমাত, ইলম আল-ফালসাফা, ইলম আল-হাইয়্যাত, ইলম আল-হিসাব, ইলম আল-হিন্দাসা, ইলম আল-মুসিকী, ইলম আল-তিব্ব।

[২৪] মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬।

[২৫] এ.আর. মল্লিক, *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান*, অনুবাদ দিলাওয়ার হোসেন (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ১৭৫।

করতেন। এসব প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক সম্পত্তি ও জায়গির প্রদান করা হতো। সাধারণ বাড়িঘরে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষকরা পাঠদানের বিনিময়ে ব্যক্তিগত সেবা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করতেন না। গ্রামের স্কুল মাস্টারেরা ফিস হিসেবে নগদ টাকার পরিবর্তে জিনিসপত্র গ্রহণ করতেন। শিক্ষকগণ শিক্ষা প্রদানকে ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব মনে করায় বিনা বেতনেই ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র-শিক্ষক সমবায়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন।[২৬] মুসলিম শাসনামলে মুসলমানগণ কর্তৃক প্রবর্তিত ও উন্নীত শিক্ষাব্যবস্থা বাংলার প্রত্যন্তাঞ্চলের সকল শ্রেণীর নাগরিকের মাঝে বিস্তৃত হয়। শিক্ষার লক্ষ্য ছিল স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে ইহলৌকিক জীবনের কল্যাণ এবং পারলৌকিক জীবনের মুক্তির পথ অনুসন্ধান।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে মুসলিম আমলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার কতিপয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়। প্রথমত, সে যুগে প্রাথমিক থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার সুযোগসহ আবাসিক ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষক-ছাত্র-সম্মিলিতভাবে একই চত্বরে থাকার কারণে ছাত্রদের নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধিত হতো। তৃতীয়ত, শিক্ষাক্রম ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। চতুর্থত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ সরকারি হস্তক্ষেপের প্রভাবমুক্ত ছিল। পঞ্চমত, সে আমলে নিজ নিজ মেধা ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষার্থীগণ পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করে গভীরভাবে অধ্যয়নের সুযোগ পেত। ষষ্ঠত, মুসলিম আমলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শিক্ষকদের পাঠদান করার অনন্য পদ্ধতি এবং শ্রেণীকক্ষে মনোনীত ছাত্রের মাধ্যমে একই পাঠের পুনরালোচনা। শিক্ষানুশীলনের এ পদ্ধতি ছাত্রদেরকে শিক্ষাদানের কলাকৌশলী করে তুলতো। বর্তমানকালের বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়সমূহের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে থাকে তার বহুলাংশ এ পদ্ধতির মাধ্যমে সাধিত হতো। সপ্তমত, সে সময়ে শিক্ষা কেবল অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত ছিল না, বরং আত্মশিক্ষা ও অপরকে শিক্ষিত করে তুলে অশিক্ষিত ও অবহেলিত জনগণকে জ্ঞান বিতরণ, সত্যের প্রচার ইত্যাদি ছিল শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। অষ্টমত, বর্তমান কালের শিক্ষা ব্যবস্থার ন্যায় সে সময়কার শিক্ষা ব্যবস্থার শ্রেণীবিন্যাস ছিল না। সে সময়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদের ভুল-ত্রুটি ধরে তাদের সন্দেহ অপনোদন করার সুযোগ পেতেন। ছাত্রগণও নিয়মিত শিক্ষকদের সান্নিধ্য লাভ করার কারণে প্রশ্ন উপস্থাপন করে নিজেদের দূর্বোধ্য পাঠোদ্ধার করে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করার সুযোগ পেত। সে যুগে শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে পড়ার সময়ে বিদ্যার্থীদের জন্য ছুটির ব্যবস্থাও ছিল। বাংলায় মুসলমানদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন করে এ.এম.ই.সি. বেইলীর উদ্ধৃতি দিয়ে হান্টার বলেন—

> They possessed a system of education which, to use the words of the Indian statesman who knows them best, 'however inferior to that which we have established, was yet by no means to be despised; was capable of affording a high degree of intellectual training and polish; was founded on principles not wholly unsound, though presented in an antiquated form; and which was infinitely superior to any other system of education then existing in India: a system which secured to them an intellectual as well as a material supremacy.[২৭]

---

[২৬] W. Adam, *Op. cit.*, Report 1, p. 24.

[২৭] W.W. Hunter, *Op. cit.*, p. 160.

উপসংহার

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এ সময়কার শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি ছিল মহান আলাহর একত্ববাদ ও আখিরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মশিক্ষা ও অপরকে জ্ঞান দান ছিল প্রত্যেক মুসলমানের পবিত্র কর্তব্য। সরকারি ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা লাভের পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা সমকালীন দাবি ও প্রয়োজন পূরণের উপযোগী ছিল। শাসন পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পন্ন মানুষ এ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তৈরি করা হতো। শিক্ষা ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে তৎকালীন মুসলিম সমাজে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্তি লাভ করে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২

ভাষা আন্দোলন ও ছাত্র নেতৃত্ব

মোহাম্মদ বশির আহম্মদ*

Abstract: The Language movement (1952) is an important chapter in the history of Bangladesh and the student community played glorious role in it. Grievances of the people of East-Bengal manifested themselves in the question of Language after the creation of Pakistan in 1947. Initially there was little response from the intelligentsia and political leaders on the question of Bengali Language. Subsequently, the student leadership challenged the role of Pakistani authoritarian government on the question of language and inspired the political leaders, intellectuals and other professionals to involve in the language movement. In this article, the author tried to analyse the contribution of the students community to Bengali as State language.

ভূমিকা

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে কাজ করে। এই আন্দোলন প্রধানত দুটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার মর্যদা নিয়ে প্রাথমিকভাবে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯৪৮ সালে। প্রথম দিকে এ আন্দোলন ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সে সময় সাধারণ জনগণের মধ্যে এ ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে। বিশেষ করে পাকিস্তানের কর্তৃত্ববাদী সরকারের আচরণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, খাদ্য সংকট ও পুলিশি নির্যাতনের প্রেক্ষিতে সাধারণ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। পরবর্তীতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত আন্দোলন সংঘটিত হয় ১৯৫২ সালে। এ জন্য বলা হয়ে থাকে যে, আটচল্লিশ থেকে বায়ান্ন পর্যন্ত সময়টি পূর্ববাংলার জনগণের মাঝে আত্মসচেতন হওয়ার কাল। এ সময়ে ভাষার প্রশ্নে সচেতন জনগোষ্ঠী খুব দ্রুত পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন পূর্ববাংলার তরুণ ছাত্র সমাজ। আলোচ্য প্রবন্ধে তৎকালীন ভাষা আন্দোলনে ছাত্র সমাজ ও ছাত্র নেতৃত্বের ভূমিকা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে যে দর্শন কাজ করেছিল তা ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে পূর্ববাংলায় আর কাজ করেনি। ভাষার প্রশ্নে বির্তক দেখা দেয় পূর্ববাংলায় তথা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে বাংলাভাষার মর্যাদা নিয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকায় ভাষা আন্দোলন সূচিত হয়। এই আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজ কিছুটা চিন্তাভাবনা করলেও বিষয়টিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দেয় ঢাকার ছাত্র সমাজ। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ছাত্র নেতা মোহাম্মদ তোয়াহার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সাথে সাথেই ভাষার প্রশ্নটি উচ্চারিত হয়।... ভাষা সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ তেমন চিন্তা করতেন না। ...বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে এটা

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

কোনদিন কারো মাথায় ঢোকেনি। বুদ্ধিজীবী মহলে খানিকটা এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা হত, তবে এটাকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিবর্তিত করে ঢাকার ছাত্র সমাজ।[১]

পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র তিন মাস পর ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তৎকালীন পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার এবং আবদুল হামিদ যোগদান করেন এবং সম্মেলন শেষে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে সম্মেলনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সাংবাদিকদের নিকট যে বিবরণ দেন তা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মন্ত্রীদ্বয় তাঁদের বিবরণে বলেন:

> শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ঐ দিন মর্নিং নিউজে প্রকাশিত এবং এ. পি. আই. পরিবেশিত একটি খবরে বলা হয় যে, শিক্ষা সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে উর্দুকে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। পাকিস্তান সংবিধান সভাই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের মীমাংসা করবে।[২]

ছাত্র নেতৃত্ব : ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়

শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর ঢাকার ছাত্র সমাজের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৭ বেলা দুটার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের এক বিরাট সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং 'তমদ্দুন মজলিস'[৩] এর সম্পাদক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।[৪] রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এটি ছিল সর্বপ্রথম সাধারণ ছাত্র সভা। এই সভার উল্লেখযোগ্য দিক ছিল তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফরিদ আহমদ কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা পেশ এবং সে গুলো সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত:

১। বাংলাকে পাকিস্তান ডমিনিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করা হোক।

২। রাষ্ট্রভাষা এবং লিংগুয়া ফ্রাংকা নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য আসল সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া এবং বাংলাভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

৩। পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার উর্দুভাষার দাবিকে সমর্থন করার জন্য সভা তাঁদের আচরণের তীব্র নিন্দা করছে।

৪। সভা 'মর্নিং নিউজ' এর বাঙালী বিরোধী প্রচারনার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্যে পত্রিকাটিকে সাবধান করে দিচ্ছে।[৫]

---

[১] আশরাফ সিদ্দিকী ও অন্যান্য সম্পাদিত, "স্মৃতিচারণ", *একুশের সংকরণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১), পৃ. ৮৭।

[২] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫), পৃ. ৩১।

[৩] তমদ্দুন মজলিস ছিল একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র এবং অধ্যাপকের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠান ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির সপক্ষে অত্যন্ত মৌলিকভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে তার বক্তব্য তুলে ধরে।

[৪] *The Morning News*, 10 December, 1947; উদ্ধৃত, উমর, তদেব, পৃ. ৩১।

[৫] *তদেব*, পৃ. ৩১।

উক্ত সভায় প্রস্তাবনা পেশ ও গৃহীত হওয়ার পর ছাত্র সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । ছাত্ররা মিছিল সহকারে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা প্রদর্শন করে, সেক্রেটারিয়েট ভবন ও বিভিন্ন মন্ত্রীদের বাসভবনে গমন করে বাংলা ভাষার প্রতি মন্ত্রীদের তাৎক্ষণিক সমর্থন আদায় করে। তাছাড়া *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার ঢাকা অফিসে গিয়ে পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাভাষা সম্পর্কে তাদের বৈরী নীতি পরিহার করার দাবি জানান। ছাত্র সমাজের এই পদক্ষেপের ফলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতি তাদের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়।

তাছাড়া ১৯৪৭ সালের ৭ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সমস্যা' শীর্ষক এক সভায় মওলানা আকরম খাঁ উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন:

> বাংলাদেশে উর্দু ও বাংলা লইয়া যে বিতণ্ডা চলিতেছে তাহার কোন অর্থই হয় না। বস্তুত বাংলাদেশের শিক্ষার বাহন বা অফিস আদালতের ভাষা বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা হইতে পারে না।[৬]

মওলানা আকরম খাঁর এই বক্তব্যের ফলে সলিমুল্লাহ হল তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে উজ্জীবিত হয়। ছাত্র সমাজ যখন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে মিছিল, সভা-সমাবেশ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করে, তখন সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে আন্দোলনকারী একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে এবং তারা অত্যন্ত আপত্তিকর বক্তব্যসংবলিত উর্দু ভাষার পক্ষে লিফলেট বিতরণ করে। লিফলেটের সারমর্ম ছিলো:

> উর্দু মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা। এ ভাষার বিরুদ্ধে যে কথা বলবে সে কাফের। এ ধরনের কাফের বা বিধর্মীদের শায়েস্তা করতে হবে।[৭]

উগ্রপন্থী উর্দুভাষা সমর্থনকারীরা শুধু লিফলেট বিতরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, তমদ্দুন মজলিস অফিসসহ বাংলা ভাষা সমর্থনকারীদের ওপর হামলা চালায়। এর প্রতিবাদে ঢাকায় ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে বিভিন্ন অফিসে ধর্মঘট পালিত হয়। ঐ দিন থেকে ১৫ দিনের জন্য ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।[৮] ১৫ দিনের জন্য কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক *ইত্তেহাদ, অমৃত বাজার, যুগান্তর, আনন্দ বাজার* প্রভৃতি পত্রিকা পূর্ববাংলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করা হয়। উল্লেখ্য, পত্রিকাগুলো ভাষা আন্দোলনের পক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখছিল বলে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয়ে এক সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সভায় অধ্যাপক আবুল কাসেমের[৯] প্রস্তাবক্রমে অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটি গঠিত হয়। এ রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটি 'প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে পরিচিত। এই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছাত্র নেতা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মোহাম্মদ তোয়াহা (ফজলুল হক হলের ভিপি), নঈমুদ্দীন আহমদ, ফরিদ আহমদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি), ফজলুর রহমান ভূঁইয়া (এম.এম. হলের প্রচার সম্পাদক), শামসুল আলম (এস. এম. হলের সমাজ সেবা সম্পাদক), অলি আহাদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম (এস. এম. হলের ভিপি) নূরুল হুদা (ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রতিনিধি), মির্জা মাজহারুল ইসলাম (মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি) প্রমুখ। এই ছাত্র নেতারা তৎকালীন ভাষা আন্দোলনে যেমন

---

[৬] দৈনিক আজাদ, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৭; উদ্বৃত, এম. এ বার্ণিক, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ ফেব্রুয়ারি , ২০০৪।

[৭] ঢাকা প্রকাশ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭, উদ্ধৃত, বার্ণিক, তদেব।

[৮] প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, *প্রবন্ধ মঞ্জুষা* (ঢাকা: স্ববিকাশ পাবলিশার্স, ১৯৮৯), পৃ. ৯০।

[৯] অধ্যাপক (প্রিন্সিপাল) আবুল কাসেম ১৯২০ সালে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা, ভাষা সৈনিক, শিক্ষাবিদ ও লেখক ছিলেন। তিনি ১৯৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।। বিস্তারিত পাঠের জন্য দেখুন, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ১ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২১৫।

গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন, তেমনি পরবর্তীতে অনেকেই প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত হন এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতির পদের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন।

পাকিস্তান গণ–পরিষদে বাংলা ভাষা বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন করাচিতে শুরু হয়। অধিবেশনে পূর্ব বাংলার অন্যতম প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা বিষয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[১০] প্রস্তাবটি ছিল, উর্দু ও ইংরেজির সাথে বাংলাকেও গণ-পরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হোক। ২৫ ফেব্রুয়ারি সংশোধনী প্রস্তাবটির ওপর আলোচনা শুরু হলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এর বিরোধিতা করে বলেন:

> এখানে এই প্রশ্নটা তোলাই ভুল হয়েছে। এটা আমাদের জন্য জীবন মরণ সমস্যা। আমি অত্যন্ত তীব্রভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধীতা করি এবং আশা করি যে এই ধরনের একটি সংশোধনী প্রস্তাবকে পরিষদ অগ্রাহ্য করবেন।[১১]

গণ-পরিষদের এই প্রস্তাব তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং অবস্থাটা এমন দাড়ায় যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল মুসলমান সদস্য প্রস্তাবের বিরোধিতা ও নিন্দা করেন। অন্যদিকে যে কয়েকজন হিন্দু সদস্য পরিষদের সসদ্য ছিলেন তাঁরা প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতায় পৌঁছেই শেষ হয়নি, পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সদম্ভে ঘোষণা করেন যে, পূর্ববাংলার অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।[১২]

গণ-পরিষদে মুসলিম লীগের সদস্যদের বাংলাভাষার দাবির প্রস্তাবের বিরোধিতা এবং পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর কটাক্ষপূর্ণ বক্তব্যের ফলে পূর্ববাংলার সচেতন জন সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সিলেট থেকে প্রকাশিত *নওবেলাল* এবং কলকতা থেকে প্রকাশিত *আনন্দবাজার, অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর,* ও *স্বাধীনতা*সহ বিভিন্ন পত্রিকা এ ব্যাপারে দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়গুলোর মাধ্যমে গণ-পরিষদে লিয়াকত আলী খান, তমিজ উদ্দীন খান ও নাজিমুদ্দীনসহ উর্দু সমথর্ক বিভিন্ন নেতার বক্তব্যের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। মুসলিম লীগ সদস্যদের এই আচরণের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় বাংলাভাষার সপক্ষে পাকিস্তান গণ-পরিষদে সংশোধনী আনয়নের জন্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে অভিনন্দন জানানো হয়।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত ও পাকিস্তান মুসলিম লীগের বাংলাভাষা বিরোধী কার্যাকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গঠন করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, বিভিন্ন ছাত্রাবাস এবং তমদ্দুন মজলিসের যৌথ উদ্যোগে ২রা মার্চ ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সভা আহ্বান করা হয়।[১৩] এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কামরুদ্দীন আহমদ।[১৪] উক্ত সভায় তমদ্দুন মজলিস, গণ আজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলের ছাত্রদের নিয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এই পরিষদের আহ্বায়ক

---

[১৩] তাজউদ্দিন আহমেদের ব্যক্তিগত ডায়েরি, ২ মার্চ, ১৯৪৮; উমর, *তদেব*, পৃ. ৫৪।

[১৪] কামরুদ্দীন আহমদ (১৯১২-১৯৮২) মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজনীতিক, কুটনীতিক ও লেখক এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের (১৯৪৮-১৯৫২) অন্যতম নেতা ছিলেন। দেখুন, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২৭৪-২৭৫।

মনোনীত হন শামসুল আলম। এই পরিষদের উদ্যোগে ১১ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। এই কর্মসূচির সপক্ষে ব্যাপক প্রচার আন্দোলন চলতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের ওপর নির্যাতন এবং ধর্মঘট বানচালের জন্য বিভিন্ন ধরনের অপচেষ্টার কারণে সাধারণ ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ছাত্রদের পিকেটিং করা সত্ত্বেও কিছু কিছু কর্মচারী অফিসে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ. কে. ফজলুল হকের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ অনেক আইনজীবী সেদিন কোর্টে যাবার জন্য ছাত্রদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হন এবং বির্তকের এক পর্যায়ে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন বলে জানা যায়। এ সম্পর্কে তৎকালীন *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়:

> এ সময়ে পুলিশ ছাত্রদের ওপর চড়াও হলে ছাত্রদের সঙ্গে হক সাহেবও আহত হন। তাঁর হাঁটুর নীচে পুলিশের লাঠির আঘাত লাগে।[১৫]

তাছাড়া এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক এ. জি. স্টক তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন যে, ফজলুল হককে পুলিশ ঘিরে ফেলেছিল এবং তাঁর মাথায় আঘাত করতে গেলে মাথা বাঁচাতে পারলেও পায়ে আঘাত লাগে।[১৬] এই ধরনের পরিস্থিতিতে গ্রেফতার, পুলিশের হামলা, নির্যাতন ও সরকার সমর্থিত উগ্রপন্থীদের হামলা উপেক্ষা করে ছাত্র সমাজ সেদিনের ধর্মঘটকে সর্বাত্মকভাবে সফল করে তোলে। ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের বর্ধমান হাউজস্থ (বর্তমান বাংলা একাডেমী) বাসভবনে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের বৈঠক শুরু হলে ছাত্ররা সেখানে বিক্ষেভ প্রদর্শন করে। ছাত্রদের বিক্ষোভের মাত্রার কথা চিন্তা করে এবং পূর্ববঙ্গ আইন পরিষেদের বাজেট অধিবেশন চলাকালীন সময়ে এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ায় নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কাছে আলোচনার প্রস্তাব পাঠান। নাজিমুদ্দীনের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম, কামরুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুর রহমান চৌধুরী ও আবদুল মতিন খান চৌধুরী। এই প্রতিনিধি দলের সাথে নাজিমুদ্দীনের অনেক তর্ক-বির্তক হয়। যাহোক, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ তাঁদের দাবির ব্যাপারে অনমনীয় থাকায় শেষ পর্যন্ত নাজিমুদ্দীন একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তিটি (সংক্ষিপ্ত ভাবে) নিম্নরূপ:

> ১। বন্দী মুক্তি, ২। তদন্ত অনুষ্ঠান, ৩। ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, ৪। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রহিত করণ, ৫। বাঙলাকে প্রাদেশিক সরকারী ভাষার মর্যাদা, ৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রাদেশিক সংসদীয় সভায় বাঙলা প্রচলন, ৭। সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইত্যাদি। কিন্তু ছাত্ররা মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চেয়ে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য চাপ দিতে ছিল। শেষ পর্যন্ত আপোষ রফা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ৭ দফা শেষে স্বহস্তে ৮ম দফা লেখেন:—৮। সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।[১৭]

---

[১৫] *দৈনিক আজাদ, ১৩ মার্চ, ১৯৪৮;* উদ্ধৃত, বার্ণিক, *দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪।*

[১৬] A. G. Stock, *Memoirs of Dacca University,* 1947-1957, (Dacca: Green Book House Limited, 85, Motijheel Commercial Area, 1973), p. 91.

[১৭] *East Bengal Legislative Assembly Proceeding,* Vol. I. No. I; *The Amrita Bazar Patrika,* 16 March, 1948; উদ্ধৃত, উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতি* (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬; মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, ১৮৩০-১৯৫২, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ৯৫।

ঢাকায় জিন্নাহর আগমন

পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজের জোরালো আন্দোলনের মুখে নাজিমুদ্দীন যে চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেন, তা ছিলো ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক বিজয়। কারণ একজন মুখ্যমন্ত্রীকে ছাত্রদের আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। এই চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এ সময়টিতেই তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ব পাকিস্তান সফরের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি ছাত্রদের ক্ষোভ থাকলেও জিন্নার প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল। সম্ভবত এ কারণেই ছাত্রদের অব্যাহত বিক্ষোভের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পূর্ববাংলার সরকার জিন্নাহর আগমন কামনা করেন। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ জিন্নাহ আগমন করেন এবং ২১ মার্চ তাঁকে ঢাকার নাগরিকেরা রেসকোর্স ময়দানে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জিন্নাহ তাঁর বক্তৃতায় ভাষার প্রশ্ন এবং ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন। ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্যে এবং আন্দোলনকারীদের চরিত্র সম্পর্কে শ্রোতামণ্ডলীকে সর্তক করে দিয়ে তিনি বলেন:

> আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদেরকে জানাতে চাই যে আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে এ কথার কোন সত্যতা নেই। কিন্তু আপনারা এই প্রদেশের অধিবাসীরাই চূড়ান্তভাবে স্থির করবেন আপনাদের প্রদেশের ভাষা কি হবে। কিন্তু এ কথা আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু অন্য কোন ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু।[১৮]

জিন্নাহর উপর্যুক্ত বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পূর্ববাংলার সরকারি ভাষা বাংলা হবে কিনা সে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। বাংলা অথবা উর্দু যাই হোক সেটা তাঁরা নিজেরাই স্থির করতে পারবে। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে পূর্ববাংলার মানুষকে কোনো স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে না। কাজেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তিনি পূর্ববাংলার এমনকি সারা পাকিস্তানের জনসাধারণের ওপর ছেড়ে না দিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে নিজেই সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা এবং ছাত্র-সমাজের তীব্র প্রতিবাদ

১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ সমার্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের ভাষা সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলেন, 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে' এই ঘোষণামাত্র হলের (কার্জন হল) মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যাক ছাত্র 'না-না' বলে চিৎকার করতে থাকেন।[১৯] জিন্নাহ তাঁর সমাবর্তন বক্তৃতায় ভাষার প্রশ্নে তাঁর রেসকোর্স ময়দানের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করবেন ছাত্ররা তা আগে থেকেই ধারণা করতে পেরেছিলেন। যার ফলে তারা তাৎক্ষণিক ভাবে 'না-না' চিৎকার করে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। ছাত্রদের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের ফলে জিন্নাহ নিজেকে সংযত করে নেন। কিন্তু ভাষা আন্দোলনকারীদের নির্দেশ করে তিনি এ আন্দোলনকে শত্রুদের দ্বারা প্ররোচিত কাজ বলে আখ্যায়িত করেন। নাজিমুদ্দীনের সাথে সম্পাদিত সংগ্রাম পরিষদের চুক্তিকে জিন্নাহ অত্যন্ত হালকা একটি ব্যাপার হিসেবে নিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, ছাত্রদেরকে ডেকে তিনি নিজ ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই এ চুক্তিকে বাতিল করে দিতে সক্ষম হবেন। সেই উদ্দেশ্যে জিন্নাহ ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

---

[১৮] Quaid-I-Azam Mohammad Ali Jinnah's Speeches as Governor General (Karachi: Pakistan Publications), p. 89; উদ্ধৃত, উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।

[১৯] উমর, *তদেব*, পৃ. ৯৬।

কিন্তু ছাত্রদের সেই প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকজন হিন্দু ছাত্র থাকায় জিন্নাহ আলোচনা করেননি। এতে তাঁর সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পায়। পরে শুধুমাত্র মুসলমান ছাত্রদের সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসেন। ভাষার প্রশ্নে কর্ম-পরিষদ ও ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা সত্ত্বেও পূর্ববাংলার গণ-মানুষের প্রাণের দাবির কথা জিন্নাহ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। জিন্নার স্বেচ্ছাচারী আচরণ ও আক্রমানাত্মক, অগণতান্ত্রিক ও সম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে যায়।

ছাত্র নেতৃত্ব : ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের মাইলফলক হিসেবে ১১ই মার্চ তারিখটি পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ শ্রদ্ধার সাথে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করতো। কিন্তু ১৯৫০ সালে ১১ই মার্চ তারিখটি অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছিল বলে জানা যায়। অনুমান করা হয় যে, সে সময় স্মরণকালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ছাত্র আন্দোলনের পরিস্থিতি এতো বেশি নিমজ্জিত ছিল যে, হয়তো পরিস্থিতির কারণে এ দিবসটি (১১ই মার্চ) উপলক্ষে বড় কোনো কর্মসূচি পালন করা সম্ভব হয়নি। তবে ঐ বছর (১৯৫০) ১১ই মার্চের সাধারণ অনুষ্ঠানে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়। আহ্বায়ক মনোনীত হন আবদুল মতিন। পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হাবিবুর রহমান শেলী, বদিউর রহমান, মাকসুদ আহমেদ, তাজউদ্দিন আহমদ, মোশারফ হোসেন, আনোয়ারুল হক, আবদুল ওদুদ, নুরুল আলম, সালাউদ্দীন, রুহুল আলম চৌধুরী প্রমুখ। আবদুল মতিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পরে 'রাষ্ট্রভাষা মতিন' নামে পরিচিতি লাভ করেন।[২০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাদের কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্যদের কাছে পাঠানো। আইন পরিষদের সভা তখন করাচিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। হাবিবুর রহমান শেলী ও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে মূল দায়িত্ব দিয়ে একটি খসড়া প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। তাঁদের প্রণীত খসড়া নিয়ে ডাকসু অফিসে সংগ্রাম পরিষদ ২৫শে মার্চ এক সভায় মিলিত হন এবং তা চূড়ান্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আবদুল মতিনের নামে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।[২১] স্মারক লিপিটি পাঠিয়ে দেবার পর ১২ই এপ্রিল, ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে সংগ্রাম পরিষদের এক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, স্মারকলিপির কথা জানিয়ে পূর্ববঙ্গীয় সদস্যদর কাছে টেলিগ্রাম করা হবে। এর উদ্দেশ্য, যাতে পূর্ববঙ্গীয় সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে পার্লমেন্টে ভাষা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত নোটিশ প্রদান করতে পারেন।

সংগ্রাম পরিষদের এইসব তৎপরতা সত্ত্বেও কোনো উন্নতি লক্ষ করা যায়নি। বরং বাঙালি সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ উর্দুর পক্ষে তৎপর হয়ে ওঠেন। যেমন মওলানা আকরম খাঁ উর্দুর পক্ষে বাংলা ভাষার বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন। যদিও তিনি ১৯৪৭ সালে এক সভায় বাংলাভাষার পক্ষে কথা বলেন, আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম দিকে তা উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হওয়ার পর ১৯৫১ সালব্যাপী বাংলা ভাষার পক্ষে যে ধরনের কর্মতৎপরতা পরিচালিত হয়, তা আন্দোলনের পর্যায়ে না পৌঁছলেও এর মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনকে জিইয়ে রাখা হয়েছিল।

---

[২০] হান্নান, *তদেব*, পৃ. ১৩২।

[২১] পরিষদের আহ্বায়ক আবদুল মতিন এই বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, "কারো কাছে থেকে সাড়া না পেয়ে অবশেষে আমিই স্মারকলিপিটি লিখেছিলাম"। আবদুল মতিন, *ভাষা ও একুশের আন্দোলন* (ঢাকা: নন্দন প্রকাশন, ১৯৮৬), পৃ. ২৭, উদ্ধৃত, হান্নান, *তদেব*, পৃ. ১৩৩।

ছাত্র নেতৃত্ব ও ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব

১৯৫২ সাল ছিল পূর্ববাংলার মানুষের জীবনে একটি তৎপর্যময় বছর। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ছাত্র-মানসে অস্থিরতার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে সংকট দেখা দেয়, যেমন খাদ্য সংকট, লবণ সংকট, পাটের বাজার মন্দা ইত্যাদি। পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ঘটেছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুবলীগ ইত্যাদির মতো কয়েকটি সংগঠনের উপস্থিতি এবং তাদের গণতান্ত্রিক তৎপরতা। এহেন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকায় আসেন। এসেই ২৭ জানুয়ারি (১৯৫২) পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তাঁর পূর্বসূরিদের মতোই আবার ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।' ছাত্র সমাজ তার এই ঘোষণায় স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। কারণ নাজিমুদ্দীন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ ছাত্রদের সঙ্গে বাংলাকে স্বীকৃতি দিয়ে যে চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেন, তার সাথেই তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এর ফলে ছাত্র সমাজ আবারো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই ঘোষণার পর ১৯৫২ সালের ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিবাদ ও ধর্মঘট পালন করে।

ভাষা বিতর্কের নতুন উত্তাপের পটভূমিতে যে কর্মতৎপরতার শুরু হয়, সেই সূত্রেই ৩১শে জানুয়ারি (১৯৫২) ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুব এই পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন। এই পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি সম্পৃক্ত ছিলেন। বাংলাকে রাষ্টভাষা করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সমর্থনে ১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৫২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি নিখিল পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের জরুরি অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আপোসহীন সংগ্রাম পরিচালনার কথা ঘোষণা দেওয়া হয়।[২২] উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে সরকার চিরাচরিত পন্থা অবলম্বন করে, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকা শহরে সভা-মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে।[২৩] উল্লেখ্য, ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকার পূর্ববাংলা আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন আহ্বান করেছিল। আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য ছিল যে, আহুত বাজেট অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করুক। কিন্তু হীতে বিপরীত হয় অর্থাৎ সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে তুমুল বাক-বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়। অধিকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করেন যে, তারা যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তাহলে দেশে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে সরকার জরুরি অবস্থার অজুহাতে সাধারণ নির্বাচন বন্ধ করে দিতে পারে। তার সরকারকে সে সুযোগ দিতে চায় না।[২৪] অন্যদিকে যুবলীগের সদস্যরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য চাপ দিতে থাকে। অলি আহাদ, আব্দুল মতিন যুক্তি দেন যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলনে অগ্রসর না হলে ভাষা আন্দোলনের এখানেই অনিবার্য মৃত্যু ঘটবে, আর সরকারি দমনীতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করা হলেও জন সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এর মধ্যে সলিমুল্লাহ হল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাম কমিটির একটি প্রতিনিধি দল এসে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদকে জানিয়ে দেয় যে, ছাত্ররা পরের দিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে। এ কথায় সর্বদলীয়

---

[২২] *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, উদ্ধৃত, বার্ণিক, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪।

[২৩] *দৈনিক আজাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২;* উদ্ধৃত, বার্ণিক, তদেব।

[২৪] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *একুশে ফেব্রুয়ারি* (সংকলন) (ঢাকা: পুথিঘর প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ১৯৬৫), পৃ. ২১৫।

সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ হন। এমন এক পরিস্থিতিতে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ শেষ পর্যন্ত বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য ভোটে দেন:

> ১১ জন ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে এবং ৪ জন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। ৪ জন হলেন, অলি আহাদ, আবদুল মতিন, গোলাম মাওলা এবং শামসুল আলম। তোয়াহা ভোট দানে বিরত থাকেন।[২৫]

তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের প্রভাবশালী ছাত্র নেতারা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রশ্নে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি স্থির করার লক্ষ্যে ২০ তারিখ গভীর রাতে ফজলুল হক হলের পুকুরের পুর্ব ধারের সিঁড়িতে একটি বৈঠক করেন। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যে কোনো মূল্যে ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ১১ জন। এঁরা হলেন , হাবিবুর রহমান শেলী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মোহাম্মদ সুলতান, এস. এ. বারী এ. টি , আবদুল মোমিন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, এম. আর. আখতার মুকুল, কমরুদ্দীন, আনোয়ারুল হক, আনোয়ার হোসেন ও গাজীউল হক।[২৬]

উল্লিখিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে আনোয়ার হোসেনের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তিনি বাংলা বিভাগের ছাত্র পরিচয় দিয়ে ইকবাল হলে থাকতেন। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের চার-পাঁচ মাস পর জানা যায় যে, তিনি আসলে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের লোক এবং সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার একজন অফিসার। এই তথ্য পাওয়ার পর বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তাকে নাজেহাল করে হল থেকে তাড়িয়ে দেয়।

১৯৫২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি গভীর রাতের উল্লিখিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার লক্ষ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলায় গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শামসুল হক ও আব্দুল মতিন বক্তৃতা করেন। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে শামসুল হক ১৪৪ ধারার না ভাঙ্গার পক্ষে বক্তৃতা দেন। ফলে সমাবেশে ছাত্র-জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। নানারূপ ধ্বনি দিয়ে তারা শামসুল হককে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করে।[২৭] এর পর আবদুল মতিন ও গাজীউল হক ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে সিদ্ধান্ত দেন। সমাবেশে উপস্থিত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা এক বাক্যে তা সমর্থন করেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ১০ জন করে ছাত্র/ছাত্রী 'ব্যাচ' গঠন করে আইন পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হবেন। বিভিন্ন ব্যাচের নেতৃত্ব দেন যথাক্রমে, হাবিবুর রহমান শেলী, ইব্রাহীম তাহা, আবদুস সামাদ, আনোয়ারুল হক প্রমূখ এবং মেয়েদের ব্যাচের নেতৃত্ব দেন শাফিয়া, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহীম, শামসুন নাহার প্রমূখ। ছাত্রদের ব্যাচকে পুলিশ ট্রাকে তুলে নেয় এবং মেয়েদের মিছিলে লাটিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী আহত এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল কলেজ ছাত্রাবাস ইত্যাদি জায়গায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রাবাস গুলোতে ঢুকে পুলিশ ছাত্রদের ওপর আক্রমণ করায় উত্তেজনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রতিরোধকালে ছাত্ররাও পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। আক্রমনের প্রচণ্ডতায় দিশেহারা হয়ে আনুমানিক বিকেল ৪টার দিকে পুলিশ মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের সামনে গুলি চালায়। এই গুলিতে তৎকালীন ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্র সালাউদ্দীন, আবদুল জব্বার, আবুল, বরকত, রফিক উদ্দীন শহীদ হন। আরো অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হন।

ছাত্রদের ওপর পুলিশের আক্রমণ, নির্যাতন সর্বোপরি গুলি চলানোর খবর তড়িৎ গতিতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকার বিভিন্ন অফিস, আদালত, সচিবালয়, এমনকি

---

[২৫] সাক্ষাৎকার, গাজীউল হক, উদ্ধৃত, মোস্তফা কামাল, *ভাষা আন্দোলন সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*, ২য় প্রকাশ, (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১৯৭৭), পৃ. ১০৭।

[২৬] *তদেব*, পৃ. ১৫৫-১৫৬|

[২৭] মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮২), পৃ. ১০৭।

ঢাকার বেতার কেন্দ্রের কর্মচারীরা পর্যন্ত অফিস বর্জন করে রাস্তায় নেমে পড়ে। ঢাকা শহরের রাস্তাসমূহ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এই ঘটনার উন্মত্ততা পূর্ববাংলা আইন পরিষদের অভ্যন্তরেও পড়ে। বিরোধী দলের সদস্যরা এই ঘটনার কৈফিয়ত দাবি করলে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন ব্যাপারটি হালকা ভাবে নেন। মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ[২৮] এই ঘটনার প্রতিবাদে পরিষদ গৃহ পরিত্যাগ করেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ভয়াবহ ঘটনার পর সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরিষদের নেতৃবৃন্দের অনেকেই আঘাতপ্রাপ্ত ও গ্রেফতারের কারণে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাই তখন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকে।[২৯] মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে আন্দোলন পরিচালনার জন্য 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' খোলা হয়। সেখান থেকে মাইকে বিভিন্ন নির্দেশ ঘোষণা করা হয়।[৩০] গুলি বর্ষণের পর আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণের জন্য অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মিলিত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তমদ্দুন মজলিসের রাজনৈতিক ফ্রন্টের আহ্বায়ক আবুল হাশিম, সাপ্তাহিক *সৈনিক* সম্পাদক আবদুল গফুর, কামরুদ্দিন আহমদ, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, কবির উদ্দীন আহমদ, শহীদুল্লাহ কায়সার, কে. জি. মোস্তফা, মাহবুব জামাল জাহেদী, গোলাম মাওলা প্রমুখ। বৈঠক শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি গোলাম মাওলাকে আহ্বায়ক করা হয়।[৩১] উক্ত সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২২ ফ্রেব্রুয়ারি সকাল ৭ টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে গায়েবানা জানাজা এবং জানাজা শেষে ঢাকা শহরে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দেয়া হয়। তাছাড়া জনতার ওপর গুলি বর্ষণ, পুলিশের বর্বরোচিত নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২৫শে ফ্রেব্রুয়ারি পর্যন্ত লাগাতার ৯৬ ঘন্টা ধর্মঘট/হরতাল কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেয়।[৩২] ছাত্র সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২ ফ্রেব্রুয়ারি গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় হাজার হাজার লোক অংশ গ্রহণ করে এবং জানাজা শেষে যুবলীগের সম্পাদক মুহাম্মদ এমাদুল্লাহর সভাপতিত্বে এক সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা মাতৃভাষা বাংলাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[৩৩] ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনার প্রতিবাদে ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতা মিছিল বের করলে, পুলিশ ও সামরিক বাহিনী গুলি বর্ষণ করে। এতে ৪ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়।[৩৪] ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের ওপর পুলিশী হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে তৎকালীন দৈনিক আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন আইন পরিষদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন।[৩৫] ঢাকা হল ও জগন্নাথ হলের ছাত্রদের যৌথ সভায় সরকারের বর্বরোচিত কার্যকলাপের নিন্দা করা হয় এবং পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নরুল আমীনের পদত্যাগ দাবী করা হয়।[৩৬] উক্ত ঘটনাবলীর জন্য বিভিন্ন সংগঠন, যেমন তমদ্দুন মজলিস, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ এবং আজিমপুর কলোনির মহিলাদের

---

[২৮] মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬) একজন রাজনীতিক ছিলেন। তিনি সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশিক পরিষদের অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করেন এবং মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন। বিস্তারিত দেখুন, *বাংলাপিডিয়া*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮২-৮৩।

[২৯] হাসান হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭।

[৩০] রফিকুল ইসলাম, *ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার* (ঢাকা: প্রকাশক, আনন্দ, ১৯৮২), পৃ. ৩০।

[৩১] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ৩য় খণ্ড (চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৯৮৫), পৃ. ৩০৯-৩১০।

[৩২] *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২৮ ফেব্রুয়ারি , ১৯৫২।

[৩৩] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫-৭৫)* (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-আপারেটিভ বুক সোসাইটি), পৃ.১২৯-৩০, দ্রষ্টব্য।

[৩৪] *দৈনিক আজাদ*, ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২।

[৩৫] *তদেব*।

[৩৬] *তদেব*, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও কর্মচারী সমিতিও অনুরূপভাবে প্রতিবাদ সভা করে। করাচীর *ইভনিং স্টার, ইভনিং টাইমস* ও অন্যান্য পত্রিকায় ঢাকার ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা হয়। তাতে শহীদ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয় এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করা হয়। *ইভনিং টাইমস*-এ বলা হয়:

> উর্দুর সঙ্গে বাংলাও যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং যত শীঘ্র এর মিমাংসা হয় ততোই ভালো।[৩৭]

ছাত্র-জনাতার তীব্র আন্দোলন ও দাবির প্রেক্ষিতে এবং পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত পূর্ববাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল অমীনের প্রস্তাবক্রমে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় 'সাফল্যের সূচনা' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে পরিগণিত করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রগণ যে আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন উহা আজ কোন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে তাহা ধীরভাবে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। এ ব্যাপারে ছাত্রগণের অপরিসীম ত্যাগ ও আদর্শ নিষ্ঠা পাকিস্তানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদেরই আন্দোলন ও ত্যাগের ফলে প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীনের প্রস্তাবক্রমে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার সুপারিশ জানাইয়া প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।[৩৮]

গণ-পরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি বিল পাস করলেও ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। ভাষা আন্দোলনে তৎকালীন ছাত্র সমাজ ও জনগণ যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন তার ওপর একটি মূল্যায়ন করে 'মাতৃভাষার জন্যে' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে কলকাতার *আনন্দবাজার পত্রিকা*। পত্রিকাটিতে বলা হয়:

> পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ তাহাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য যে আদর্শ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহা কখনও ব্যর্থ হইবার নয়। পাকিস্তানের মোট জনসমষ্টির দুই তৃতীয়াংশের মাতৃভাষার দাবিকে কাঁদানে গ্যাস,লাঠি ও গুলি চালাইয়া হত্যা করা যে সম্ভব নয়, তা পাকিস্তান কর্মকর্তাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত ছিল।... জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত দাবীকে যে জোর জুলুম চালাইয়া দমন করা যায় না পূর্ব বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন তাহা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন দেখিতেছি। ...ছাত্রগণের আত্মদানের পরে জনাব নুরুল আমিন পূর্ববঙ্গের জনতাকে অন্ততঃ পরিষদ কক্ষে মর্যাদা দিয়াছেন। এবারে প্রয়োজন হইবে করাচীর কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি। পূর্ব বঙ্গের জনসাধারণ ও পরিষদের সদস্যগণের বাংলা ভাষার এই দাবী এতই যুক্তিপূর্ণ এবং সত্য ও সঙ্গত যে, আজ না হউক, কাল তাহা করাচীর কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করিতেই হইবে। আজ ইহাই বলিবার ও হৃদয়ঙ্গম করিবার যে, ঢাকার জনগনের মাতৃভাষার প্রতি মর্যাদাবোধ ও তাহাদের আদর্শ নিষ্ঠাই পূর্ববঙ্গের সাড়ে চার কোটি নর-নারীর মাতৃভাষাকে অমর্যাদা ও উপেক্ষার হাত হইতে রক্ষা করিবার প্রাথমিক প্রয়াসে জয়যুক্ত হইয়াছে।[৩৯]

---

[৩৭] বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৪৪৩।

[৩৮] *তদেব*, পৃ. ৪৪৬।

[৩৯] *আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২* উদ্ধৃত, ড. সুকুমার বিশ্বাস, সংগ্রহ ও সম্পাদনা, *বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন কলকাতার সংবাদপত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৭৩-৭৫।

উপসংহার

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির সব আবেগ, দুঃখ-বেদনা সর্বোপরি মায়ের ভাষার চেতনার সঞ্জীবন ঘটে তেপ্পান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের মধ্য দিয়ে, শপথে ও শ্লোগানে এটাই ছিল প্রথম 'শহীদ দিবস' পালন। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আতাউর রহমান খান ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের আহ্বান জানান। তারপর থেকে অদ্যাবধি এই দিন 'শহীদ দিবস' তথা 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা মর্যাদার আন্দোলনের গোড়া থেকেই পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ সম্পৃক্ত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন—ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জগন্নাথ কলেজ ও ইডেন কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সাথে সাংস্কৃতিক সংগঠন তমদ্দুন মজলিসের নেতৃবৃন্দও সংযুক্ত ছিলেন। ছাত্র নেতৃত্ব ও তমদ্দুন মজলিসের যৌথ উদ্যোগে যখন ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়, তখন বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন এবং সাধারণ জনগণ সম্পৃক্ত হন। বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কর্মচারী সমিতি, ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, সচিবালয়ের কর্মচারীবৃন্দ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুবলীগ প্রভৃতি। ভাষার প্রশ্নে উল্লেখিত সংগঠনগুলো ছাড়াও সাধারণ জনগণকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা যেমন—*নওবেলাল, সৈনিক, আজাদ* এবং *কলকাতা* থেকে প্রকাশিত *আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, যুগান্তর, স্বাধীনতা* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এই কারণে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কলকাতার পত্র-পত্রিকাকে সাময়িক সময়ের জন্যে পূর্ব বাংলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তীব্র আন্দোলন ও রক্তাক্ত ঘটনা তৎকালীন পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার আপামর জনসাধারণের যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল এর সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণ তাদের রায় প্রদান করেন এবং যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবেরর জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারকে স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিদায় নিতে হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে এবং ১৯৬২ সালের আইয়ুব খান কর্তৃক ঘোষিত সংবিধানে উর্দুর সাথে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ও জাতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক ভাষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্যের ইস্যুতে পূর্ববাংলার জনগণের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। এই যুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণ বিজয় লাভ করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। অবশেষে, ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যদা পায়। বর্তমানে বাংলা আন্তর্জাতিক ভাষার সম্মান লাভ করেছে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২

মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রনীতি : প্রসঙ্গ মধ্যপ্রাচ্য

মো. ফায়েকউজ্জামান*

Abstract: In the liberation war of 1971, it was a crucial need for the government of Bangladesh to get international support and it took various diplomatic initiatives to achieve this goal. As a result, it got informal supports from many governments and international communities. As a Muslim country, Bangladesh also tried to get support from the Middle-Eastern Muslim countries. In this article the author tried to discuss the attempts and strategies taken by the government of Bangladesh and to examine the attitudes and responses of the countries.

ভূমিকা

পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৩ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাঙালি জাতি স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকার বাঙালিদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করতে প্রস্তুত ছিল না। এজন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে গড়িমসি করে এবং ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১লা মার্চ স্থগিত ঘোষণা করে। এরপরই আপামর বাঙালি রাস্তায় নেমে আসে ও বিক্ষোভে অংশ নেয় এবং কার্যত ২রা মার্চ থেকেই বাংলাদেশে পাকিস্তান শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসমুদ্রে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নির্দেশে ৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসন পরিচালিত হয়।[১] ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়।[২] এর মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ১৯৭১ সালের ২৪শে মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ভেঙ্গে যাবার পর ২৫শে মার্চ গভীর রাতে পাকবাহিনী ঘুমন্ত বাঙালির উপর সশস্ত্র হামলা করে রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানা বিডিআর হেডকোয়ার্টারে অবস্থানরত অসংখ্য বাঙালি সৈন্যকে হত্যা করা হয়।[৩]

---

* ড. মো. ফায়েকউজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

[১] ভাষণের বিস্তারিত দেখুন, আবুল কাশেম (সম্পা:) *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও আওয়ামীলীগ: ঐতিহাসিক দলিল* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০), পৃ. ২৫৮।

[২] রাওফরমান আলী (শাহ আহমেদ রেজা অনূদিত) *বাংলাদেশের জন্ম* (ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৬), পৃ. ৭৬।

[৩] এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে, সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস্ ও অন্যান্য বাহিনী* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯)।

২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে শেখ মুজিব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে প্রাণরক্ষা করেন এবং পরবর্তীতে ভারতে গমন করেন। ১৯৭১ সালের ৪ঠা এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎকালে ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবের খোঁজ-খবরসহ বাংলাদেশ সরকার গঠনের অগ্রগতি জানতে চান। 'বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে' তাজউদ্দিন আহমেদ ইন্দিরা গান্ধীকে এমন একটা ধারণা দেন এবং নিজেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উপস্থাপন করেন।[৪] পরবর্তীতে ১০ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়া গ্রামে এ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শপথ গ্রহণের পরই তাজউদ্দিন আহমদ এ স্থানের নামকরণ করেন মুজিবনগর।[৫] অতঃপর পাকবাহিনীর হামলার আশঙ্কায় সরকারের মন্ত্রীবর্গ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দ্রুত মুজিবনগর ত্যাগ করে কলকাতায় গমন করেন। কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে এ সরকারের সচিবালয় স্থাপিত হয়।[৬] মুজিবনগরের নামানুসারে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের নাম হয় মুজিবনগর সরকার। কলকাতায় থেকে সরকারের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলেও কাগজপত্রে সর্বত্রই মুজিবনগর নাম ব্যবহার করা হয়। এ সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং এর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে।

আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবেদন

বাংলাদেশ সরকার গঠিত হবার পরই প্রশ্ন আসে যে, সরকারের পররাষ্ট্রনীতি কি হবে। স্বাভাবিকভাবেই কোনো যুদ্ধকালীন সরকারের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য থাকে তার পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করা। বাংলাদেশ সরকারের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হবার পূর্ব মূহুর্তে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।[৭] এই ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসকেদের নিকট পৌঁছে।[৮] চট্টগ্রামেও ঐ দিন রাতেই এম.আর. সিদ্দিকীর নিকট পৌঁছে যায়। এরই সূত্রে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আওয়ামীলীগ নেতা এম.এ. হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণায় তিনি 'বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন' জানান।[৯] ২৭শে মার্চ একই কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণায়ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের সহায়তা কামনা করা হয়। মেজর জিয়া এ ঘোষণায় বলেন—

> I also declare, we have already framed a sovereign, legal government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution. The new democratic government is committed to policy of non-alignment in

---

[৪] মইদুল হাসান, *মূলধারা '৭১* (ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৬), পৃ. ১২।

[৫] ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের সাক্ষাৎকার, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, ১৫শ খণ্ড* (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৫), পৃ. ১২১।

[৬] বর্তমানে এটি শেক্সপিয়ার স্মরণী।

[৭] *Bangladesh Document, Volume 1* (New Delhi: Indian Ministry of External Affairs, 1972), p. 21.

[৮] কে.এম. মোহসীন ও মেজর রফিকুল ইসলাম, "মুক্তিযুদ্ধ: সামরিক ও বেসামরিক প্রতিরোধ" *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০), পৃ. ৬২২-৬২৩।

[৯] এম.আর. সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকার, *দলিলপত্র, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৩।

শাহরিয়ার কবির, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত', সালাহ্উদ্দিন আহমদ, মোনায়েম সরকার ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ২৯৪।

> international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all government to mobilize public opinion in their respecting countries against the brutal genocide in Bangladesh.[১০]

৩০শে মার্চ জিয়াউর রহমান অপর এক ঘোষণায়ও বলেন, 'I once again request the United Nations and the big powers to intervene and physically come to our aid. Delay will mean massacre of additional millions.'[১১] বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিবেশীসহ বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের কাছে সাহায্যের এ আবেদন সংক্রান্ত ঘোষণা ভারতীয় বেতার আকাশবাণী থেকেও প্রচারিত হয়।[১২]

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল সরকার গঠনের পরই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কাছে কূটনৈতিক স্বীকৃতির জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি ভাইদের বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ জানিয়েছি। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানীতে আমরা আমাদের প্রতিনিধি পাঠাচ্ছি এবং বিদেশের সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে কূটনৈতিক স্বীকৃতি ও আমাদের স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষার সংগ্রামে সাহায্য ও সহানুভূতি চেয়ে পাঠাচ্ছি।'[১৩] তাজউদ্দিন আহমদের ভাষণে পররাষ্ট্র সংক্রান্ত এই বক্তব্য সরকারের প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। এ ঘোষণাও অল ইন্ডিয়া রেডিওর শিলিগুড়ি কেন্দ্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে এ আবেদন পৌঁছাতে শুরু করে। ১৭ই এপ্রিল সরকারের শপথ গ্রহণের পর তাজউদ্দিন আহমেদ মুজিবনগরে শতাধিক দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের সামনে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন, তাতেও বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন পূর্ণব্যক্ত করা হয়। তিনি বলেন—

> In our struggle for survival we seek the friendship of all people, the big powers and the small. We do not aspire to join any bloc or pact but will seek assistance from those who give it in a spirit of good will free from any desire to control our destinies. We have struggle for too long for our self determination to permit ourselves to become any one's satellite. We now appeal to the nations of the world for recognition and assistance both material and moral in our struggle for nationhood. Everyday this is delayed a thousand lives are lost and more of Bangladesh's vital assets are destroyed. In the name of humanity act now and earn our undying friendship.'[14]

তাজউদ্দিন আহমেদের এই আবেদন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে যায়। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামও মুজিবনগরে শপথ গ্রহণের পর ভাষণ দেন। এতেও বিশ্বের বৃহৎশক্তিবর্গের সাহায্য কামনা করা হয়। ভারতসহ সমগ্র বিশ্বে তখন বাংলাদেশ বিষয়ে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশে গণহত্যার নিন্দা এবং পাকিস্তানকে সংযত

---

[১০] *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২।
[১১] *তদেব*, পৃ. ৩।
[১২] শাহরিয়ার কবির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৪।
[১৩] *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫।
[১৪] *তদেব*, পৃ. ৩২।

আচরণ করার এবং শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার আহ্বান জানায়।[১৫] ২৮শে এপ্রিল ১৯৭১ তাজউদ্দিন আহমেদ ভারতসহ বিশ্বের বৃহৎশক্তির কাছে অস্ত্র সাহায্যের আবেদন জানান।

মুজিবনগর সরকার শুধু বৃহৎশক্তির কাছে সাহায্যের আবেদনের মধ্যে তাদের কূটনৈতিক কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য বাংলাদেশের পেশাদার কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে বিদেশে প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণা বা সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে দক্ষ কূটনীতিকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। সরকার গঠনের পূর্বেই এক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৯৭১ সালের ৬ই এপ্রিল পাকিস্তানের দিল্লী দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব কে.এম. শেহাবুদ্দিন ও সহকারী প্রেস সেক্রেটারী জনাব আমজাদুল হক স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এ ঘটনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। উপর্যুক্ত দুজন কূটনীতিকের দিক-নির্দেশনায় বাংলাদেশ সরকার কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশন অফিসের বাঙালি কূটনীতিকদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন এবং ১৮ই এপ্রিল ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব হোসেন আলীর নেতৃত্বে সব বাঙালি কূটনীতিক ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এ ঘটনাও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, বিশেষ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাঙালিদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, আর্জেন্টিনা, সুইডেন ও ইরাকসহ বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকগণ পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এর ফলে সমগ্র পৃথিবীতে বিশেষ করে পরাশক্তিসমূহের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেতে থাকে।

পররাষ্ট্র বিষয়ক আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম

১৯৭১ সালের ১৮ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং সচিব নিযুক্ত হন মাহবুবুল আলম (চাষী)। সরকারের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হলেও এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সার্বিক তত্ত্বাবধান করতেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই বিদেশে বাংলাদেশের কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। কারণ ৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে পৃথিবীর কোনো দেশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি।[১৬] ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অর্থাৎ ভারতীয় পাসপোর্ট ব্যবহার করে এবং ভারতের বাইরে অবস্থানরত ভারতীয় দূতাবাসের সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল কূটনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।[১৭] বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বেশ কজন বাঙালি কূটনীতিক ও মুজিবনগর থেকে প্রেরিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলসমূহ বিদেশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে যে ভূমিকা পালন করে, তাই পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের মূল বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।[১৮]

---

[১৫] *Bangladesh Document, Volume 1* (New Delhi: Indian Ministry of External Affairs, 1972), p. 21.

[১৬] ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ এ ভারত প্রথম বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়।

[১৭] মুহম্মদ নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা* (ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ২১৬।

[১৮] কারণ সব কূটনীতিবিদ তখনও বাংলাদেশের পক্ষ অবলম্বন করেননি।

বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়।'[১৯] এ বক্তব্য সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টা চালায়; বিশেষ করে ভারতের স্বীকৃতি ও যুদ্ধে সার্বিক সহযোগিতা লাভ করা সরকারের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান ও চীনসহ এশিয়া ও ইউরোপীয় দেশসমূহের সহানুভূতি লাভ করা সরকারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ সংস্থা, ওআইসি ও আরব লীগের সদস্যদের সহযোগিতা লাভ করাও ছিল সরকারের উদ্দেশ্য। এজন্য সরকার দিল্লী, কলকাতা, লন্ডন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোমে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা করে। লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনের দায়িত্ব প্রদান করা হয় বিচারপতি আবুসাইদ চৌধুরীর উপর। তিনি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২০] তদুপরি বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত পাকিস্তান দূতাবাসের অনেক বাঙালি কূটনীতিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেন, যারা পরবর্তীতে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পেশাদার কূটনীতিক ছাড়াও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক ও আইনবিদ ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের সমন্বয়ে মুজিবনগর সরকার কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল গঠন পূর্বক বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে এসব ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করেন এবং যথাযথ যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি দলগুলোর মধ্যে দিল্লী,[২১] বৈরুত,[২২] নেপাল,[২৩] শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, জাপান,[২৪] যুক্তরাষ্ট্র,[২৫] প্রেরিত মিশনগুলো এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া হাঙ্গেরীর বুদাপেস্তে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলন, পূর্ব জার্মানী, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভোকিয়া, বুলগেরিয়া ও রাশিয়ায় কূটনৈতিক কার্যক্রমও উল্লেখ করার মতো।[২৬] বিভিন্ন দেশ ও সংস্থায় প্রেরিত প্রতিনিধিদলসমূহের কূটনৈতিক সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি বিশ্ব সমাজের আগ্রহ তৈরি হয়। এজন্য অনেক দেশ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করতে না পারলেও নৈতিকভাবে সমর্থন জানায়।

---

[১৯] এইচ.টি. ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ১৬০।

[২০] আবু সাইদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি* (ঢাকা: ইউপিএল, ২০০০), পৃ. ১৬০।

[২১] দিল্লী মিশনে প্রেরিত হয়েছিলেন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ফণীভূষণ মজুমদার ও নূরজাহান মুর্শিদ।

[২২] বৈরুত মিশনে প্রেরিত হন মোল্লা জালাল উদ্দীন এম.এন.এ. ও ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী।

[২৩] নেপালে গিয়েছিলেন আব্দুল মালেক উকিল, শ্রী সুবোধমিত্র ও আব্দুল মোমিন তালুকদার।

[২৪] শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও জাপানের প্রতিনিধিদলে ছিলেন এডভোকেট ফকির শাহাবুদ্দিন, মোহাম্মদ শামসুল হক ও জ্যোতিপাল মহাথেরো।

[২৫] যুক্তরাষ্ট্রে পর্যায়ক্রমে প্রেরিত হয়েছিলেন রেহমান সোবহান, আবুসাইদ চৌধুরী ও এম.আর. সিদ্দিকী। এছাড়া পরবর্তীতে জাতিসংঘ মিশনেও অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে আবু সাইদ চৌধুরী ও এম.আর. সিদ্দিকী ছিলেন। জাতিসংঘ মিশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আবুসাইদ চৌধুরী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম গিয়েছিলেন ২৪শে মে এবং ২৯শে মে পর্যন্ত এখানে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে কাজ করেছিলেন। আবুসাইদ চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯ ও ৪৬। এম.আর. সিদ্দিকী স্পেশাল এম্বাসেডর হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র যান ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে। এম.আর. সিদ্দিকীর সাক্ষাতকার, *দলিলপত্র, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬। রেহমান সোবহান এপ্রিলের শেষদিকে লন্ডন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছান এবং মধ্য মে পর্যন্ত অবস্থান করেন। পরে তিনি Envoie Extraordinaire In Charge of Economic Affairs-এর দায়িত্ব পান। দাতা সংস্থাগুলো থেকে পাকিস্তান যেন আর কোনরকমের সাহায্য না পায় সে ব্যাপারে তিনিই প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রেহমান সোবহানের সাক্ষাৎকার, *দলিলপত্র, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০১-৪০৫ ও ৪০৯।

[২৬] উল্লেখ যে, বুদাপেস্তের শান্তি সম্মেলনে প্রেরিত কূটনৈতিক প্রতিনিধিদলই পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ ও রাশিয়া সফর করে। এ প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন আব্দুস সামাদ আজাদ, ডা. সারোয়ার আলী ও দেওয়ান মাহবুব আলী। আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ. ৭৬; শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর* (ঢাকা: বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫), পৃ. ৩১২।

মধ্যপ্রাচ্যের সীমানা

মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের সাহায্য সহযোগিতা প্রাপ্তির বিষয়টি গুরুত্ব পায়। সরকারের মধ্যপ্রাচ্য নীতি কি ছিল বা মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি কি দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত তা আলোচনা করার পূর্বে মধ্যপ্রাচ্য বলতে আমরা কোনো কোনো দেশকে বুঝি সে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। সাধারণত মধ্যপ্রাচ্য বলতে আরব দেশগুলোকে বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এ অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ ধরনের সরল সংজ্ঞা প্রদান করা দুরূহ। কারণ মধ্যপ্রাচ্য নামক অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট কোনো সীমানা নেই। মধ্যপ্রাচ্য, নিকটপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য এ শব্দগুলো ইতিহাসে বেশ পুরনো। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সামরিক অঞ্চল বিভাজনে এবং বৃহৎশক্তিবর্গেই কূটনৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য ও নিকটপ্রাচ্য শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। পঞ্চদশ শতকে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক ভারতে নুতন পথ আবিষ্কারের পর থেকে নিকটপ্রাচ্য কথাটি ব্যবহৃত হয়।[২৭] ইউরোপ থেকে প্রাচ্যের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির সুবিধার্থে সবচেয়ে বেশি পূর্বের দেশগুলোকে দূরপ্রাচ্য নামে অভিহিত করা হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় ইউরোপীয় দেশসমূহ ও দূরপ্রাচ্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোকেই নিকট প্রাচ্য বলা হত। এই নিকট প্রাচ্য অভিধাটি দ্বারা বুঝানো হত ঐ সমস্ত এলাকাকে যা, ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের পরে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়।[২৮] ফরাসীরা আবার এ অঞ্চলকে Levant অভিধায়ও অভিষিক্ত করেছে।[২৯]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ব্রিটেনসহ মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনীর অবস্থান, যাতায়াত ও রসদ সরবরাহের সুবিধার বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে ব্রিটেনের পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। ব্রিটেনের কাছাকাছি বল্কান অঞ্চলকে নিকটপ্রাচ্য ও ভারতের পশ্চিম দিকের এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোকে ব্রিটিশরা আনুষ্ঠানিকভাবে (officially) মধ্যপ্রাচ্য নামে অভিহিত করে।[৩০] ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলোকে তখন দূরপ্রাচ্য নামে অভিহিত করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রপক্ষের সামরিক কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব বর্তায় ব্রিটিশ সামরিক কমান্ডের উপর। এরপর থেকে মধ্যপ্রাচ্য কথাটির বহুল ব্যবহার হতে থাকে। বাংলাদেশের কোনো কোনো ইতিহাসবিদ অবশ্য বাংলাদেশের মতো প্রাচ্যের কোনো দেশ থেকে এ অঞ্চলকে মধ্যপ্রাচ্য নামে আখ্যায়িত করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। এ এলাকা যেহেতু বাংলাদেশের পশ্চিমে এজন্য তাকে মধ্যপ্রাচ্য না বলে বরং মধ্যপ্রতীচ্য বলা যুক্তিপূর্ণ বলে এসব ঐতিহাসিক মনে করেন।[৩১] ভারতীয়রা এ অঞ্চলকে পশ্চিম এশিয়া বলে অভিহিত করে। এটিও যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ মিশর ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোকে পশ্চিম এশিয়া নামে অভিহিত করা যায় না।[৩২] কারণ এ দেশগুলো আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। তাহলে আমরা পশ্চিমে মরক্কো থেকে পূর্বে ইরান পর্যন্ত স্বাধীন আরব রাষ্ট্রসমূহ এবং ইরান, তুরস্ক ও ইসরায়েলকে মধ্যপ্রাচ্য নামে অভিহিত করব।[৩৩] যদিও আফগানিস্তান ভারত উপমহাদেশের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত, তথাপি আমরা এ দেশটিকে মধ্যপ্রাচ্যের আওয়ায় ধরে নিয়ে আলোচনা করব। কারণ মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক কার্যক্রমে আফগানিস্তান মধ্যপ্রাচ্যের আওতায় পড়ে। এছাড়াও বর্তমানে বিশ্ব-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে; বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানকে তাদের মধ্যপ্রাচ্যনীতির আওতায় রেখেই বিভিন্ন কর্মকাণ্ড

---

[২৭] Don Peretz, *The Middle East Today* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1978), p. 3.

[২৮] ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে উসমানিয়রা কনস্টান্টিনোপল দখল করে। তখন তুরস্কের সুলতান ছিলেন দ্বিতীয় মুহম্মদ।

[২৯] Don Peretz, *op. cit.*, p. 3.

[৩০] Ibid, pp. 3-4.

[৩১] সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ১।

[৩২] *তদেব*, পৃ. ২।

[৩৩] *তদেব*।

পরিচালনা করছে বলে মনে হয়। আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া ও ইরান প্রভৃতি দেশকে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত করে এক ধরনের ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে প্রয়াসী। এজন্যও আফগানিস্তানকে মধ্যপ্রাচ্যের আওতায় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

সমকালীন বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্য এবং মুজিবনগর সরকারের তৎপরতা

মুক্তিযুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের সমর্থন আদায়ে বাংলাদেশ সরকারের কর্মকাণ্ড আলোচনার পূর্বে তৎকালীন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর অবস্থানের দিকে আলোকপাত করা প্রয়োজন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে বা তার পূর্বে বা পরেও যে কোনো আন্তর্জাতিক ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট করে। আন্তর্দেশীয় বা দ্বি-পাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বা যে কোনো দেশের গৃহযুদ্ধের বিষয়েও এ দুটি পরাশক্তি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী অবস্থান নেয়, যা স্নায়ুযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল। এ প্রসঙ্গে দুই কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও কম্বোডিয়া সমস্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের প্রতিটি আন্তর্জাতিক ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে এবং তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য তারা বিভিন্ন সামরিক ও আঞ্চলিক জোট তৈরি করে।[৩৪] অনেকগুলো রাষ্ট্র আবার কোনো জোটে যোগ না দিয়ে জোটনিরপেক্ষ সংস্থা গঠন করে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মার্কিন বা সোভিয়েত ব্লকভুক্ত হয়ে পড়ে এবং দু-একটি রাষ্ট্র জোট নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন, বিপক্ষে অবস্থান বা নিরপেক্ষতার বিষয়টি উপর্যুক্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বাঙালিদের উপর পাকবাহিনীর গণহত্যার খবর প্রচারিত হবার অল্পকালের মধ্যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক এর নিন্দা জানাবার কারণে পাকিস্তান এর সুবিধা নিতে প্রয়াসী হয়।[৩৫] ভারতের নিন্দা জ্ঞাপনের মধ্যে তার চিরাচরিত পাকিস্তান বিরোধিতার বিষয়টি হয়ত ছিল; কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিবাদ ছিল একান্তই মানবিক। কারণ তখনও পর্যন্ত তারা ভারতের সাথে কোনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি বা বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামকেও সমর্থন করেনি। কিন্তু তাদের এ বিবৃতি মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব ফেলে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আরবদেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল এবং বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত প্রয়াস নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা হলো। পরে অনারব দেশগুলো সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপিত হবে।

১৯৫৮ সালের ইরাকি বিপ্লবের পর ইরাকি নেতৃত্ব (করিম কাশিম ১৯৫৮-১৯৬১ খ্রি:) কম্যুনিস্ট-ঘেঁষা নীতি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে আব্দুস সালাম আরিফ ক্ষমতায় এসে আরব জাতীয়তাবাদী নীতি গ্রহণ করলেও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাদের সখ্য গড়ে ওঠে। এছাড়া কুর্দি সমস্যার জন্যও ইরাককে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিরপেক্ষতা প্রদর্শন জরুরি হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ইরাক সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন না করলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেও তারা সমর্থন করেনি। তবে ১৯৭১ সালের মে মাসে ওআইসি-র সম্মেলনে 'জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায়' পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানানোর যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাতে ইরাকের সম্মতি ছিল। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের পক্ষেই ইরাকের অবস্থান গণ্য করা যেতে পারে। অন্যদিকে ইরাকে নিযুক্ত পাকিস্তানের বাঙালি রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ্ ২১শে আগস্ট ইরাক ত্যাগ করে লন্ডনে চলে যান এবং বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। ইরাক থেকে লন্ডন যাবার প্রাক্কালে

---

[৩৪] এ প্রসঙ্গে NATO ও Warshaw Pact এবং ASEAN জোটের কথা উল্লেখ করা যায়।

[৩৫] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা', সালাহউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯৯।

তিনি প্রায় ২৫০০০ পাউন্ড ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে তা মুজিবনগর সরকারের কাছে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করেন।[৩৬] যেহেতু প্রায় সমগ্র আরব বিশ্ব মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করে, সেখানে ইরাকে থেকে একজন বাঙালি কূটনীতিকের পাকিস্তানের বিপক্ষে এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করা সহজসাধ্য ছিল না। ইরাক সরকার এ বিষয়ে শক্ত অবস্থান নিলে হয়ত আবুল ফতেহ্‌র পক্ষে এ জাতীয় কাজ করা সম্ভব হত না। মুক্তিযুদ্ধের পরেও ইরাক আরব বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয়। এতে এটা মনে করা যেতে পারে যে, সার্বিক অবস্থায় ইরাক ওআইসি-তে পাকিস্তানের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ না করতে পারলেও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল; যার প্রকাশ ঘটে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দানের মধ্য দিয়ে।

সৌদি আরবের পররাষ্ট্রনীতি সবসময়ই মার্কিন-ঘেঁষা। তাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখা। এজন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন যেহেতু অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ সরাসরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতে থাকে, এজন্য সৌদি আরবও সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। তদুপরি সৌদি আরব বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের উস্কানি হিসেবে এবং পাকিস্তানের মতো একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করার অপপ্রয়াস হিসেবে বিবেচনা করে। এজন্য বিচারপতি আবুসাইদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমনকালে সৌদি আরবসহ আরও কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করেন। তিনি সৌদি রাষ্ট্রদূত বারোদীর সাথে সাক্ষাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, '... তাকে রোকেয়া হলে পাকবাহিনীর নারী নির্যাতনের প্রকাশিত খবরটি দেখাই। খবর পড়ার সময় তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন, জাস্টিস চৌধুরী আমাকে আর দেখাবেন না আমি আর সহ্য করতে পারছিনা।'[৩৭] এ সাক্ষাতের সময় বারোদী প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি বাদশাহকে বাংলাদেশের এসব পরিস্থিতি অবহিত করবেন এবং নিপীড়নের কাহিনী জানাবেন। কিন্তু এরপরেও বাংলাদেশের প্রতি সৌদি আরবের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয়নি; বরং মার্কিন কংগ্রেস পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ নিষিদ্ধ করলে সৌদি আরব পাকিস্তানকে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসে। নিক্সন প্রশাসনের মদদে সৌদি আরব পাকিস্তানকে ৭৫টি জঙ্গি বিমান সরবরাহ করে।[৩৮] এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অনেক পরে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হবার পর ঐদিনই সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

বিচারপতি আবুসাইদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নিউইয়র্কে অবস্থানকালে মিসর, আলজিরিয়া, লিবিয়া, জর্ডান, ইরাক, ইরান ও সিরিয়ার রাষ্ট্রদূতদের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে পাকবাহিনীর গণহত্যার চিত্র তুলে ধরেন। মিশর নাসেরের সময় থেকে জোট নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তিনি কিছুটা রাশিয়াপন্থী হয়ে পড়েন। পরে আনোয়ার সাদাৎও অনেকদিন পর্যন্ত একই নীতি অবলম্বন করেন। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই মিশরের ভূমিকা বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে থাকাই বাঞ্ছনীয় ছিল। তবুও তারা অনেকটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। প্যারিসে আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সভায় লন্ডন থেকে একটি ছাত্র প্রতিনিধিদল গমন করে। তারা এখানে আগত মিশরের প্রতিনিধিকে বাংলাদেশের অবস্থা বুঝিয়ে বলেন।[৩৯] এজন্য যুদ্ধকালীন সময়ে তারা সমস্যার সার্বিক সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করে বিবৃতি দেয়।[৪০] এ বিবৃতিটি বাংলাদেশের পক্ষেই যায়। তবুও স্বাধীনতা পরবর্তীতে মিশর এমন

---

[৩৬] আবুসাঈদ চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯২।
[৩৭] *তদেব*, পৃ. ৪১।
[৩৮] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০২।
[৩৯] আবুসাঈদ চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪০।
[৪০] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০২।

একটা ব্যাখ্যা দেয় যে, বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনাবলী তাদের অজ্ঞাত ছিল।[৪১] পাকিস্তানের অপপ্রচারের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশই এজন্য পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে। কিন্তু মিশর সরাসরি তা না করে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে, যা বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বনের শামিল। আলজিরিয়াও বাংলাদেশের বিপক্ষে সরাসরি অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু তারা সরাসরি বিরোধিতায়ও অবতীর্ণ হয়নি। কারণ সংগ্রামের মাধ্যমেই ১৯৬২ সালে আলজিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধে লিবিয়ার ভূমিকাও কোনো পক্ষে সক্রিয় ছিল না। তবে তিউনিসিয়া জাতিসংঘে বাংলাদেশ বিষয়ক দুটি প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করে।[৪২] যুক্তরাষ্ট্রের এ দুটি প্রস্তাব বাংলাদেশ বিরোধী ছিল; বিধায় তিউনিসিয়া বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে একথা বলা যায়। বাংলাদেশ সরকারও তিউনিসিয়ার সমর্থনের ব্যাপারে সক্রিয় কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। পূর্বোল্লিখিত প্যারিস শান্তি সম্মেলনে প্রেরিত বাংলাদেশের ছাত্র প্রতিনিধিদল জর্ডানের প্রতিনিধি আল হোসাইনীর সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে পাকবাহিনীর বর্বরতার চিত্র উপস্থাপন করেন। জর্ডানের প্রতিনিধি তাদের বাদশাহকে এসব বিষয়ে অবহিত করবেন বলে জানান।[৪৩] এজন্যই হয়তবা জর্ডানও বাংলাদেশের পক্ষে বা সরাসরি বিপক্ষে কোনো ভূমিকা পালন করেনি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইসরাইলের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ২রা জুলাই ইসরায়েলি সংসদ বাঙালির উপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বর্বরতার নিন্দা জানায় এবং ইসরায়েলি রেডক্রসের মাধ্যমে শরণার্থীদের জন্য বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করে।[৪৪] কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলো বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও সরকার উপর্যুক্ত ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করে। কারণ মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বাধীন বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হবে তা সরকার যথাযথভাবে উপলব্ধি করে। এ ব্যাপারে সরকার অক্টোবর মাসে একটি ব্যাখ্যা প্রদান করে।[৪৫] এতে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের যৌক্তিকতা তুলে ধরার প্রয়াসে বাংলাদেশ সরকার আফগানিস্তানে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭১ সালের ২৯শে জুন পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলমের মাধ্যমে প্রতিনিধিদলের নেতা আব্দুস সামাদ আজাদকে চিঠি দেওয়া হয়।[৪৬] প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন আশরাফ আলী চৌধুরী, মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী ও এডভোকেট মুহম্মদ নূরুল কাদির। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন শেষে এ প্রতিনিধিদল ২৭ই আগস্ট কাবুলে পৌঁছে। কাবুলের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে.এল. মেহতা ও কূটনীতিক সালমান হায়দার ও এইচ.কে. লালের সহযোগিতায় বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে। তারা বাংলাদেশের সার্বিক চিত্র ও যুদ্ধের পটভূমি আফগানদের সামনে তুলে ধরে। এ সময়ে পাকবাহিনীর নির্যাতন, বিভিন্ন দেশী-বিদেশী খবরের কাগজের রিপোর্টিং ও বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্র উপস্থাপন করা হয়। এ প্রসঙ্গে 'ডায়েরী অন বাংলাদেশ' ও 'রিফিউজি ৭১' নামক প্রামাণ্য চিত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে।[৪৭]

---

[৪১] *তদেব*।

[৪২] আশফাক হোসেন, 'মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘ' শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত) *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১৯৯৮), পৃ. ৮০-৮৪।

[৪৩] আবুসাঈদ চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪০।

[৪৪] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০২।

[৪৫] এইচ.টি. ইমাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১।

[৪৬] মুহম্মদ নূরুল কাদির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩০।

[৪৭] *তদেব*, পৃ. ১৩৯।

'দি কাবুল টাইম্‌স'সহ আফগানিস্তানের নেতৃস্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকের সাথে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মুসা শফিক ও পাখতুন নেতা আব্দুল গাফফার খানের কাছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরে মুক্তিযুদ্ধে আফগানিস্তানের সহায়তা কামনা করে।[৪৮] বাংলাদেশ দলের এ সফরে আফগানিস্তান হয়ত মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন করেনি; কিন্তু বিপক্ষেও তারা কোনো ভূমিকা পালন করেনি। তবে কাবুলের পাকিস্তান দূতাবাস এ সময়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যে সব অপপ্রচার চালায়, বিশেষ করে দূতাবাস প্রকাশিত নিয়মিত বুলেটিনসমূহে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণার একটি সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। এসব তথ্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের কাছে প্রেরিত হয় এবং সরকার এসব অপপ্রচারের জবাব দিতে তৎপর হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইরানের ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের পক্ষে। ইরান পাকিস্তানকে প্রচুর সংখ্যক জঙ্গি বিমান, ট্যাংক, হেলিকপ্টার ও সামরিক কাজে ব্যবহৃত লরি ও মোটর গাড়ি সরবরাহ করে। এমনকি পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্যও ইরান ইচ্ছা প্রকাশ করে।[৪৯] এজন্যই হয়ত বাংলাদেশ সরকার ইরানে কোনো কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল পাঠানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। তবুও আফগান প্রতিনিধিদলের সদস্য মুহম্মদ নূরুল কাদির ৫ই সেপ্টেম্বর কাবুল থেকে ইরান গমন করেন এবং তেহরানের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এম.এল. রহমানের সহযোগিতায় ইরানের শাহানশাহ ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে দুটো চিঠি পৌঁছে দেন। এ চিঠিতে মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা তুলে ধরে ইরান সরকারের সহযোগিতা কামনা করা হয়। নূরুল কাদিরের ভাষায়, 'এ সফরের কারণেই ইরান সরকার পাকিস্তানপন্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরদেশীর জাহেদীকে সরিয়ে দিয়ে উদারপন্থী আব্বাস আলী খালাত বারীকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করে'।[৫০] পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিবর্তনে ইরানের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। যুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত ইরানের সাথে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক ছিল। ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি রেজাশাহ্‌র পাকিস্তান সফর তাই প্রমাণ করে। রেজাশাহের এ সফরকে দেখিয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো শেখ মুজিবের মুক্তির বিষয়টি আরো বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছিলেন।[৫১] রেজাশাহ্‌র আগমন উপলক্ষে ভুট্টো মুজিবকে আরও কয়েকদিন পাকিস্তানে অবস্থান করার অনুরোধ করেন।[৫২] কিন্তু শেখ মুজিবের অনীহার কারণে ৮ই জানুয়ারিই তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তদুপরি, ১৯৭৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারির পূর্বে ইরান বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়নি। উল্লেখ্য যে, লাহোরে ওআইসি সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ও ইরান একই দিনে (২২শে ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এতে স্পষ্টতই ধারণা করা যায় যে, যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ইরানের পাকিস্তানপন্থী পররাষ্ট্রনীতি অটুট ছিল।

আফগানিস্তানে কূটনৈতিক মিশন প্রেরণের সময়ে বাংলাদেশ সরকার লেবানন-সিরিয়াতেও একটি প্রতিনিধিদল পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন মোল্লা জালাল উদ্দিন এম.এন.এ. ও ড. মাহমুদ শাহ্ কোরেশী।[৫৩] মোল্লা জালাল উদ্দিনকে 'স্পেশাল এম্বাসেডর' ও ড. কোরেশীকে 'স্পেশাল এনভয়' হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অন্যান্য আরব দেশের মত লেবানন-

---

[৪৮] শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর* (ঢাকা: বিজয় প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৩১৪।

[৪৯] সৈয়দ আনোয়ার হোসনে, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০২।

[৫০] মুহম্মদ নূরুল কাদির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৬।

[৫১] ফারুক চৌধুরী, *দেশ-দেশান্তর* (ঢাকা: মীরা প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ১১০।

[৫২] শেখ মুজিব ও ভুট্টোর কথোপকথনের বিস্তারিত দেখুন, *Zulfi Bhutto of Pakistan: His life and times* (New York: Oxford University Press, 1993), pp. 173-176.

[৫৩] এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন, মোঃ ফায়েকউজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ), (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪)।

সিরিয়াতেও পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালায়। তারা মুক্তিযুদ্ধকে ভারতীয় উস্কানীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে প্রচার করে। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এসব অপপ্রচারকে মোকাবেলা করে পাকবাহিনীর গণহত্যা ও ২৩শে বছরের শোষণ-নির্যাতনের চিত্র লেবানন-সিরিয়ার জনগণের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস পায়।[৫৪] লেবাননে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এ.কে. দার এ ব্যাপারে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য তারা প্রথমে সংবাদপত্রকে গুরুত্ব দেন। এজন্য লেবাননের সর্বাধিক প্রচারিত দুটি খবরের কাগজ 'আল হিউম' ও 'আলনাহারের' সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করে তারা বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে এবং এসব বক্তব্য কাগজে প্রকাশিত হয়। লেবাননের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বাংলাদেশের বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়াস পায় এ প্রতিনিধিদলটি। তাঁরা বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা কেমাল জুমবালাত, মারুফ ছাদ ও রশিদ কারামী ও তাকিয়া দিন সল প্রমূখের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসব সাক্ষাতে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। কেমাল জুমবালাত তার সোস্যালিস্ট পার্টির অফিসকে বাংলাদেশ মিশনের অফিস হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দেন। লেবানিজ পার্লামেন্টের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান ড. আমিন আল হাফেজের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল স্বদেশের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। নাবিল বারাদে নামক একজন দক্ষ সাংবাদিক বাংলাদেশ মিশনের পক্ষে কাজ করেন। তার সহযোগিতায় ড. কোরেশীর লেখা The Suffering Humanity in Bangladesh শীর্ষক একটি রচনা আরবি ভাষায় অনূদিত হয়ে পুস্তিকাকারে বিভিন্ন আরব দেশে প্রচারিত হয়। লেবাননের খ্রিস্টান সাংবাদিক খায়রুল্লাহ খায়রুল্লাহ ও বিশিষ্ট মহিলা চিকিৎসক হিতাব আবদেল ছামাদ বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৫৫] এভাবে লেবাননের মানুষের কাছে বাংলাদেশের বক্তব্য পৌঁছে যেতে থাকে। এ জন্যই হয়ত লেবানন বাংলাদেশের বিপক্ষে কোনো কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়নি বলে ড. কোরেশী দাবি করেন।

লেবাননের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদলটি এখান থেকে সিরিয়া গমনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ ব্যাপারে তাদেরকে দামেস্কে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং ভারতে নিযুক্ত লেবাননের সাবেক রাষ্ট্রদূত ওমর আবুরিশে সার্বিক সহযোগিতা দেন। তারা দামেস্কে পৌঁছে ড. ওমরের নিকটাত্মীয় ও দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. কোরেশীর সহপাঠী ড. মিশেল আরবাশের সহযোগিতায় আইনজীবী সমিতির প্রধানের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সাক্ষাতে এসব বিশিষ্ট লেবানিজ বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হন এবং সিরিয়ার সরকার যাতে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয় সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সিরিয়া সফরকালে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আলেপ্পো শহরে গিয়ে লেবাননে নিযুক্ত ফরাসি কন্সাল লুই সেকুতুবিচ এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি এ সাক্ষাতের কথা ফরাসী সরকারকে জানাবেন বলে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ মিশনের প্রচার কার্যের বিষয়েও তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ প্রদান করেন। এসব সাক্ষাৎ বা মতবিনিময়ে বাঙালিদের সংগ্রামের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। সিরিয়ায় বাংলাদেশ মিশনের এসব তৎপরতা সত্ত্বেও জাতিসংঘে বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রস্তাবে সিরিয়া যুক্তরাষ্ট্র-ঘেঁষা নীতি অটুট রাখে।[৫৬]

---

[৫৪] ড. মাহমুদ শাহ কোরেশীর একান্ত সাক্ষাৎকার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৩।

[৫৫] *তদেব*।

[৫৬] আশফাক হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮০-৮৪।

উপসংহার

মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম ক্ষেত্র ছিল মধ্যপ্রাচ্য। এর বাইরে বর্হিবিশ্বের বহু জায়গায় সরকারি-বেসরকারিভাবে সুযোগমতো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। উপর্যুক্ত আলোচনায় আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, মধ্যপ্রাচ্যে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার খুব একটা সফলতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু পাকিস্তানের মতো একটি প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা এত সহজ ছিল না। ভারত যেহেতু মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে, এজন্য বাংলাদেশের পক্ষে মুসলিম দেশের সমর্থন আদায় আরও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের প্রচারণাকেই মুসলিম বিশ্ব, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের পক্ষে সৌদি আরবের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশ মিশনের কাছে বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন অনেক বিশিষ্ট আরব এমন ধারণা দেন যে, সৌদি আরবই মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের প্রধান অন্তরায়। তবুও রাষ্ট্রীয় পর্যায় স্বীকৃতি বা সহায়তা প্রদানে বিরত থাকলেও আরব বিশ্বের বহু রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসক, বুদ্ধিজীবী এমনকি সাধারণ মানুষ অনেকাংশে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রয়াস অব্যাহত না থাকলে নিরপেক্ষ মুসলিম দেশসমূহ যেমন, ইরাক, মিশর, লেবানন, জর্ডান বা তুরস্ক বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থান নিতে পারত। কিন্তু তা থেকে তারা বিরত ছিল। মধ্যপ্রাচ্যে কূটনৈতিক প্রয়াসের ক্ষেত্রে এটাই মুজিবনগর সরকারের বড় অর্জন বলে মনে করা যেতে পারে। তদুপরি মধ্যপ্রাচ্যকে মুজিবনগর সরকার পূর্বাহ্নে সর্বাধিক গুরুত্বও প্রদান করেনি। বরং বৃহৎশক্তিবর্গ বা এর জনগণকে বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য সর্বাধিক। এজন্যই পাকিস্তান কূটনৈতিকভাবে সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক এ.এ.কে. নিয়াজীর মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি বলেন, "Pakistan had been completely isolated diplomatically, politically, militarily and psychologically due to the faulty foreign policy of Yahiya's Government and the lack of counter propaganda."[57]

---

[৫৭] A.A.K. Niazi, *The Betrayal of East Pakistan* (Dhaka: University Press Limited, 2000), p. 118.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২

শহীদ সাবেরের 'আরেক দুনিয়া থেকে' : ১৯৫০-এর দশকের জেলজীবন

শফিকুর রহমান*

Abstruct: During his student's life, Shahid Saber (1930-1971), a man of literature, was involved in the students' politics. Later on he became a member of the Communist Party. After the partition of the country in 1947, the then government arrested a huge number of progressive political workers. Shahid Saber was one of them. Being captivated in different jails of the country for long 4 years from 1950 to 1954, he gathered a lot of experienced which reflect in his literary works like *Arek Duniya Theke*. It is observed that he stated the prisoners' entrance into different wards of the jail and also explained their psychological analysis in his writings. Shahid Saber's *Arek Duniya Theke* is not only a document of Jail life in the 50s, but also an inquisitive and creative production.

১. ভূমিকা

শহীদ সাবের (১৯৩০-১৯৭১) কবি গল্পকার এবং সাংবাদিক হিসেবে অধিক পরিচিত। ১৯৫৮ সালের শেষ দিকে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় ছিলেন। ১৯৭১ সালে পাক হানাদাররা 'সংবাদ' অফিস জ্বালিয়ে দিলে ভেতরে ঘুমন্ত অবস্থায় শহীদ সাবের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তিন। এগুলোর নাম: 'এক টুকরো মেঘ' (গল্পগ্রন্থ, ১৯৫৫), 'ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান' (ছোটদের গল্প সংকলন, ১৯৫৮) এবং 'আরেক দুনিয়া থেকে (রোজ নামচা, ১৯৫০)। তাঁর লেখা অনেকগুলো কবিতা সমকালীন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এছাড়া তিনি 'পুশকিনের ইসকাপনের বিবি', 'গোগলের পাগলের ডায়রী', এবং 'ক্যাথারিণ ওয়েন্‌স পিয়ারের কালো মেয়ের স্বপ্ন' নামে তিনটি অনুবাদ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। সেলিনা হোসেন সম্পাদিত 'শহীদ সাবের রচনাবলী'তে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত এসব রচনা সংকলিত হয়। ১৩৫৭ সালে কলকাতার 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় শহীদ সাবেরের রোজনামচা 'আরেক দুনিয়া থেকে' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটিতে প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৫০ সালের চট্টগ্রাম জেলখানার একটি সামগ্রিক চিত্র। তৎকালীন সময়ে সমগ্র বাংলাদেশের অন্যান্য জেলখানার দিকে দৃষ্টি দিলে রোজনামচায় উল্লিখিত জেলজীবনের সাথে ওকটা সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। সেই হিসেবে 'আরেক দুনিয়া থেকে' নামক রোজনামচাটি সমগ্র বাংলাদেশের জেলজীবনকেই মূলত প্রতিনিধিত্ব করেছে। সেখানে বন্দীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, বন্দীদের কর্মকাণ্ড

* পিএইচ.ডি. গবেষক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এবং বন্দীদের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বন্দী দশাতেই শহীদ সাবের রোজনামচাটি লিখে শেষ করেন। একজন তরুণ মার্কসবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে জেলখানার যে বিষয়গুলোর প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং জেল জীবনকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সমকালীন অন্য কোনো রাজবন্দীর স্মৃতিকথায় তা ততোটা প্রতিফলিত হয়নি।

২. শহীদ সাবেরের বন্দী জীবন ও রোজনামচা লেখার পটভূমি

শহীদ সাবের অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। এক সময়ে তিনি 'ছাত্র ফেডারেশন' নামক অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংগঠনে যোগ দেন। সেই সময়ে মুসলীম লীগ সরকার দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব শুরু করে এবং অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার নেতাকর্মীসহ কমুনিস্ট পার্টির কর্মীদের পীড়ন ও গণহারে গ্রেপ্তার শুরু করে। এ অবস্থায় তাদের নজর পড়ে শহীদ সাবেরের উপর। ফলে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার ছাত্র ফেডারেশন কর্মী শহীদ সাবের বন্দী হন ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেই সময়ে শহীদ সাবের চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র ছিলেন। বন্দী করার পর প্রথমে তাঁকে চট্টগ্রাম জেলে রাখা হয়, পরে সেখান থেকে বদলি করে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। এর পরে রাজশাহী থেকে বদলি করে তাঁকে ঢাকা জেলে রাখা হয়। চট্টগ্রাম জেলে বসেই তিনি রোজনামচাটি লিখে শেষ করেন।[১] ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সাল– এই চার বছর সম্পূর্ণ বিনা বিচারে জেল খেটেছেন শহীদ সাবের। শহীদ সাবেরের বন্দী জীবন চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে কাটলেও আমাদের আলোচ্য রোজনামচাটির বর্ণিত পরিবেশ পরিস্থিতি চট্টগ্রাম জেলখানাকে মূর্ত করেছে। কিন্তু ধারণা করা যায়, রোজনামচাটিতে বর্ণিত পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে দেশের অন্যান্য জেলখানার চিত্র অনেকখানিই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় দেশের বিভিন্ন জেলখানায় বসে লেখা লেখকদের রোজনামচা/ডায়েরি, জীবনকাহিনী, চিঠি–পত্র ইত্যাদিতে। তাঁদের এইসব লেখাতে দেশের প্রায় সব জেলখানার একই ধরনের চিত্রের পাশাপাশি ৫০–এর দশকের জেলখানার জীবনযাত্রার সাথে ৯০–এর দশকের জীবনযাত্রার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। অর্থাৎ শহীদ সাবের বর্ণিত রোজনামচায় চট্টগ্রাম জেলখানায় ৫০-এর দশকের যে চিত্র পাই–অন্যান্য লেখকের জেলখানার অভিজ্ঞতা, শহীদ সাবেরের রোজনামচাকেই কোনো না কোনাভাবে সমর্থন করে।[২]

শহীদ সাবের নিরাপত্তা বন্দী ছিল বলে স্বনামে কোনো কিছু প্রকাশ করার অধিকার তাঁর ছিল না। ফলে তাঁর 'আরেক দুনিয়া থেকে' শীর্ষক রোজনামচাটি তাঁকে জামিল হোসেন ছদ্মনামে প্রকাশ করতে হয়েছিল। এই রচনা তাঁকে সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি এনে দেয়। লেখাটি পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে অভিনন্দিত করেন।[৩] লেখাটি সম্পর্কে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন:

> 'আরেক দুনিয়া থেকে' রোজনামচা জাতীয় রচনা। এটি দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রসূন। জেল জীবনের নিখুঁত বর্ণনা সমৃদ্ধ লেখাটি যেমন সরস তেমনি

---

[১] সেলিনা হোসেন (সম্পা.), *শহীদ সাবের রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১), পৃ. ১২–১৩।

[২] ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত ফরিদ আহমেদের *কারাগারে সাতাইশ দিন*, ১০৭৭ সালে প্রকাশিত আবদুস শহীদের *কারাস্মৃতি* ১৯৫৯ এবং ১৯৬১ সালে শহীদুল্লা কায়সারের প্রথম স্ত্রী জোহরা আহমদকে এবং দ্বিতীয় স্ত্রী রাজিয়া খানকে লেখা চিঠিপত্র। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত শওকত আলীর *কারাগারের ডায়েরী*, ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত মাহমুদ হুদার *আমার জীবনস্মৃতি* ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত সাবেরের রোজনামচার অনুরূপ।

[৩] *শহীদ সাবের রচনাবলী*, পৃ. ৪৯।

প্রাঞ্জল। লেখকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে একঘেঁয়ে ক্লান্তিকর বর্ণনা রচনাকে ভারাক্রান্ত করেনি। মিঠেকড়ার অদ্ভুত আমেজ সকালের রৌদ্রদীপ্তির মত মনোরম।[৪]

এ বিষয়ে রণেশ দাশগুপ্তের মন্তব্য হলো:

> ... মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অন্তরঙ্গ আলোককণাগুলিকে আয়নাতে ধরার জন্য সূক্ষ্ম কাজের লেখার পরীক্ষাকে লালন করতেন তিনি তাঁর মনে। এর প্রমাণ জেলখানার জীবন সম্পর্কে তাঁর লেখা 'আরেক দুনিয়া থেকে'। রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে অত্যন্ত অল্প বয়সে কারাগারে আবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি কিছুকাল। এরই ফলশ্রুতি 'আরেক দুনিয়া থেকে'।[৫]

১৯৫০ সালে শহীদ সাবেরের সঙ্গে একই সময়ে রাজশাহী জেলে ছিলেন সরদার ফজলুল করিম। তিনি শহীদ সাবের এবং তাঁর রোজনামচা লেখার পটভূমি সম্পর্কে বলেন:

> একটা ঘরের হয়ত বিশ থেকে ত্রিশ জন বন্দী আমরা। সন্ধ্যা না হতেই ঘরটার তালা দিয়ে রাখে। সকালে তালা খুললেও আর একটা দেয়ালের চৌহদ্দীতে আমাদের আটকে দেয়। এরই মধ্যে আমরা পায়ে পায়ে ঘুরি। সকলে মিলে রান্না করি। চাপাতি বানাই। গোছলের ঘণ্টা দিই। লাইন দিয়ে খেতে বসি। খবরের কাগজ এলে গোল হয়ে বসি। একজনে জোরে জোরে পড়ি। অপর সবাই শোনে। সপ্তাহে একদিন সংবাদ পর্যালোচনা করি। সাংস্কৃতিক বাসরে বসি। রাজনীতিক তর্ক করি। সব কিছুতেই, সব খানেই শহীদ সাবের। সব আলোচনাতেই শহীদ সাবের জীবন্ত খইয়ের মতো ফুটছে। হয়ত এই সময়েই ও গোপনে জেল থেকে লিখে পাঠিয়েছিল 'আর এক দুনিয়া থেকে' রাজবন্দী কাহিনী।[৬]

শহীদ সাবেরের সাথে জেলে ছিলেন সাহিত্যিক সুকুমার চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন রেল শ্রমিক আন্দোলনের নেতা এবং অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত। শহীদ সাবেরের সাথে রাজশাহী জেলে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এ সম্পর্কে সরদার ফজলুল করিমের লেখা থেকে জানা যায়:

> সুকুমারদা শহীদ সাবেরের প্রাণের মূল আকুতিটি ধরতে পেরেছিলেন। রাজনীতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞকর্মী হিসাবে তিনি বুঝেছিলেন: আদর্শের রোমাঞ্চ নিয়ে এই তরুণ নিজের পরিবার পরিজন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু আদর্শ রূপায়ণের পথ তো মসৃণ নয়। সে পথে কত খানা খন্দ, কত বাঁক, কত চড়াই উৎরাই। সে দীর্ঘ কঠিন পথে যেন না এই তরুণের মনের সুন্দর স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, তার জন্য তিনি পিতার স্নেহে আর প্রশ্রয়ে শহীদ সাবেরের সব আব্দার, সব উপদ্রব হাসিমুখে সহ্য করতেন। শহীদ সাবের ছিল স্নেহের আকাঙ্ক্ষী। ...সুকুমার বাবু শহীদ সাবেরের মনের এই বেদনার দিকটি যেন অপর সবার চেয়ে বেশী টের পেয়েছিলেন। আর তাই যেন তিনি চেষ্টা করতেন সাবেরের মনের এই বেদনার কোণটি নিজের স্নেহ দিয়ে পুরণ করে রাখতে।[৭]

মাত্র ষোল সতের বছর বয়সে জেল জীবন বরণ করেছে বলে প্রায় সবাই তাঁকে স্নেহ করতেন। জেলখানার ভেতরেও তাঁর তারুণ্যের উচ্ছলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ফজলুল করিম বলেন :

> সে সকল রাজবন্দীর সবচেয়ে ছোট ভাই ছিল, আমাদের সেই বাক্যহীন মূর্তিতে রাজনীতিক চেতনার সঞ্চারে বিরামহীন বাণীর ধারা ছিল। ...ওর কথার বন্যা থেকে আমরা সকৌতুক আত্মরক্ষার কতো চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওর কোন পরোয়া ছিল না।

---

[৪] তদেব, পৃ. ৪৯।

[৫] রণেশ দাশগুপ্ত, "শহীদ সাবের একটি অসমাপ্ত শিল্পী জীবনের কথা," *শহীদ সাবের রচনাবলী*, পৃ. ৩৩, ৩৪।

[৬] সরদার ফজলুল করিম, "শহীদ সাবেরের স্মৃতি," *শহীদ সাবের রচনাবলী*, পৃ. ৩৬,৩৭।

[৭] তদেব, পৃ. ৩৭।

ঘুম থেকে টেনে তুলে কোন সমস্যার সমাধানে ওর নিজের অভিমত শুনিয়ে তবে রেহাই দিয়েছে।[৮]

তাঁর এই জেলখানায় যাপিত জীবন প্রায় পুরোটাই প্রকাশ পেয়েছে রোজনামচাটিতে। তিনি রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল থেকে আইএ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন, ফলে রোজনামচাটিতে তাঁর পরীক্ষার কোনো উল্লেখ নাই। তবে ১৯৫১ সালের ২০ নভেম্বর পিতা সালামত উল্লাহকে রাজশাহী জেল থেকে লেখা পত্র থেকে তাঁর পরীক্ষার দেওয়ার কথা উল্লেখ পাওয়া যায় :

পরীক্ষার পর থেকে আমার হাতে এখন কোন কাজ নেই। আর নিজেকে ব্যস্ত রাখার মতো কিছু যখন থাকে না তখন বন্দী জীবন খুবই দুঃসহ হয়ে ওঠে।[৯]

এ ছাড়া রাজশাহী জেল থেকেই তিনি প্রাইভেট কেন্ডিডেট হিসেবে বিএ পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, বিষয়টা একই পত্র থেকে জানা যায়। তিনি পিতাকে লেখেন :

আপনি আমার পড়াশোনার ব্যাপারে নিশ্চয়ই চিন্তা বোধ করছেন। কিন্তু ১৯৫৩ সালে নির্বাচন এগিয়ে আসলেও কিছুদিনের মধ্যে আমার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নেই। কিছু নিশ্চয়ই দেরী হবে। সুতরাং আমার মনে হয় ১৯৫৩ সালে বি.এ দেবার অনুমতিটা ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে নিয়ে রাখা ভাল হবে।[১০]

জেল থেকে বেরিয়ে ১৯৫৫ সালে তিনি জগন্নাথ কলেজের নৈশ বিভাগ থেকে বিএ পাশ করেছিলেন।

জেলে থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি না থাকলেও বিভিন্ন শিক্ষিত এবং বিজ্ঞ রাজিনীবিদদের সংস্পর্শে থাকার ফলে তাঁর মনন পরিণত হয়ে ওঠে। এই পরিণত মননই স্পষ্ট ছাপ রয়েছে রোজনামচাটিতে।

৩. রোজনামচা এবং জেলজীবন

বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীরা জেলখানার ভিতরে কিভাবে দিন যাপন করে সেই দৃশ্যেই উঠে এসেছে শহীদ সাবেরের রোজনামচায়। রচনাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় অর্থাৎ জেলে ঢোকা থেকে শুরু করে জেলের ভেতর দীর্ঘদিন অবস্থানের পর যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, তার একটা অবিকৃত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন সাবের। তিনি জেলখানার ভেতরটাকে বলেছেন, 'অন্য দুনিয়া'। এই অন্য দুনিয়া আমাদের পরিচিত, বাহ্যিক দুনিয়ার থেকে যে ভিন্ন, তা একাধিক লেখকের জেলজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়। যেমন শওকত আলী বলেন:

কারাজীবন কঠোর, কিন্তু বৈচিত্র্যময়। স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন আরেক জীবন, আরেক পৃথিবী। রীতি-নীতি নিয়ম পদ্ধতি ব্যক্তি সম্পর্ক, শাসন সবই ভিন্নতর। কারাবাস না করলে এ বিচিত্র জীবনের পূর্ণস্বাদ পাওয়া বা অনুমান করা সম্ভব নয়। সমাজ জীবনে বৃটিশ আমলের আইন-কানুনের সাথে যোগ হয়েছে আমাদের অদক্ষতা আর হীনমন্যতা। বৃটিশ আমলের সাহেবদের জায়গা নিয়েছে আমাদের দেশের কুশিক্ষিত নব্য সাহেবরা। তাই স্বাধীনতা আমাদের ঘুণে ধরাসমাজ ব্যবস্থার উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। ...এই কারণে কারাজীবন হচ্ছে আরো দূর্বিষহ, কারা প্রশাসন পদ্ধতি হয়েছে বিকৃত।[১১]

---

[৮] তদেব, পৃ. ৩৬, ৩৭।

[৯] *শহীদ সাবের রচনাবলী*, পৃ. ৪৩।

[১০] তদেব, পৃ. ৪৩।

[১১] শওকত আলী, *কারাগারে ডায়েরী* (ঢাকা: মাজেদা শওকত আলী, ১৯৮৪),পৃ. ৮।

শহীদ সাবের মনে করেন এই অন্য দুনিয়ার চিত্র ভেতরে ঢুকে পড়ার সাথে সাথে পাওয়া যাবে না; এর সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যাবে অনেক পরে। লেখক পরের এই রূপটাই পরবর্তীকালে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। তিনি দেখান, বিনাবিচারে দিনের পর দিন আটক থাকা অবস্থায় এক সময়ে হাঁপিয়ে উঠতে হয়, বন্দীদের কিছুই করার থাকে না, রোগ-শোকে ভেঙে আসে শরীর এবং মন, তারপরেও চালিয়ে যেতে হয় নিজের সাথে যুদ্ধ। এ ছাড়া ধারণ ক্ষমতার অধিক আসামি, খাদ্য ব্যবস্থার চূড়ান্ত অনিয়ম, কুখ্যাত দাগি আসামিদের সাথে যোগসাজশ করে জেল রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ব্যবসা, জেলের উচ্চ পর্যায়ের অফিসারদের নির্লিপ্ত থাকা ইত্যাদি বিষয় খুব নির্দ্বিধায় বলেছেন লেখক। তিনি মনে করেন, এই অনিয়ম অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতির ফলে এখানে কোনো অপরাধী শোধন হয় না বরং তারা তৈরি হয় আরো বড় অপরাধ সংগঠনের জন্য। তিনি দেখান অনেক অপরাধী জেলখানার ভেতরে বসেই অপরাধের নীল নকশা তৈরি করে এবং জেলের ভেতরে বসেই অপরাধ করার জন্য লোক সংগ্রহের চেষ্টা চালায়। শহীদ সাবেরের এই মতামতের সমর্থন পাওয়া যায় শহীদুল্লাহ কায়সারের লেখায়। তিনি বলেন :

> ডাকাতি আর চুরিটাকে কেউ জীবিকার পেশা হিসেবে গ্রহণ করে কখনো ভাগ্যের তাড়নায়, কখনো বা প্রবৃত্তি আর সঙ্গ দোষে। এদের অনেকে শেষ পর্যন্ত কারাগারে মাটি পায়।[১২]

এর পাশাপাশি শহীদ সাবের আমাদেরকে একটা ভিন্ন দৃশ্যের ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, অনেক অপরাধী বাইরের অনিশ্চিত খাদ্যহীন পৃথিবীর চেয়ে জেলখানার আধাসিদ্ধ কাঁকর মিশ্রিত খাদ্যকেই জীবন বাঁচানোর জন্য শ্রেয় মনে করে। ফলে জেলে ঢোকার জন্য তারা অপরাধ করে, কারণ জেলের ভেতর খাদ্যের নিশ্চয়তা আছে।

রচনাটির বড় অংশ জুড়ে বর্ণিত হয়েছে রাজবন্দীদের জীবনচক্র। এই রাজবন্দীদের মধ্যে ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তাধারী রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীর লোক। এঁদেরকে কোনো না কোনো অপরাধ দেখিয়ে গ্রেফতার করলেও তাঁদের বেশির ভাগকে আটক রাখা হয়েছিল বিনাবিচারে এবং এ সম্পর্কিত আইনটা ছিল তৎকালীন সরকারের পক্ষে। দেখা যায়, ব্রিটিশ আমলে রাজবন্দীদের জন্যে ১৯৪০ সালের যে Security Prisoners Rules ছিলো ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর East Bengal Special Powers Ordinance পাশ করার পর সেটাকে বাতিল করা হয়।[১৩] এরই ফলে রাজবন্দীদের কোনোরূপ মর্যাদা না দিয়ে জেলা প্রশাসক ইচ্ছে মতো তাঁদেরকে রেখে দিতেন। শহীদ সাবেরের রোজনামচাতেও দেখা যায় উক্ত বন্দীদের রাজবন্দী হিসেবে স্বীকার করতে চাননি তৎকালীন সরকার। পরে অনেক আন্দোলন অনশনের পর রাজবন্দী হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাঁদেরকে এবং এর পরেও 'রাজবন্দীদের কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে এবং তাঁদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করা হবে, সে সম্পর্কে কোনো আইন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না।[১৪] ফলে রাজবন্দীরা জেল নির্যাতনের শিকার হতেন। 'জেলের অভ্যন্তরে এই নির্যাতন ছাড়াও ১৯৪৯-৫০ সালে রাজবন্দীদের অনশনের আর একটি প্রধান কারণ এই অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে তৎকালীন পার্টির সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সে সময়ে অনশনকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি পদ্ধতি হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, জেলের মধ্যে নিজেদের

---

[১২] ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে প্রথমা স্ত্রী জোহরা খানকে লেখা, গোলাম সাকলায়েন, সম্পা., *শহীদুল্লাহ কায়সার রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ৬১৯।

[১৩] *East Bengal Legislative Assembly proceding.* Third Session, 1949, Vol. 111.

[১৪] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলা ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৫), পৃ. ৩০০।

অধিকার নিয়ে সংগ্রাম শুরু করলে জেলের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁরা এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবেন এবং তার ফলে দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সামগ্রিকভাবে অনেকখানি এগিয়ে যাবে।'[১৫] কিন্তু বাস্তবে তাঁদেরকে রাজবন্দী হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার দাবি পূরণ হলেও এইসব অনশন ধর্মঘট বৃহত্তর কোনো দাবি পূরণ করেনি। তবে এইসব বন্দীরা রাজবন্দী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর জেলের অভ্যন্তরে নিজেরাই মার্কসবাদের চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন যা শহীদ সাবেরের রোজনামচায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দেখান, প্রগতিশীল চিন্তাধারী লোকমাত্রই কমুনিস্ট হিসেবে পরিচিত ছিল। তারই ফলস্বরূপ রাজবন্দী ওয়ার্ডকে কমুনিস্ট ওয়ার্ড বলে ডাকা হতো। এই কমুনিস্ট হিসেবে পরিচিত ছিল। তারই ফলস্বরূপ রাজবন্দী ওয়ার্ডকে কমুনিস্ট ওয়ার্ড বলে ডাকা হতো। এই কমুনিস্ট ওয়ার্ড তথা রাজবন্দী ওয়ার্ডকে লেখক বলেছেন 'অন্য দুনিয়ার ভেতর আরেক দুনিয়া।' এখানে রাজবন্দীদের জীবন–যাপন খাদ্যব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে সাধারণ–বন্দীদের একটা স্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাজবন্দীরা তাঁদের জীবনকে সমাজতন্ত্রের মতো একটা ছকের ভেতর প্রবাহিত করতে চেষ্টা করেছেন এবং সাধারণ বন্দীরা তাই দেখে উৎসাহিত হচ্ছে। সকাল বেলা দশজনের চা রাজবন্দীদের বত্রিশ জনে ভাগ করে খাওয়া, নিজেদের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে তা সংশোধন করা, নিয়মিত পত্রিকা পড়ে তার উপর রিভিউ করা, সাংস্কৃতিক আসর, বক্তব্য–প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিষয় ছিল তাদের সমাজব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ। ধারণা করা যায়, রাজবন্দীদের এই প্রচেষ্টা দেশের অন্যান্য জেলখানায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ এর প্রায় এক দশক পরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে স্ত্রীকে লেখা শহীদুল্লা কায়সারের চিঠিতে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি লেখেন:

> ...অন্য পেশা (অবশ্য বাইরের দুনিয়ায়) চাকুরী, ব্যবসায়ী, ডাক্তারী, পারমিট বিক্রি. সবই আছে। ...কারাগারে আমার পথটা চীনের মতো দুর্গম নয়। কিন্তু এখানকার শিক্ষা, এখানকার অভিজ্ঞতার দাম কি কম? মানুষকে একান্ত করে জানবার উৎকৃষ্টতর অন্য কোন জায়গা আছে কি? মানুষের হৃদয়াবেগ মানবমনের নিগূঢ়, রহস্য, ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রেম–ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা এসস মিলিয়ে যে মানবমন–তার সাথে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হবার যে সুযোগ এখানে পাওয়া যায় এমনটি আর কোথাও সম্ভব কি?[১৬]

এত কিছুর পরেও বন্দীরা তাদের শৃঙ্খলিত জীবনের কথা ভুলতে পারে না। এক সময়ে বন্দীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বাইরে মিছিলের ধ্বনি শুনে তাদের ভেতর আশার আলো জেগে ওঠে। তারা মনে করে তাঁদের মুক্তির দাবিতেই মিছিল হচ্ছে। তাঁরা মুক্তির প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে।

রোজনামচাটিতে শহীদ সাবের নিজেকে কিছুটা আড়াল করার চেষ্টা করলেও সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ফলে রচনাটিতে তার সামাজিক–পারিবারিক জীবনের ইঙ্গিতসহ তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। রোজনামচাটিতে শিল্পের চেয়ে বেশি প্রকট হয়ে আছে সত্য ভাষণ। লেখাটির অনেক জায়গায়ই পরোক্ষভাবে শাসক ও শাসন ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা–বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে এবং এটা ঘটেছে লেখকের স্বভাবজাত কারণেই। এ সম্পর্কে সেলিনা হোসেন বলেন, 'দৈহিক দিক থেকে কারারুদ্ধ করলেও তাঁর সৃজনশীল শক্তিকে অবরোধ করার ক্ষমতা মুসলিম লীগ সরকারের ছিল না। স্রোতের অন্তরালে চলছিল অন্তঃস্রোতের পালা। ফল্গুধারার মতো প্রেরণা এসে জমাট করে গড়ে তুলল জেল জীবনের অভিজ্ঞতা।'[১৭] ঠিক এ রকমই আমরা বিশ্বসাহিত্যের আরেক ক্ষণজন্মা লেখক অ্যাডগার অ্যালেন, পো-র The Pit and the Pendulam গল্পে ফ্যাসিবাদী শাসকদের জেল

---

[১৫] বদরুদ্দীন উমর, *তদেব*, পৃ. ৩০০।

[১৬] *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী*, পৃ. ৫৫১, ৬১৯।

[১৭] *শহীদ সাবের রচনাবলী*, পৃ. ৪৯।

নির্যাতনের গা শিউরানো কাহিনী দেখি। রুশ সাহিত্যের দিক পাল টলস্টয়ের জবংঁৎৎবপঃরড়হ–এর মাসলোভাকে বিচারের প্রহসনে জেল খাটতে দেখি। সেখানেও জেলখানার নিদারুণ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এইসব গল্প–উপন্যাসে জেল জীবনকে কিছুটা শিল্পিতভাবে দেখা হলেও মূলত তাবৎ পৃথিবীতেই শাসক শ্রেণী জেলখানাকে কোনো না কোনো ভাবে তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে। শহীদ সাবেরের 'আরেক দুনিয়া থেকে' নামক রোজনামচায় এই স্বার্থসিদ্ধির রূপ উন্মোচন প্রচেষ্টার পাশাপাশি জেল জীবনের মানসিক ও বাহ্যিক রূপ ভীষণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। লেখক নিজের লেখার দায় সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দেন এভাবে:

> সেদিন দেশবাসীর সামনে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ইংরাজরা অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী রচনা করেছিল। কিন্তু তাদেরই সৃষ্ট বাংলাদেশের কারার অসংখ্য অন্ধকূপগুলির কথা কেউ আর লেখেনি।[১৮]

কিন্তু শহীদ সাবেরের রচনা বাংলাদেশের অসংখ্য অন্ধকূপগুলির অভিজ্ঞতাই প্রতিফলিত হয়েছে।

রোজনামচায় প্রতিফলিত ৫০ দশকের জেল জীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা:

ক. জেলের অফিস থেকে শুরু করে কয়েদি ওয়ার্ডের বর্ণনা;
খ. রাজবন্দী ওয়ার্ডে বন্দীদের পরিচয় এবং তাদের অপরাধ সংক্রান্ত বর্ণনা;
গ. রাজবন্দীদের জীবন যাপন।

৩.১ জেলের অফিস থেকে শুরু করে কয়েদি ওয়ার্ডের বর্ণনা

একজন নবাগত বন্দী জেলের ভেতর ঢোকার সাথে সাথে কি ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবে সেই বর্ণনা রোজনামচাটির প্রথম দিকেই আছে। এই বর্ণনার মধ্যে ফুটে উঠেছে এক সকরুণ রূঢ় অন্য জগতের চিত্র, যার সাথে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ এবং পরিচয় নেই। যেমন সাবের বলেন:

> আপিস ঘরের প্যাসেজটুকু পার হয়ে দ্বিতীয় গেট অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে আপনি আলাদা দুনিয়ায় পা দিয়েছেন। সে আরেক পৃথিবী। সাধারণত এখানে যারা আসে তারাও দ্বিতীয় দুয়ার অতিক্রান্তির অর্থ তখনি ধরতে পারে না। পারে বহু পরে।[১৯]

এই বর্ণনার সাথে পাঠককেও ধীরে ধীরে জেলজীবনের পরিচয় এবং অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেন লেখক। এই পর্বে কয়েদিদের দুঃসহ জীবন, জেলখানার অব্যবস্থাপনা, জমাদারদের অবৈধ আয় ইত্যাদি ব্যাপার পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে সমকামিতার কথা। সেখানে জামাদার ইচ্ছে করলেই ছোকরাদের ছোকরা ফাইলে না দিয়ে দুনম্বর অথবা তিন নম্বরেও দিতে পারে। যেমন সাবের বলেন:

> রাত নটা দশটার সময় লণ্ঠনধারী প্রহরীর পিছু পিছু ছেলেটি যখন দুনম্বর অথবা পাঁচ নম্বরে গিয়ে ঢুকবে, তখন জানতেও পারবে না কোথায় চলেছে ও। সুন্দর ছেলে হলে তো কথাই নেই। একের পর এক ক্রিমিনালরা চালাবে যৌন অত্যাচার, পাহারা প্রভৃতি দাগী আসামীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্দোবস্ত থাকে জমাদারের। হয়তো পরদিন জমাদার শুধোবেন, কেমন চলল রাতে। পাহারা হাসবে। আর ট্যাক থেকে বের করে দেবে টাকা।[২০]

---

[১৮] *শহীদ সাবের রচনাবলী*, পৃ. ৭২।
[১৯] *শহীদ সাবের রচনাবলী*, পৃ. ৭০।
[২০] *শহীদ সাবের রচনাবলী*, পৃ. ৭১।

জেলখানার এই অংশের বর্ণনায় দেখা যায়, ১৬ জনের ওয়ার্ডে ৫০/৬০ জন থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে দেখা যায়, একশ সতের বছরের পুরনো চট্টগ্রাম কারাগারে ১০৪৭ জন বন্দীর ধারণক্ষমতা থাকলেও সেখানে এখন আছে প্রায় ৪৭০০ মানুষ। ... বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে অনুমোদিত বন্দী ধারণ ক্ষমতা ২৪ হাজার ৫৩৮ জন। ২০০২ সালের জুন মাসের হিসাব অনুযায়ী উপরোক্ত ধারণ ক্ষমতার বিপরীতে বন্দী আছে ৬৪ হাজার ৮৯০ জন। অর্থাৎ প্রতি কারাগারে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি বন্দী রয়েছে।[২১] দেখা যাচ্ছে, পঞ্চাশ বছর পরও অবস্থা প্রায় একই রকম রয়েছে। এছাড়া সাবেরের রচনায় উল্লেখ পাওয়া যায়, অপরাধীদের পাশাপাশি অনেক নিরপরাধ ব্যক্তির বন্দী থাকার কথা। তিনি আরো তথ্য দেন, অনেক লোকই বাইরে না খেয়ে মরার চেয়ে জেলখানাকে বেছে নিয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন হলো পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের আলী আহমদ। আর যে খাদ্যের জন্য জেলখানায় এসেছে, সেই খাদ্য চার ছটাক ভাতের জায়গায় আড়াই ছটাক পায়, আর এক ছটাক মাছের জায়গায় পায় হরীতকী দানার মতো এক কাচ্চি মাছ। এখানে গালাগালি নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার, তাই বন্দীরা আঞ্চলিক ভাষায় ছড়া কাটে 'গাইল, ডাইল, কাইল কয়েদ খানার ভাইল।' সাবের জানান, জেল কোডে দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলেও তাদের ডাণ্ডা অহরহই চলে। ফলে সাধারণ কয়েদিরা তাদের নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে গান তৈরি করেছেন, যে গানের ভেতর বন্দীদের মন-মানসিকতা ও জীবনকে অনেকাংসেই দেখা যায়। যথা:

ইংরাজ আমলেরে ভাই, পরাধীন
ছিলাম, একথা শুনি,
এ বেল চান বাঁওটা টুইক্যা মাথায়
দিয় রে ভাই–হইলাম
পাকিস্তানী।
আঁরার ধন-জন-জান দিলাম রে
অ ভাই,
তবু গেল না কপালের দুঃখ
শরীরে সা স্য ন-যায় ...।
আঁরার ছেলে পিলে উয়াসে
মরেরে;
তারা কতই করে ফন্দি
বিনা দোষে হইলাম রে ভাই।
জেলখানার বন্দী ...।[২২]

এ রকম বিনা দোষে অনেককে আটক রাখা হলেও এদের মাঝে বসে অনেক দাগি আসামি ডাকাত দলের লোক সংগ্রহের কৌশল উদ্ভাবন করে বরে শহীদ সাবের ইঙ্গিত দেন। জেলখানার অপরাধী শোধনের চেয়ে আরো বেশি অপরাধী তৈরি হয়, রোজনামচার প্রথম পর্বে লেখকের বর্ণনা থেকে এই সত্যটি বেরিয়ে আসে।

---

[২১] আলতাফ পারভেজ, "বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও কারাগার", *নতুন দিগন্ত* (ঢাকা), প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০০২, পৃ. ১১৯, ১২০।

[২২] *শহীদ সাবের রচনাবলী*, পৃ. ৭৪।

৩.২ সাধারণ বন্দী ও রাজবন্দীদের পরিচয় এবং তাদের অপরাধ সংক্রান্ত বর্ণনা

এই পর্বে শহীদ সাবের জেলখানার ভেতরকার আরেকটা জেলখানার দরজা আমাদের সামনে উন্মোচন করেন। সমস্ত জেলখানার ভেতর একটা ওয়ার্ড কমিউনিস্ট ওয়ার্ড বা রাজবন্দী ওয়ার্ড নামে পরিচিত। লেখকের মতে এই কমিউনিস্ট ওয়ার্ড 'অসূর্যম্পশ্যা'। বিনা অনুমতিতে এখানে কারো প্রবেশ নিষেধ, এমনকি বেসরকারি পরিদর্শকবৃন্দও এখানে আসতে পারে না। কারণ এখানে যারা ঢোকে তারা সবাই কমিউনিস্ট হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলেন, পায়খানা পরিষ্কার করার লোক থেকে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সবাই কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। এঁদের উপর তৈরি করা অবরোধ থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সরকার এই কমিউনিস্ট ও সাম্যবাদীদের নিয়ে খুব আতঙ্কিত ছিল। সরকার তাদের অত্যাচারের সাক্ষীদের সব সময়ে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে বাইরের পৃথিবীর লোকদের কাছ থেকে।

এই পর্বে লেখক সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাদে অপরাধের অল্প ফিরিস্তি দেন। যেমন, ডাকাতি কেসের আসামি ফজলুর রহমান। সে একজন ঝাড়ুদার। পরিচর্যাকারীর নাম আনজু আর আনজুর পদের নাম 'ফালতু'। উল্লেখ্য এই 'ফালতু' পদটির উল্লেখ কারাজীবন ভোগকারী আরো দু-একজনের বইয়ে পাওয়া যায়। ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দীদের সেবা করার জন্য যে সকল সাধারণ বন্দীদের নিয়োগ করা হয় তাদেরকে 'ফালতু' বলা হয়।[২৩] এরপর আসে ফকির। তার সম্পর্কে লেখক বলেন, দুস্কৃতকারীরা তার বৌকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলে গ্রামের লোকের কাছে সে বিচার প্রার্থনা করে এবং তাদের কাছে কোনোরূপ বিচার না পেয়ে গ্রামের লোকদের শাস্তি দেবার জন্য স্কুল ঘরটা জ্বালিয়ে দেয়। এরপর বলেন সুলতানের কথা। সুলতান ভয়ঙ্কর প্রকৃতির ডাকাত। ছয় বছরের জেল হয়েছে তার। কমিউনিস্ট ওয়ার্ডে তার কাজ হলো রান্নাবান্না করা। কিন্তু এই কাজ রাজবন্দীরা নিজেরাই করে, সুলতান শুধু জোগান দেয়। দ্বিতীয় নম্বরের পাহারা হচ্ছে হাসেম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপান এবং মিত্র শক্তি বর্মায় যে অস্ত্র-শাস্ত্র ফেলে যায় সেগুলো সেখানকার অধিবাসীদের অনেকেই মাটিতে পুঁতে রাখে এবং পরে বিদ্রোহের কাজে ব্যবহার করে। হাসেম সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য হলো-হাসেম বিদ্রোহী না হলেও তার ঘরে ভাঙা রাইফেল ও ব্রেনগান পাওয়া গেছে, ফলে তার দুবছরের সাজা হয়েছে। উল্লিখিত চরিত্রগুলো সাধারণ সাজাপ্রাপ্ত বন্দী। রাজবন্দী ওয়ার্ডে তাদেরকে উক্ত কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এরপর লেখক বর্ণনা করেন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অজুহাতে আটক বন্দীদের নিয়ে। এঁদের আটক সম্পর্কে লেখক বলেন, পশ্চিমা গণতন্ত্রের সঙ্গে যে শব্দাবলি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তার সম্পর্কে একটি হচ্ছে 'নিরাপত্তা'। আটক বন্দীদের আটকনামায় লেখা আছে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা। লেখক আরো উল্লেখ করেন:

> মার্কসবাদীদের কাছে শোনা যায়, রাষ্ট্রশক্তি হচ্ছে শাসক শ্রেণীর একটা যন্ত্র, যা কেবল শাসক শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা বলতে তারা বোঝে স্বার্থের নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তা ব্যাঘাতকারী হিসেবে যারা বন্দী হয়েছে তাদের পদবী নিরাপত্তা বন্দী।[২৪]

বিচারাধীন যেসব রাজবন্দী আছেন, তাদের রাজনৈতিক সত্তা স্বীকার করা হতো না, পরে জেলের একমাত্র প্রতিবাদের ভাষা অনশনের মাধ্যমে তাঁরা রাজবন্দী ওয়ার্ডে আসেন।[২৫] তাঁদের মধ্যে দুইজন

---

[২৩] শওকত আলী, *কারাগারে ডায়েরী*, পৃ. ৪৩।

[২৪] *শহীদ সাবের রচনাবলী*, পৃ. ৭৮।

[২৫] সে সময়ে রাজবন্দীদের কোনো মর্যাদাই দেওয়া হতো না। প্রথম দিকে জেল ভাতা, পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি, খবরের কাগজ ইত্যাদির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ...তাদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্য দেওয়া হতো। ...পূর্বে বাংলার জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষত মশ্চিম

আছেন একজন হৃষ্টপুষ্ট চেহারার, সবে শৈশব পেরোনো তরুণ আর অপরজন কবি। লেখক জানান এই কবি অস্থির রোমান্টিক প্রকৃতির মানুষ। জেলের কয়েদি হাজতিরা কবি বোঝে না, ফলে তিনি 'কবির আহমেদ' নামে পরিচিত হয়েছেন। রাজনৈতিক কর্মীদের সংস্পর্শে এসে তার চিন্তাজগতে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। মার্কসবাদী জীবনদর্শন সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলেও কবি একটা সুস্পষ্ট বামপন্থা বেছে নিয়েছেন।

এই নিরাপত্তা বন্দীদের মধ্যে আছেন ছাত্র, কৃষক বুদ্ধিজীবী, সন্ত্রাসবাদী, শ্রমিক, পুস্তক-বিক্রেতা প্রভৃতি। এঁদের পরিচয় করিতে দিতে গিয়ে লেখক ছদ্মনামের আশ্রয় নিয়েছে, বা নাম উল্লেখ করেননি। তাঁদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীটি হলেন পুরোপুরি রাজনৈতিক পরিসবে বেড়ে ওঠা মানুষ। গণিতশাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি আছে এবং গণিতের বই বের হয়েছে। তিনি ১৯৩৮ সালের শুরু থেকে মার্কসবাদী-লেলিনবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন, ১৯৪২ সালে সরাসরি রাজনীতিতে ঢোকেন এবং তিনি গোড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান।[২৬] সরদার ফজলুল করিমের লেখা থেকে জানা যায়, এই বুদ্ধিজীবীর নাম সুকুমার চক্রবর্তী। যাঁর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর আলোচনা করা হয় যাকে নিয়ে সে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী। এর নাম গুপ্ত। 'আন্ডারসনী বাংলার পীড়ন আর অত্যাচারের আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়েছেন যে সমস্ত লোক তিনি তাদেরই একজন'।[২৭] লেখক এরপরের বন্দীটির নাম দেন ওসমান। এই ওসমান সম্পর্কে লেখক বলেন, কৃষক আন্দোলন, জমিদারি উচ্ছেদ, খাদ্য আন্দোলন ইত্যাদিতে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তার মনের মধ্যে প্রচণ্ড ঘৃণা।

এরপর পরিচয় দিয়েছেন একন মার্কসবাদী ছাত্রের, যার নাম টুলু। বয়সে সে সবথেকে ছোট। এই টুলু চরিত্রের অন্তরালে লেখক মূলত নিজেকেই উপস্থাপিত করেছেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সরদার ফজলুল করিমের লেখা থেকে। যেমন তিনি বলেন:

> এই সময়েই চট্টগ্রাম জেল থেকে এল এই ষোল সতের বছর বয়সের তরুণ রাজবন্দীটি। দেখতে সে বয়সের তুলনায় আরো ছোট আরো কৃশ। হয়ত বয়সও তার এরচেয়ে কম ছিল। আমি ঠিক জানতাম না, শহীদ সাবের তখন মেট্রিক পড়ছে না আইএ পড়ছে...। শহীদ সাবের, যে সকল রাজবন্দীর সবচেয়ে ছোট ভাই ছিল, আমাদের সেই বাক্যহীন মূর্তিতে রাজনীতিক চেতনার সঞ্চারে বিরামহীন বাণীর ধারা ছিল। তখন রাজবন্দীদের মনে তাদের অনুসৃত রাজনীতিক কৌশলের ভ্রান্তি অভ্রান্তি নিয়ে নানা প্রশ্ন। ...শহীদ সাবেরের মনে দ্বিধা ছিল না। বিপ্লবের পথ কি তা নিয়ে ওর নিজস্ব মতামত প্রকাশের আবেগে ও অস্থির হয়ে উঠত।[২৮]

রোজনামচাটিতে শহীদ সাবের নিজেকে কিছুটা রাখঢাক করার চেষ্টা করলেও টুলু চরিত্রের আড়ালে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে গোপন করতে পারেননি। এরপরে লেখক বর্ণনা করেছেন মজুর ইউনিয়নের একজন সংগঠকের, যার হাত মেশিনে কাটা পড়েছে। সবশেষে দেখা যায় দাশগুপ্তকে। এই দাশগুপ্ত সৌম্য আর সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন লোক। তাঁর অপরাধের কাহিনী লেখক বলতে চাননি।

বাংলাতেও জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট শুরু হয়। বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, পৃ. ৩০০, ৩০১।

[২৬] *শহীদ সাবের রচনাবলী*, পৃ. ৭৯।

[২৭] *তদেব*, পৃ. ৮০।

[২৮] *শহীদ সাবের রচনাবলী*, পৃ. ৩৬।

রাজবন্দীদের পরিচয় এবং অপরাধ বৃত্তান্তে দেখা যাচ্ছে যে, খুব সামান্য অজুহাতেই বিনা বিচারে, রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নিরাপত্তার ধুয়া তুলে তৎকালীন সরকার সাত্যিকারের দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করে জেলে ভরেছেন।

৩.৩ রাজবন্দীদের দিনযাপন

এই পর্বে দেখা যায় পূর্বে বর্ণিত রাজবন্দীরা একটা অর্থহীন সময়কে তাদের মেধা-মনন দিয়ে অর্থপূর্ণ করার প্রচেষ্টার মধ্যে নিয়োজিত আছেন। যেমন সমালোচক বলেন :

> এরই মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীরা গান গেয়ে, বক্তৃতা করে, সাহিত্য আসর বসিয়ে হৈ-হুল্লোর করে বদ্ধ জীবনকে সচল ও মুখর করে তোলার চেষ্টা করে থাকেন। তবু বেদনার একটা অন্তর্দাহ এখানে অনুভূত হয়। সংবেদশীল ও প্রগতিশীল শহীদ সাবের জীবনের বহিরঙ্গের রূপ একেছেন, তেমনি অন্তর্লোককেও সহানুভূতির সঙ্গে রূপায়িত করেছেন।[২৯]

রাজবন্দীদের জীবন-যাপনের চিত্রতে সমালোচকের মতের সমর্থন পাওয়া যায়। এই পর্বে দেখা যায়, রাজবন্দী ওয়ার্ডের কয়েদি, হাজতি, এমনকি সান্ত্রি-এঁরা সবাই কমিউনিস্টদেরকে আপনার লোক মনে করে। বাইরের জগতে স্বার্থান্বেষী মহলের প্রচারণার কারণেই যাদের সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতো সাধারণ নিম্নবিত্ত জনগণ। এখানে এই চারদেয়ালে সেই শ্রেণীর লোকদের কাছে কর্তৃপক্ষের চাইতেও বেশি আপন রাজবন্দীরা। তারা পুরোপুরি কমিউনিস্ট রাজনীতি না বুঝলেও এটুকু বোঝে, তাদের মঙ্গলের জন্য এই সকল রাজবন্দীরা জেল খাটছে। এখানে তাদের চোখের কুয়াশার দেয়াল অনেকখানি কেটে যায়।

শহীদ সাবেরের রোজনামচায় রাজবন্দীদের জীবন-যাপনের যে চিত্র পাওয়া যায়, এর একদশক পরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তার অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়। যেমন, এক রাজবন্দী লেখেন:

> সাঁঝ আঁধারের সাথে সাথেই (কারা আইন অনুযায়ী before sunset) লক আপ অর্থাৎ গোয়ালে তালা। কিছুক্ষণ তাস পিটাই অথবা বসি দাবার ছক নিয়ে। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে বসি খাতা কলম নিয়ে, লিখি যতক্ষণ ভালো লাগে, যত লিখি তার চেয়ে কাটি বেশী।[৩০]

এই রাজবন্দীর একটি পত্রে ১৯৬১ সালের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দীদের জীবন উঠে এসেছে, যেটা পুরোপুরিভাবে শহীদ সাবেরের রাজবন্দীদের জীবন-যাপনকে সমর্থন করে না। যেমন:

> সকালে লেপের উমে শুয়ে চা পান (ইদানীং চা-র নামকরণ তেঁতুল সিদ্ধ জল) ৭॥-টা ৮ টায় টোস্ট মার্কা ডানলপের টায়ারগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়া আর খেতে খেতে গল্প করা, করে কখন ভাগ্যে জুটেছিল গরম সেঁকা রুটি। তারপর পত্রিকাগুলোর উপর চোখ বুলাই। চিঠিপত্র লিখি। দুপুর এসে যায়। একটু ঘুমাই খাওয়ার পর। বিকেলে নামি সাড়ে চারটেয়, তার আগে আধঘণ্টা বাগানে পরিচর্যা পানি ঢালা, একটু বা খুপরী চালানু।[৩১]

অথচ শহীদ সাবেরের রাজবন্দীরা নিজেরাই রান্না করে খাচ্ছে এবং সেখানে খেলাধুলার কোনো উল্লেখ নাই। কিন্তু তারপরেও অর্ধাহার ও পুষ্টিহীন খাদ্যে ধীরে ধীরে জটিল রোগে আক্রান্ত হয়।

---

[২৯] মুহম্মদ ইদরিস আলী, *শহীদ সাবের*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯) পৃ. ৩৯-৪০।

[৩০] রাজিয়া খানকে লেখা চিঠি, *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী*, পৃ. ৬০৩।

[৩১] *তদেব*, পৃ. ৬০২।

রাজবন্দীরা। আমাশা এবং পাইলস এইসব রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই রোগের উল্লেখ শহীদুল্লা কায়সারের লেখায়ও পাওয়া যায়। যেমন তিনি স্ত্রীকে এক পত্রে লেখেন:

> কয়েখানার আ–ম বিমার আমাতিসারে ভুগছি। এন্টেরো ভায়াফর্ম বটিকা সেবন করছি আর ভাবছি যেন অস্টিনের পৃথিবীটাই সুন্দর।[৩২]

শহীদ সাবেরের রাজবন্দীরা আগাগোড়া গভীর মনোযোগ দিয়ে সমবেতভাবে বাংলা-ইংরেজি পত্রিকা পড়ে। তার মধ্যে অর্থনীতির খুঁটিনাটি, ব্রিটেনের ডলার সংকট, চীন বিপ্লব তাদের নাড়া দেয়।

জেলের ভেতর সমবেতভাবে জীবন কাটানোর নানা প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়ার মধ্যে অবস্থান করলেও এক সময়ে বন্দীদের ভেতর ক্লান্তি আসে। বাইরের কোনো সংবাদে তারা মুক্তির প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, কিন্তু বন্দীদের অভিশাপ ঘোচে না। তারা বোঝে চোর ডাকাতের শাস্তির জায়গা তো এটা নয়। এটাও একটা চুরির জায়গা। শহীদ সাবেরের রচনার রাজবন্দী চক্রবর্তী বলেন, "বুড়ো মার্কস ঠিকই বলেছিল, যে জেলটা হচ্ছে শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার অস্ত্র। কেতাবের হরফের ছাঁদে চোখ বুলিয়ে সেটা যদি কেউ না বুঝে থাকেন, তবে বুঝবেন এখানে এসে।"[৩৩] একই রুটিন বাঁধা জীবনের ভেতর দিন ও রাত পার হয়। "ভেতর বাইরে সারা দুনিয়ায় আজ দ্বন্দ্ব। জয়–পরাজয় নির্ধারিত হবার পালা এসেছে। একদিন এ তিমির তপস্যার অবসান হবে—এ আশাটি ধুক ধুক করে জ্বলছে সবার হৃদয়ে। বন্দীরা বেঁচে আছে'।[৩৪]

৪. উপসংহার

ধর্মের উগ্র উন্মাদনায় আর সাম্রাজ্য বিস্তারের বাসনায় সর্বকালীন মানবতাবাদীদের উপর যে খড়্গ নেমে আসে, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ শহীদ সাবের তাঁর রোজনামচায় সেই চিত্রই অত্যন্ত নির্মোহভাবে তুলে এনেছেন।

এখানে পঞ্চাশ দশকে চট্টগ্রাম জেলখানার যে চিত্র শহীদ সাবের তুলে ধরেছেন, সেটা একটা নির্দিষ্ট দশকে ও একটা নির্দিষ্ট জেলখানার চিত্র নয়। বরঞ্চ বলা যায়, গোটা দেশে সমগ্র জেলখানায় তখন একই চিত্র ছিল। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি শহীদুল্লা কায়সার, শওকত আলী, বদরুদ্দীন উমরের লেখা থেকে। স্থান ও কালভেদে জেলজীবনের চিত্র কিছুটা ভিন্ন হলেও তাবৎ জেলখানার চিত্র যে মূলত এক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শহীদ সাবেরও তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতায় জারিত রোজনামচায় এভাবে যে জেলজীবনকে অঙ্কন করেন, সেটাও স্থান ও কালকে অবলীলায় অতিক্রম করে যায়।

---

[৩২] স্ত্রী জোহরাকে রেখা পত্র, *তদেব*, পৃ. ৬২৪।

[৩৩] *শহীদ সাবের রচনাবলী*, পৃ. ৯২।

[৩৪] তদেব, পৃ. ৯৩।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২

আল মাহমুদের জীবনবোধ

সরকার আমিন*

Abstract: Al Mahmud is a great poet of Bangladesh. His poetry is full of natural colour and formidable sounds. His poetic diction contains mystery, love and human agony. Al Mahmud comes of a traditional Muslim family. His outlook is honed by his unique personal experience and struggle, his political participation and philosophical articulation. His political and philosophical stand has changed sometimes. His starts his life as a 'communist' and then turns towards religion. In this article efforts have been made to understand Al Mahmud's poetic development on the context of his whole life.

ভূমিকা

আল মাহমুদ বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য-সাধারণ কবি। কবিতার বিষয় ও শৈলীর ক্ষেত্রে তিনি একটি অভূতপূর্ব শিল্প-অভিযাত্রার সূচনা করে গন্তব্য স্পর্শ করার সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর আছে একটি স্বকীয় কাব্যভাষা। এটা একটি সর্বজনস্বীকৃত প্রত্যয় যে, একজন কবির কাব্য-সাফল্যের পেছনে কার্য-কারণ সূত্রের মতোই বিরাজিত থাকে তাঁর জীবনবোধের প্রভাব। আধুনিক সময়ের জটিলতর বাস্তবতায় একজন লেখকের জীবনবোধ কখনো একরৈখিক বা অবিমিশ্র হয় না। জীবন কতগুলো আবশ্যকীয় দ্বন্দ্বের সমীকরণ। এই দ্বন্দ্বের চারিত্র্য লেখকের শ্রেণী-অবস্থান, তাঁর শৈশব কৈশোরের বেড়ে-ওঠা, পরিবার-প্রতিবেশ-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, পেশাগত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, অধ্যয়ন, তাঁর চেতনায় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রণোদনাকে বিশেষণের মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব।

পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিত

১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের একটি পাড়া মৌড়াইল-এ আল মাহমুদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর আবদুর রব, মাতা রওশন আরা মীর, পিতামহ মীর আবদুল ওয়াহাব, পিতামহী বেগম হাসিনা বানু। আল মাহমুদের সৃষ্টিশীল মন বিকাশের পেছনে গভীর প্রভাব ফেলেছে পিতামহ ও পিতামহীর গভীর সান্নিধ্য। তাঁর পিতামহ ছিলেন প্রতিভাবান ও বিচিত্র শখের অধিকারী।[১]

---

* সহকারী পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

[১] 'আমার দাদা মীর আবদুল ওহাব ছিলেন কবি। জারিগান লিখতেন। আরবী-ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত। সংস্কৃতও জানতেন। নানার তুলনায় নিতান্তই গরীব। তার জানা সবক'টি ভাষার অসংখ্য বইপত্র স্তূপীকৃত হয়ে থাকতো তার ঘরে। লাঠিখেলা ও তরবারি চালনায় ওস্তাদ। পশু-পাখী ইত্যাদি পোষার অত্যন্ত শখ ছিলো। লড়াইয়ের অনেকগুলো মোরগ মুরগী পুষতেন। সরাইলের দেওয়ানদের সাথে তার মোরগগুলোর লড়াই হতো। কুকড়ো যুদ্ধের আসরে বাড়িতে জমায়েত অতিথিদের জন্য তিনি গরু জবাই করে ভোজ লাগিয়ে দিতেন। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু, অতিথিপরায়ণ ও অপরিণামদর্শী।' আল মাহমুদ, *যেভাবে বেড়ে উঠি* (ঢাকা : অঙ্গীকার প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ১১।

দাদা সম্পর্কে আল মাহমুদ যেসব তথ্য প্রদান করেছেন তা হলে—তিনি হাই স্কুলে শিক্ষকতা ও প্রধান কেরানির চাকরি করতেন। দেখতে ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। তিনি বিবাহ করেছিলেন তিনটি। দাদার প্রথম স্ত্রী হাসিনা বানুর গর্ভে আল মাহমুদের বাবার জন্ম হয়। হাসিনা বানু ছিলেন সিলেট জেলার সায়েস্তাগঞ্জ অঞ্চলের এক জোতদারের কন্যা। তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণ, রূপসী ও অত্যন্ত 'ব্যক্তিত্বশালী মহিলা', কঠোর পর্দাবাদী নারী, নিচুস্বরে কথা বলতেন; তাঁর নামাজ কখনো কাজা হতো না। দাদীর ধর্মাচরণ ও ধর্মকেন্দ্রিক ভাবনা আল মাহমুদের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলেছে।[২] তাঁর বিশ্বাসের রূপান্তর ও ধর্মীয় দর্শনে তা পরিণতি পাবার পেছনে দাদীর চিন্তাভাবনা অবচেতনে হলেও কাজ করেছে বলে অনুমান করা যায়। তাঁর পরিবারের অন্য সকলেই ছিলেন ধর্মান্তপ্রাণ।

১৯৫৫ সালে সৈয়দা নাদিরা বেগমের সাথে মাহমুদের বিয়ে হয়। তাঁর সাংসারিক জীবনে স্ত্রী নাদিরা বেগমের অবদান অতুলনীয়। স্ত্রীর অবদানের কথা বলতে গিয়ে মাহমুদ নিজের স্বভাব সম্পর্কে অনেকগুলো তথ্য প্রদান করেন অকপটে :

> আমি তো অন্য কোনো দায়িত্বই নিই নি। সত্য কথা বলতে—আমি তো দায়িত্বজ্ঞানহীন, অলস। আমি জীবনে জুতার ফিতা বাঁধিনি। সেটা অন্যে বেঁধে দিয়েছে। নখ কাটিনি, কাটতে ভয় পেতাম। সেটা অন্যে কেটে দিয়েছে। আমি খুব পরনির্ভর। নারীনির্ভরও বলতে পারো। আমার স্ত্রী বলতে গেলে সব কিছু সে নিজের কাঁধে নিয়েছে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখেছে, ছয় সন্তান গ্রাজুয়েট হয়েছে, এটা তারই অবদান। শিক্ষক মানুষের মেয়ে তো–ঝোঁক ছিল লেখাপড়ার প্রতি।[৩]

মাহমুদের স্ত্রী অর্থবান পরিবার থেকে এসে তাঁর দুঃখ-কষ্টের অংশীদার হয়েছেন। স্ত্রীর ধৈর্যপূর্ণ সহযোগিতা মাহমুদকে প্রাণিত রেখেছে।[৪] তিনি স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন। স্ত্রীকে 'পরিতৃপ্তিকর মহিলা' হিসেবে বিবেচনা করেছেন। নারী সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ও কৃতজ্ঞতাধর্মী মনোভাব মাহমুদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। এ রকম ভাবনা তাঁর মনে উৎপন্ন হবার পেছনে তাঁর স্ত্রীর অবদানকে অকপটে স্বীকার করেছেন আল মাহমুদ।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

আল মাহমুদের শিক্ষা জীবন শুরু হয় দাদী হাসিনা বানুর কাছে। তিনি তাঁকে বর্ণমালার পাঠ দেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এম. ই. স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তিনি জর্জ সিক্সথ হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এরপরে সীতাকুণ্ড হাইস্কুল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিয়াজ মোহাম্মদ হাই স্কুলে পড়াশোনা

---

[২] 'অকালমৃত এক কন্যা সন্তান ছাড়া আমার বাপই ছিল তার একমাত্র সন্তান। আমার বাপ–মাকে নিয়ে তিনি আমার দাদার সংসার থেকে আলাদা একটি বৃহদাকার ঘরে বাস করতেন। আমার শৈশব তার উষ্ণ স্নেহের ক্রোড়ে অতিবাহিত হয়েছে। আমার অতি শৈশবের স্মৃতি বলে যদি কিছু থাকে তা হলো আমার দাদীর সেই পবিত্র মুখাবয়ব। পান খাওয়া লাল দুটি সুন্দর ঠোঁট ও তার মুখ নিঃসৃত অদ্ভুত সব রূপকথা। সিলেটে মুসলিম বীরদের আগমনকালের রোমাঞ্চকর কাহিনীর ভাণ্ডারও যেন তার কাছে গচ্ছিত ছিলো। পরতে পরতে তিনি মেলে দিতেন ধর্মীয় আত্মত্যাগের সেই ইতিহাস। দাবী করতেন সেই সব শহীদ ও গাজীদের রক্তের উত্তরাধিকার বইছে তার শরীরে। আমাদের বাড়ির কঠোর ধর্মীয় আবহাওয়াও তাকে ঠিকমত পরিতৃপ্ত করতে পারতো না। তিনি চাইতেন আরও পরিপূর্ণ মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থা।' আল মাহমুদ, *যেভাবে বেড়ে উঠি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

[৩] আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎকার গ্রহণে : সরদার ফরিদ আহমদ ও অন্যান্য), *চাঁড়ুলিয়া*, আল মাহমুদ সংখ্যা, ২০০১, পৃ. ২১০।

[৪] 'আমি একজন ধনী লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম। আমি নিজে খুব দরিদ্র। পিতাও ছিলেন দরিদ্র। কিন্তু বিয়েটা করেছিলাম ধনী লোকের মেয়ে। এটা কৃতজ্ঞতাই স্বীকার করতে হবে যে, আমার স্ত্রী আমার দারিদ্র্যকে মেনে নিয়েছে। যখন আমি খুব অভাবে ছিলাম। সে আমাকে পরিত্যাগ করে যায় নি। আমার দুঃখ কষ্ট মেনে নিয়েছে সব সময়। প্রেমের মধ্যেই আমাদের দিন কেটে গেছে। জেল জুলুমের দিনে কেউ কোন সহায়তার হাত বাড়ায়নি। এমন দুর্দিনেও সে ধৈর্য ধরে সংসারের হাল ধরে।' আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎকার গ্রহণে : সালাহউদ্দিন বাবর ও অন্যান্য), *স্বল্পদৈর্ঘ্য* আল মাহমুদ সংখ্যা ২, ২০০২, পৃ. ৭৯।

করেন। ভাষা আন্দোলনের সময় ১৯৫২ সালে তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। এ সময় তিনি ভাষা আন্দোলন নিয়ে চার লাইনের একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভাষা আন্দোলন কমিটির' লিফলেটে মুদ্রিত হলে শুরু হয় 'পুলিশি হানা'। গ্রেফতার এড়াতে তিনি পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। এ পর্যায়ে তাঁর একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণ-প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে।

কর্মজীবন

১৯৫৪ সালে আল মাহমুদ চাকুরির খোঁজে ঢাকা আসেন। প্রুফ রিডার হিসেবে চাকুরিতে যোগদান করেন 'দৈনিক মিলাত' পত্রিকায়। শুরু হয় তার কর্মজীবন। তখন তাঁর বয়স একুশ। সেই সময়ের কথা তিনি বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে :

> আমি এসে উঠলাম নবাবপুরের একটি দিনমজুরদের হোটেলে, যার পাশেই ছিলো বেশ্যাপল্লী। লুৎফর রহমান নামক একজন অল্পখ্যাত লেখকের সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে আমার পরিচয় থাকায়, এই হোটেলের মালিক এক বৃদ্ধা মহিলা আমাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হলেন। আমি তখন একুশ বছরের কৃশকায় অপূর্ণ যুবক। চেহারায় ছবিসুরতে কিশোরই বলা চলে। লুৎফর রহমান তখন এই হোটেলেরই দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বস্ত বাসিন্দা। উদারতা ও নিয়মানুবর্তিতা যা আজকাল কোন গুণ বলেই বিবেচিত হয় না, লুৎফর রহমানের ছিল সে সব মানবিক গুণ। আমার দুর্দম ইচ্ছাশক্তিকে তিনি সহজেই শনাক্ত করতে পারলেন। শহরে বেঁচে থাকার জন্য তার যে উপায় ছিলো, আমি নাছোড় বান্দার মতো সেই ধরনের রুজিরোজগার আমার জন্য জোগাড় করে দিতে তাকে ধরলাম। নিরুপায় হয়ে কিংবা মমতাবশত তিনি আমাকে তার কর্মক্ষেত্র দৈনিক মিলাতের প্রুফ সেকশনে নিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন পাকা প্রুফ রীডার। তার অনুরোধে আমাকে পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটা শিক্ষানবিসের কাজ দেয়া হলো।[৫]

১৯৫৫ সালে তিনি দৈনিক মিলাত ছেড়ে কাফেলায় সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। কাফেলা থেকে তিনি ১৯৬৩ সালে 'দৈনিক ইত্তেফাকে' প্রুফ রিডার হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি পদোন্নতি পেয়ে 'ইত্তেফাকে'র মফস্বল সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক 'ইত্তেফাক' বন্ধ হয়ে গেলে তিনি চট্টগ্রামে গমন করেন। সেখানে তিনি প্রকাশনা সংস্থা 'বইঘর'-এর প্রকাশনা কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। 'দৈনিক ইত্তেফাক' পুনরায় চালু হলে তিনি সহ-সম্পাদক হিসেবে 'ইত্তেফাকে' যোগদান করেন। 'ইত্তেফাকে' তিনি মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্ব সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের ৮নং থিয়েটার রোডে প্রতিরক্ষা বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি কারারুদ্ধ হন এবং 'গণকণ্ঠ' পত্রিকাটিকে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে শিল্পকলা একাডেমীতে চাকরির ব্যবস্থা হলে সেখানে তিনি সহকারী পরিচালক পদে যোগ দেন। শিল্পকলা একাডেমীতে ১৮ বছর বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৯৩ সালের ১০ জুলাই একাডেমীর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক হিসেবে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে কিছুকাল দায়িত্ব পালন করেন। উলেখ্য, সংবাদপত্রে কাজ শুরু হবার আগে তিনি 'ড্রেজারের গেজ রিডার' হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও একটি কোম্পানীর সাবান তিনি সাইকেলে চড়ে ফেরী করার কাজও করেছেন।

---

[৫] আল মাহমুদ, 'আমি ও আমার সময়', *দৈনিক যুগান্তর*, শুক্রবার, ২৭ ডিসেম্বর, ২০০২ সংখ্যা, ঢাকা।

আল মাহমুদ কঠিন সংগ্রাম করেছেন কর্মজীবনে। পরিশ্রম আর প্রতিভার সমন্বয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর পেশাগত জীবন। সরকারি চাকরি করার সময় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম কানুন মেনে চলেছেন।

কবিতার বিষয়

আল মাহমুদের কবিতার প্রধান বিষয় হচ্ছে প্রেম, স্বদেশবোধ, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও বিবেকের দ্বৈরথ, সৃষ্টিতত্ত্ব, এ সংক্রান্ত বিস্ময়কাতর জিজ্ঞাসা তথা অধ্যাত্মবাদ। এ প্রসঙ্গে মাহমুদের মন্তব্য : 'কবিতা বদলায় সময়ের সাথে সাথে। আমার প্রথম দিকের কবিতা মূলত প্রেম, দেশপ্রেম ও প্রকৃতি নিয়ে রচিত। এখনকার কবিতার মূল বক্তব্য সৌন্দর্যের আদি কারণ অনুসন্ধান ও আধ্যাত্মিকতা।'[৬] তাঁর কবিতায় প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে খুঁজে পাওয়া যায় নারীকে। নারী প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় এসেছে শরীর সুষমায় সঞ্চালনশীলরূপে।

আল মাহমুদ কৈশোর বয়সেই গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসলেও তাঁর সত্তার গভীরে অপরিবর্তনীয় সূত্রের মতোই গ্রামীণ অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান সচেষ্ট থেকেছে।[৭] নগরে এসে নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হলেও কবি আত্মীয়তাবোধ করেন কৃষকের সঙ্গেই। তাঁর স্মৃতির গভীরে সতত সক্রিয় এমন একজন কৃষক যার বিষয় ফলবান মাটি, সীমাহীন মাঠ, আর এমন নারী যিনি পূর্ণস্তনী ঘর্মাক্ত যুবতী, যার অবস্থান উঠোনে, জীবনের প্রতীক ধানের কাছে। আল মাহমুদের নারী সতত উজ্জীবক আর যৌনতাশোভিত। যৌনতা সম্পর্কে মাহমুদের চিত্তে কোনো জড়তা নেই তিনি নিসংকোচে বলেছেন : 'আমি অজু করে সাহিত্য রচনা করি না। পুরুষ মানুষ হিসেবে যা দেখেছি তাই লিখেছি। তার মানে এই নয় যে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে নগ্নতা বা অশ্লীলতাকে জড়িয়ে লিখেছি। বাস্তব অর্থে মানব জীবন যেমন, তার আচরণ যেমন, তার সম্বন্ধসূত্র যেমন, তার যৌনতা যেমন, সবগুলি নিয়েই সাহিত্য হয়।'[৮] আল মাহমুদের নারী চরিত্রগুলোকে শরীর চেতনা সংবলিত পূর্ণাঙ্গ মানবী হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হবার সুযোগ নেই। তাঁর নারী সম্ভোগের প্রশ্নে নীরব কিন্তু সাহসী, অপ্রয়োজনীয় লজ্জায় আড়ষ্ট নয় বরং সমান অংশগ্রহণেচ্ছুক।[৯] তিনি নারীকে কেবল যৌন সহচরী হিসেবে দেখেননি, কঠিন, কঠোর বাস্তবতায় কামনা করেছেন যৌথ আনন্দ বেদনার অংশীদার হিসেবে।[১০]

---

[৬] আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎকার গ্রহণে : আফরোজা নাজনীন), *দৈনিক মানবজমিন'* ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ সংখ্যা, ঢাকা।

[৭] 'আমার বিষয় তাই, যা গরীব চাষীর বিষয়
চাষীর বিষয় বৃষ্টি, ফলবান মাটি আর
কালচে সুবজে ভরা খানাখন্দহীন
সীমাহীন মাঠ।
চাষীর বিষয় নারী।
উঠোনে ধানের কাছে নুয়ে থাকা
পূর্ণস্তনী ঘর্মাক্ত যুবতী।'
—"কবির বিষয়", *অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না*।

[৮] আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎকার গ্রহণে : সালাহউদ্দিন বাবর), *স্বল্পদৈর্ঘ্য* আল মাহমুদ সংখ্যা ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩।

[৯] সঙ্গমমুখী রাতের পাখিরা শব্দ করে
আমাদের প্রতি জানালো তাদেও অবোধ ঘৃণা;
তুমিও বুকের বোতাম বাঁধন আলগা করে
বললে নীরবে, আমাকেও করো লজ্জাহীনা
—"স্মরণ", *লোক লোকান্তর*।

[১০] 'নির্জল নির্দয় দেশে পেটে নেবে আমার সন্তান
আঙিনায় রক্ত ঢেলে বসন্তকে ফেরাবে কি নারী

দুঃখের ঘরকে শোকোত্তীর্ণ প্রাণের বাগানে পরিণত করতে হলে প্রয়োজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারীর। যে নারী নিজেকে চেনে, চেনে চারপাশের বাস্তবতার সৌন্দর্য ও কদর্যতাকে। কবি চান এমন এক নারীকে যিনি সৌন্দর্যময় ও যৌন-উদ্দীপক। তবে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য কখনো আল মাহমুদকে প্রবলভাবে কাতর করে : 'এক সময় ভাবতাম একজন কবি-পুরুষের কাছে নারীর চেয়ে সুন্দর আর কি আছে? না, কিছু নেই। নারী সৌন্দর্যকে কবি কেবল অবলোকন নয়, অনুভব এবং উপভোগও করতে চান। নারীর প্রতি তাঁর পক্ষপাতমূলক পরামর্শ :

অক্ষরে বিম্বিত হতে চাও যদি, খুলে ধরো সমস্ত গোপন।
কথা বলো, দুঃখের সুরভি যেন ঝরে যায়। যেন,
জ্বলে যায় শবাধারে শোকের লোবান।
নগ্ন হও, শিশু যেন দ্যাখোনি পোশাক।
ভালোবাসো, তামসিক কামকলা শিখে এলে
যেন এক অক্ষয় যুবতী।

তখন কবিতা লেখা হতে পারে একটি কেবল,
যেন রমণে কম্পিতা কোনো কুমারীর
নিম্ন নাভিমূল। ['শোকের লোবান', *লোক লোকান্তর*]

নারী যেন আল মাহমুদের পরামর্শ গ্রহণ করে সহজ সারল্যে প্রত্যুত্তর করেন :

আমার সৌন্দর্যে এসো। শরীর জঘন
অসহ আগুনে নিত্য জ্বলে যেতে চায়
নটির মুদ্রার মত মন আর স্তন
অশীল আরক্ত বিষ তুলেছে ফণায়;
সাহসে আঘাতে স্পর্শে তোমার রমণ
শেষ করো। ঘামে কামে পরিতৃপ্ততায়।
['সাহসে আঘাতে স্পর্শে', *কালের কলস*]

প্রকৃত অর্থেই, আল মাহমুদের নারী কামগন্ধময় ও সংগ্রামশীল। নারীর শরীরের মধ্যে তিনি খুঁজে পান কবিতার প্রগাঢ় প্রণোদনা, আর প্রবল পরিতৃপ্তি।

সমাজসত্য

আল মাহমুদের কবিতায় নারী রূপায়ণের প্রাচুর্যের পরই সমাজসত্যের সাক্ষাৎ মেলে। তিনি নিঃসন্দেহে রোমান্টিক কবি তবে কোনোক্রমেই স্বদেশবোধ-বিচ্ছিন্ন রোমান্টিক নন। এর কারণ এক অশান্ত সময়ে তাঁর জন্ম ও বেড়ে উঠা। একটা তীব্রতর 'রূঢ় বাস্তবতার' ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর জীবন, বলেছেন তিনি :

> আমার জন্ম হয়েছে ১৯৩৬-এ, আমার কৈশোরকালটা কেটেছে বৃটিশ আমলে, একটা অংশ বৃটিশ আমলে কেটেছে। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান আন্দোলন, দেশ ভাগ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ থেকে বাংলাদেশের উদ্ভব পর্যন্ত যে সময়টা আমি কাটিয়েছি সেটা একটা দুর্বহ জীবন। আমাদের ওপর দিয়ে গেছে বিশেষ করে পঞ্চাশ দশকের যারা কবি তাদের ওপর দিয়ে একটা দুর্বহ সময় বয়ে গেছে। তারা দেখেছে দাঙ্গা, ভ্রাতৃহত্যা, দেশভাগ, একটা স্বাধীনতা যুদ্ধ। এই যে কতগুলো ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা এসেছে, এতে তাদের মধ্যে একটা জিনিস তৈরী হয়েছে, সেটা কি? পঞ্চাশ

জলের প্রার্থনা ছেড়ে আকাশে তুলবে তরবারি?
মানবে না তুমি বলো নিয়তির নিরুপম গান!
তাই হোক! তুমি এসো, কোমরে পেঁচিয়ে নীল শাড়ি
দুঃখের ঘরকে করো শোকোত্তীর্ণ প্রাণের বাগান।'
—"বৃষ্টির অভাবে", *লোক লোকান্তর*।

দশকের কবিতার মধ্যে যাকে বলে স্বপ্ন, স্বপ্ন কম। রূঢ় বাস্তবতার কবিতা।
পঞ্চাশের কবিরা, আসলে এক রূঢ় বাস্তবতা পার হয়ে আমরা এসেছি।[১১]

আল মাহমুদের কবিতায়ও লক্ষ করি 'রূঢ় বাস্তবতা'র ছায়াচিত্র :

এ কেমন অন্ধকার বঙ্গদেশ উত্থান রহিত
নৈঃশব্দ্যের মন্ত্রে যেন ডালে আর পাখিও বসে না।
নদীগুলো দুঃখময়, নির্পতগ মাটিতে জন্মায়
কেবল ব্যাঙের ছাতা, অন্য কোন শ্যামলতা নেই।
অবিশ্বস্ত হাওয়া আছে। নেই কোন শব্দের দ্যোতনা,
দু'একটা পাখি শুধু অশ্বত্থ ডালে বসে আজও
সঙ্গীতের ধ্বনি নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাক্যালাপ করে;
বৃষ্টিহীন বোশেখের নিঃশব্দ পঁচিশ তারিখে; ['রবীন্দ্রনাথ', *কালের কলস*]

এলিয়টের পোড়া মাটির মতো নিষ্ফলা মাঠে কেবল ব্যাঙের ছাতা জন্মায়, এতে অন্য কোন শ্যামলতা নেই। এমনি কঠোরতর পরিস্থিতি অতিক্রম করেছেন কবি।

গ্রামীণচেতনা

আল মাহমুদের কবিতায় গ্রামীণচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। নানাভাবে তিনি গ্রামীণ স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ; সুষমা ও কষ্টময়তাকে তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতার মধ্যে গ্রাম কোনো রোমান্টিক ভাবালু পরিকল্পনার অধীনে রূপায়িত হয়নি। আল মাহমুদের গ্রাম স্বপ্ন ও রূঢ়তার মেলবন্ধনে রূপান্তরিত এক বাস্তবতা।

গ্রামের অতুলনীয় শক্তি হচ্ছে তার প্রকৃতি। গাছ, পাখি, নদীর এই প্ররোচনা একজন সৃষ্টিশীল কবির জন্য প্রবল অনুপ্রেরণাদায়ক। নদী কবির জন্য কেড়ে আনে নীরব তৃপ্তি :

'কিছুই খুঁজিনি আমি, যতবার এসেছি এ তীরে
নীরব তৃপ্তির জন্য আনমনে বসে থেকে ঘাসে
নির্মল বাতাস টেনে বহুক্ষণ ভরেছি এ বুক।
একটি কাশের ফুল তারপর আঙুলে আমার
ছিঁড়ে নিয়ে এই পথে হেঁটে চলে গেছি। শহরের
শেষ প্রান্তে যেখানে আমার ঘর, নরম বিছানা, ['তিতাস', *লোক লোকান্তর*]

নদীর কাছ থেকে নিশ্বাস সংগ্রহ করে কবি শহরে চলে আসেন। কবির কাছে শহরে বাস্তবতা কিন্তু গ্রাম অস্তিত্বের স্মারক। শহর ও গ্রাম এই দুই অস্তিত্ব তার অস্তিত্বের গভীরে সর্বদাই তৈরি করে দ্যোতনা। এই অর্থে গ্রাম ও শহর তার কাব্যসত্তায় পরস্পরের পরিপূরক ভূমিকা পালন করে।

আল মাহমুদের সমগ্র সত্তায় প্রজ্বলিত হয়ে আছে গ্রামীণ সৌন্দর্য। তাঁর সচকিত দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে গ্রামীণ সংকটেও। তবে গ্রাম তাঁর কাছে শুশ্রূষার প্রতীক। তিনি জানেন গ্রাম অনেক বদলে গেছে। গ্রামে ফিরে গেলেও তিনি শৈশবের মমতাময়, লাবণ্যময় গ্রামকে আর ফিরে পাবেন না :

ফিরলে আজো পাবো কি সেই নদী
স্রোতের তোড়ে ভাঙা সে এক গ্রাম?
হায়রে নদী খেয়েছে সব কিছু
জলের ঢেউ ঢেকেছে নামধাম। ['এক নদী', *সোনালী কাবিন*]

পুঁজিকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় পৃথিবীতে কোনো দেশ বা স্থানের স্থবির রূপ দীর্ঘস্থায়ী নয়– বিশ্বব্যবস্থারই অনিবার্য সঞ্চালনে পরিবর্তনের হাওয়া এসে সর্বত্র লাগে। আল মাহমুদ এই সত্যকে কাব্যিকভাবে আত্মস্থ ও সম্প্রচার করেছেন।

---

[১১] আল মাহমুদ,'আমি, আমার সময় এবং আমার কবিতা', *স্বল্পদৈর্ঘ্য*, আল মাহমুদ সংখ্যা, ২০০১, পৃ. ২২।

প্রতিবাদী ও বিতর্কিত ভূমিকা

আল মাহমুদ তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নিষ্পেষণ, সামরিক শাসকের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছেন। সামরিক বাহিনীর নিপীড়ক ভূমিকা তাঁর চেতনায় স্পষ্টতই ঘৃণার অনুভূতি জাগ্রত করেছে। অবিচার আর অত্যাচারকে রুখে দিতে তিনি নির্দ্বিধায় আহ্বান জানিয়েছেন :

ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!
শুয়োর মুখো ট্রাক আসবে
দুয়োর বেঁধে রাখ।
কেন বাঁধবো দোর জানালা
তুলবো কেন খিল?
আসাদ গেছে মিছিল নিয়ে
ফিরবে সে মিছিল।
ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!
ট্রাকের মুখে আগুন দিতে
মতিয়ুরকে ডাক।
কোথায় পাবো মতিয়ুরকে
ঘুমিয়ে আছে সে।
তোরাই তবে সোনামানিক
আগুন জ্বেলে দে। ['ঊনসত্তরের ছড়া-১', *পাখীর কাছে ফুলের কাছে*]

প্রাণী হিসেবে শুয়োর বাংলাদেশের জনগণের কাছে প্রিয় নয়। ঘৃণাসঞ্চালক প্রাণী শুয়োরের মুখের সঙ্গে চেতনাগত সাদৃশ্যে সামরিক বাহিনীর ট্রাক একাকার হয়ে গেছে। মাহমুদ অপূর্ব দক্ষতার নিপীড়ক শ্রেণীর প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা ও প্রতিরোধ স্পৃহাকে কবিতায় বিধৃত করেছেন।

স্বাধীনতা-পূর্বকালে সামরিক শাসকবিরোধী কবিতা লিখলেও স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আল মাহমুদের বিতর্কিত ভূমিকা স্মরণীয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনিই সামরিক জান্তাদের সঙ্গে সখ্য সূত্রে আবদ্ধ হন। অবশ্য সামরিক জান্তাদের সাথে তার সম্পর্ককে তিনি ন্যায়সঙ্গত বলেই বিবেচনা করেন। স্বাধীনতা পূর্বকালে আল মাহমুদ লিখেছিলেন :

মাৎস্যন্যায়ে সায় নেই, আমি কৌম সমাজের লোক
সরল সাম্যের ধ্বনি তুলি নারী তোমার নগরে,
কোনো সামন্তের নামে কোনদিন রচিনি শোলোক
শোষকের খাড়া ঝোলে এই নগ্ন মস্তকের' পরে।
পূর্ব পুরুষেরা কবে ছিলো কোন সম্রাটের দাস
বিবেক বিক্রয় করে বানাতেন বাক্যের খোয়াড়,
সেই অপবাদে আজও ফুঁসে ওঠে বঙ্গের বাতাস।
মুখ ঢাকে আলাওল-রোসাঙ্গের অশ্বের সোয়ার।
এর চেয়ে ভালো নয় হয়ে যাওয়া দরিদ্র বাউল?
['সোনালী কাবিন', *সোনালী কাবিন*]

এই কবিতায় কবির দৃষ্টিভঙ্গিটি এরকম–কবি কৌম সমাজের লোক, বিবেক বিক্রয়ে আগ্রহী নন, কোনো সামন্তের নামে কখনোই রচনা করবেন না কবিতা। এরচে' তিনি দরিদ্র বাউল হতেই বেশি পছন্দ করবেন। কিন্তু আল মাহমুদের জীবন সাক্ষ্য দেয় তিনি পূর্বোক্ত অঙ্গীকার রক্ষা করেন নি। সামরিক শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেছেন কবিতার ক্ষেত্রে। তাঁর বিরুদ্ধে সুবিধা গ্রহণের অভিযোগও উঠেছে। তিনি সুবিধাবাদিতার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন : 'আমি শপথ করে

বলতে পারি, ব্যক্তিস্বার্থে আমার কবি-প্রতিভাকে, আমার সাংবাদিক-জীবনকে আমি বিক্রি বা ব্যবহার করিনি।'[১২]

তবে কবি কবিতার প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণের বিষয়টিকে অস্বীকার করেননি। যে কবি কোনো সামন্ত শাসকের জন্য কবিতা লিখবেন না বলে অঙ্গীকার করেছিলেন তাঁর কাছে মনে হলো, সামরিক জান্তা কবলিত বঙ্গভবনে কবিতা পাঠ করতে যাওয়া জনগণেরই বিজয় : 'আমার বক্তব্য হলো, এই যে বঙ্গভবনে কবিতা পড়তে যাওয়া, এটা কার বিজয়? চিন্তা করুন। বঙ্গভবনে বিভিন্ন দিবসে আমরা কবিতা পড়তে যাই। এটা এক অর্থে বাংলা কবিতার বিজয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও কবিতাকে সম্মানিত করা হয়েছে। এটা আমরা করে দিয়েছি।'[১৩]

আল মাহমুদের এই দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিশ্বাসের পরিবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে।

রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিশ্বাসের বিবর্তন

সাহিত্যজীবনের শুরুর দিকে আল মাহমুদ মার্কসবাদী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন : 'অস্বীকার করবো না, মার্কসীয় দর্শনের মধ্যেই তখন আমি বাস্তব এ বস্তুজগতের সমস্ত প্রশ্নের সমাধান আছে বলে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকি এবং রাজনৈতিকভাবে কম্যুনিজমকে অঙ্গীকার করি।'[১৪]

তাঁর বাল্যকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মার্কসপন্থীদের পরিচালনায় গড়ে ওঠে লালমোহন পাঠাগার। এই পাঠাগারেই তিনি পাঠ করেন মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা 'ছোটদের রাজনীতি', 'ছোটদের অর্থনীতি', 'ইতিহাসের ধারা', ডারউইনের বিবর্তন বিষয়ক গ্রন্থাবলী। এসব বই পড়ে আল মাহমুদ নাস্তিকের পথে পা বাড়ান : 'আলার ভয় বুক খালি করে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। না সম্ভবত এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। না, আলার ভয় হয়তো আমাকে একেবারেই পরিত্যাগ করে যায়নি। বরং অন্তরের অন্তস্থলে আমার ইসলাম প্রচারক পূর্ব-পুরুষদের দোয়ার বরকতে কোথাও সামান্য অবশিষ্ট ছিল। যার জন্য আবার আমার পক্ষে প্রত্যাবর্তনের একটি সোজা পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়া সম্ভব হয়েছে।'[১৫]

মার্কসবাদী চিন্তাচেতনা তথা শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন তাঁর কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। তবে তিনি প্রচলিত অর্থে মার্কসবাদী কখনোই ছিলেন না। আল মাহমুদের স্বীকারোক্তি : 'মুখে মার্কসবাদের কথা বলছি, কিন্তু কবিতা লিখেছি রোমান্টিক। এই দ্বন্দ্ব সারাজীবন কাজ করছে। এটার কারণ আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না। আমি মার্কসবাদ পরিত্যাগ করেছি বহু পরে।'[১৬]

১৯৭৪ সালে আল মাহমুদ যখন রাজনৈতিক দল জাসদ সমর্থিত 'দৈনিক গণকণ্ঠে'র সম্পাদক তখন- তৎকালীন সরকারের নির্দেশে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আল মাহমুদের মন ও মননে সেই সময় সৃষ্টি হয় দার্শনিক পরিবর্তন। আল মাহমুদ মার্কসবাদী দর্শন পরিত্যাগ করে ধর্মকেন্দ্রিক জীবনদর্শনে নিমগ্ন হন। এ সময়ের কথা তিনি বিবৃত করেন এভাবে : 'এদেশে একটা র‍্যাডিক্যাল সংবাদপত্র সম্পাদনা করতে গেলে যা হয় আমার ভাগ্যেও তাই ঘটলো। অর্থাৎ বিনা কারণে আমার জেল হয়ে গেল। আমি এক বছর বিনা বিচারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকার সময় হঠাৎ আমার পিতার আদেশ পালনের সুযোগ পাই। অর্থাৎ একখণ্ড পবিত্র কুরআন আমার স্ত্রী

---

[১২] আল মাহমুদ, *কবির আত্মবিশ্বাস* (ঢাকা : শিল্পতরু প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ. ৬৮।

[১৩] আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎকার গ্রহণে:সালাহউদ্দিন বাবর),*স্বল্পদৈর্ঘ্য*, আল মাহমুদ সংখ্যা ২, পৃ. ৭৩।

[১৪] আল মাহমুদ, *কবির আত্মবিশ্বাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০-৮১।

[১৫] আল মাহমুদ, *যেভাবে বেড়ে উঠি* (ঢাকা : অঙ্গীকার প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ১০১।

[১৬] আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎকার গ্রহণে : সালাউদ্দিন বাবর, আযম মীর ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু), *স্বল্পদৈর্ঘ্য* আল মাহমুদ সংখ্যা ২, পৃ. ৭১।

আমাকে জেলখানায় দিয়ে এলে আমি তা অর্থসহ আদ্যপান্ত পাঠ করা শুরু করি। আর প্রথম পাঠেই আমার শরীর কেঁপে ওঠে। এর আগে কোনো গ্রন্থ পাঠে আমার মধ্যে এমন ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়নি। যেন এক অলৌকিক নির্দেশে আমার মস্তক মাটিতে গুটিয়ে পড়ে।'[১৭]

মার্কসবাদী রোমান্টিক চিন্তাধারার প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে আল মাহমুদ কোরআনকেন্দ্রিক ইসলামি জীবনদর্শনে আস্থাশীল হলে এই বিশ্বাস ব্যাপকভাবে তাঁর কাব্যভাবনাকে পরিবর্তিত করে। 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' কাব্যগ্রন্থ থেকে শুরু হয় আল মাহমুদের ধর্ম-কেন্দ্রিক কাব্যবোধের সম্প্রচার। 'সোনালী কাবিন' পর্যায়ে তিনি লিখেছিলেন :

কিছুই থাকে না কেন? কারোগেট, ছন কিংবা মাটির দেয়াল
গাঁয়ের অক্ষয় বট উপড়ে যায় চাটগাঁর দারুণ তুফানে
চিড় খায় পলেস্তারা, বিশ্বাসের মতন বিশাল
হুড়মুড় শব্দে অবশেষে।
ধসে পড়ে আমাদের পাড়ার মসজিদ!
['বাতাসের ফেনা', *সোনালী কাবিন*]

'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' কাব্যগ্রন্থে দেখা যাচ্ছে ধসে পড়া পাড়ার মসজিদটির গম্বুজ ইঙ্গিতময় আবহে সমুন্নত :

তবু আমার মনে হলো, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কাত হয়ে পড়া
গম্বুজটিই বুঝিবা খানিকটা উঁচু হয়ে আছে।
['মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো', *মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো*]

'সোনালী কাবিন' গ্রন্থে যে মসজিদটিকে কবি ভেঙ্গে পড়তে দেখেছিলেন চেতনাগত পরিবর্তনের কারণে আবার তাঁর কাছে মনে হলো মসজিদের গম্বুজটি 'খানিকটা উঁচু' হয়ে আছে। বিশ্বাসের পরিবর্তন এভাবে মাহমুদের চিন্তন প্রক্রিয়া ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দিয়েছে।

কবিতা লেখার প্রারম্ভিক পর্বে আল মাহমুদ সমাজতান্ত্রিক বিপবের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে লিখেছেন :

শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতের উঠিয়েছে হাত
হিয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
তাদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।
আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ।
['সোনালী কাবিন ১০', *সোনালী কাবিন*]

বিশ্বাস ও অবস্থান বদলে যাবার পর আল মাহমুদকে লিখতে হয় :

মাঝে মাঝে হৃদয় যুদ্ধের জন্য হাহাকার করে ওঠে
মনে হয় রক্তই সমাধান, বারুদই অন্তিম তৃপ্তি;
আমি তখন স্বপ্নের ভেতর জেহাদ, জেহাদ বলে জেগে উঠি।
... ...
আজ আবার হৃদয়ে কেবল যুদ্ধের দামামা
মনে হয় রক্তেই ফয়সালা।
বারুদই বিচারক। আর
স্বপ্নের ভেতর জেহাদ বলে জেগে ওঠা।
['বখতিয়ারের ঘোড়া', *বখতিয়ারের ঘোড়া*]

---

[১৭] আল মাহমুদ, *কবির আত্মবিশ্বাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

আল মাহমুদ প্রচলিত শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন চান। তিনি ঘোষণা করেন : 'ইসলামকে আমি গ্রহণ করেছি আমার জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হিসাবে।'[১৮] রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান হিসেবে ইসলামই তাঁর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য। প্রবল আগ্রহে তিনি একজন ইমামের খোঁজ করেন :

চলো অপেক্ষা করি সেই ইমামের
যিনি নীল মসজিদের মিনার থেকে নেমে আসবেন
মেশকের সুরভি ছড়িয়ে পড়বে
পৃথিবীর দুঃসহ বস্তিতে।

['নীল মসজিদের ইমাম', *বখতিয়ারের ঘোড়া*]

ইসলাম ধর্মের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক দুটো দিকেই আল মাহমুদের পরম আনুগত্য লক্ষণীয়। বাংলাদেশে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে আগ্রহী রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি সামাজিক সম্পর্কে ও সখ্যসূত্রে জড়িত। ইসলামের আধ্যাত্মিক স্পর্শে তিনি প্রশান্তি অনুভব করতে চান। হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এ কারণেই তার অকুণ্ঠ আকর্ষণ :

মোহাম্মদ – এ নামেই বাতাস বয়,
মোহাম্মদ – এই শব্দে জুড়ায় দেহ,
মোহাম্মদ – এই প্রেমেই আলা খুশী,
দোজখ বুঝি বা নিভে যায় এই নামে।

['নাত', *বখতিয়ারের ঘোড়া*]

আল মাহমুদের রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিশ্বাসের বিকাশ অবলোকন করে এ কথা বলা সম্ভব যে তাঁর মধ্যে পরস্পরবিরোধী বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আল মাহমুদ চরম আবেগপন্থী হৃদয় শাসিত এক কবি। মার্কসবাদ বা ধর্ম তার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা করেছে সত্য কিন্তু তাঁর কবিতা মার্কসবাদ বা ধর্মের বিধিব্যবস্থার নিষেধাজ্ঞায় প্রবলভাবে শৃংখলিত হয়ে নস্যাৎ হয়ে যায়নি। আমাদের কাছে মনে হয়েছে– মাহমুদ জীবনের প্রথম পর্যায়ে মার্কসবাদী ও দ্বিতীয় পর্বে ধর্মীয় বিশ্বাসকে কবিতার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পেরেছেন। উদাহরণ হিসেবে 'যৌনতার' কথা বলা যায়। একজন 'শরীয়তপন্থী' কবির পক্ষে যৌনতার প্রশ্নে নিষ্ক্রিয় থাকাটাই যেখানে স্বাভাবিক সেখানে আল মাহমুদ থেকেছেন সরব ও সক্রিয়। এ কারণেই তিনি বলতে পেরেছেন : 'আমি অজু করে সাহিত্য রচনা করি না।'

উপসংহার

প্রকৃতঅর্থে, আল মাহমুদের জীবন বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ, জীবনবোধ পরস্পরবিরোধী চিন্তা-চেতনায় আকীর্ণ। জীবিকার সংগ্রামে জর্জরিত মানুষ হিসেবে তিনি কাটিয়েছেন জীবনের একটি বিশাল সময়। বলা আবশ্যক এই জর্জরিত কালেই তিনি রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন শিল্পগুণসম্পন্ন অসংখ্য কবিতা। তাঁর জীবনে দুইবার মতবাদ-বদল ঘটেছে। এই আদর্শ পরিবর্তনের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর পরিবারের বিশ্বাসগত প্রভাব, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের জাগতিক প্রয়োজন, পেশা ও পরিবেশগত নানা বাস্তবতা। জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত অলৌকিক সত্তার দ্বারস্থ হয়েছেন, কিন্তু শিল্প ক্ষেত্রে রেখে চলেছেন সামর্থ্যের পরিচয়। এ কারণেই দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে আল মাহমুদকে নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একজন বড় কবি হিসেবে সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি যথাযথ স্থান পাবেন—একথা নিদ্বিধায় বলা যায়।

---

[১৮] আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎকার গ্রহণে : আমিনুল ইসলাম নজির), *স্বল্পদৈর্ঘ্য* আল মাহমুদ সংখ্যা ২, প্রাগুক্ত পৃ. ৯।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প : দুর্ভিক্ষের চিত্র

গৌতম কুমার দাস*

Abstract: Manik Bandyopadhyay is considered one of the leading writers of Bangladesh. His short stories are packed with the description of the life and society of Bangladesh. Thus many of his short stories delineate the grim picture of the famine of 1943 (1350 Bengali year), which killed hundreds and thousands of lives and forced people to leave their home in search of food. Manik portrays the chaos and disorder that prevailed during the famine. He seems to indicate that the famine was largely a manmade crisis—the suffering of the people being caused by money-mongering industrialist, merchants, and black marketers. Thus his sense of history has been coupled with his wider humanitarian outlook. Therefore, this study intends to analyze Manik Bandyopadhyay`s short stories with a view to identifying his outlook regarding the deadly famine.

এক

দুর্ভিক্ষকে আশ্রয় করে যে কয়জন গল্পকার গল্প রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-'৫৬) অন্যতম। তিনি দুর্ভিক্ষ নিয়ে বেশ কয়েকটি ছোটগল্প রচনা করেন। তাঁর দুর্ভিক্ষ আশ্রয়ী গল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—*আজকালপরশুর গল্প* গ্রন্থের 'আজকালপরশুর গল্প', 'দুঃশাসনীয়', 'নমুনা', 'গোপাল শাসমল', 'বেড়া', 'তারপর ?', 'রাঘব মালাকার', 'কৃপাময় সামন্ত', 'নেড়ী', *পরিস্থিতি* গল্পগ্রন্থের 'সাড়ে সাত সের চাল', 'প্রাণ', 'রাসের মেলা', 'মাসিপিসি', 'অমানুষিক', 'পেটব্যথা', *খতিয়ান* গল্পগ্রন্থের 'কানাই তাঁতি', 'ছিনিয়ে খায়নি কেন'। তাঁর এসব গল্পে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের অসহায় অবস্থা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মানিকের যুদ্ধ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা অনেক গল্পে সামান্য অন্ন ও বস্ত্রের জন্যে দারিদ্র্য জর্জরিত মানুষের করুণ হাহাকার প্রাণবন্ত ভাষারূপ পেয়েছে।[১] একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ মানুষ দুর্ভিক্ষ-সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।[২] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নানা দিক থেকে মহামন্বন্তরের দ্রষ্টা, সাক্ষী ছিলেন বলেই মন্বন্তরজনিত অবক্ষয়কে যথাযথ শিল্পের মমতায় ও শিল্পীর নিরাসক্ত-চিত্ততায় আঁকতে সক্ষম হয়েছেন।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

[১] গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮), পৃ. ১৩৮।

[২] মীরা ঘোষ, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য (১৯৩৯-৪৫)* (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৮৪), পৃ. ৯৭।

দুই

বাংলা ১১৭৬ এবং ১৩৫০ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের ঘটনা ঘটে। এই দুটি দুর্ভিক্ষে বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি হয়। ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের দেড় কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়।[৩] শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলের মানুষই বেশি মারা যায়। শহরে লঙ্গরখানা খোলা হয় এবং রেশনের ব্যবস্থা সেখানে চালু থাকায় সেখানকার মানুষের বিশেষ সমস্যা হয় না। কিন্তু গ্রামে এ সবের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় এবং গ্রামের জোতদার, সম্পন্ন গৃহস্থ, অসৎ ব্যবসায়ী, চোরাকারবারি, নারী ব্যবসায়ী, মহাজন, ঠিকাদার দুর্ভিক্ষের সময় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে এগিয়ে না এসে দরিদ্র কৃষক-কামার-কুমার-জেলে-তাঁতিদের ভিটেমাটি দখল করে নেওয়ায় গ্রামের মানুষ শহরে পালিয়ে গিয়েও রক্ষা পায় না। কলকাতা শহর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষের নির্মম ও ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করেন।[৪] সমালোচকের ভাষায়:

> মন্বন্তর বাঙালি জীবনে সৃষ্টি করে এক চরম অভিশাপ, দুরারোগ্য ক্ষত। কেবল ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য মানুষের প্রাণপণ প্রয়াস, শুধু খাদ্যের জন্য জীবনব্যাপী আহৃত সমস্ত সম্পদ ব্যয় শেষে নিঃস্ব হওয়া, স্নেহ-মায়া-মমতা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে কেবল আত্মরক্ষার চিন্তা, একদিকে মৃত্যু ও অন্যদিকে গৃহত্যাগপূর্বক শহরমুখী হওয়ার ফলে গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য বিরাণভূমিতে রূপান্তর, নারীর যৌবনভোগে বিত্তবানদের ব্যাপক সুযোগ, কলকাতা শহরে অনাহারী মানুষের বাঁধভাঙ্গা ঢল, গৃহে গৃহে পথে পথে ডাস্টবিনে লঙ্গরখানায় শুধু খাদ্যান্বেষণে ছুটে চলা, কালোবাজারি ও চোরাকারবারি ব্যবসায় অমানুষিক জুলুম, গৃহে-পথে-প্রান্তরে সর্বত্র অনাহারী মানুষের মৃতদেহ প্রভৃতি বৃহৎ বঙ্গের দুর্ভিক্ষকালীন এক অবর্ণনীয় দুর্দশার চিত্র। মানবজীবন ও সভ্যতার এমন সীমাহীন অবমাননার ঘটনা বাঙালির ইতিহাসে খুব বেশি ঘটে নি। একদিকে খাদ্যাভাবে মানুষের মৃত্যু, মানবেতর জীবনাচার, বংশ পরম্পরার আবাসত্যাগ, নারীর সম্ভ্রমহানি, অপরদিকে মুনাফালাভের পৈশাচিকতা—এই ছিল মন্বন্তরের স্বাভাবিক রূপ।[৫]

তিন

আজকাল পরশুর গল্প (১৯৪৬) সংকলন-এর গল্পগুলিতে দুর্ভিক্ষকালীন মহামারী ও আকালের চিত্র বর্তমান। দারিদ্র্যপীড়িত তথাকথিত পতিত মানুষের নিদারুণ অসহায়তা-ই গল্পগুলিকে অদ্ভুত বাস্তবঘন রূপদান করেছে। একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাল বেড়েছে, অন্যদিকে সস্তা হয়ে গেছে পতিত মানুষ। এই তথাকথিত পতিত সমাজে নারী স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মর্যাদা

---

[৩] পলগ্রীনো, *আধুনিক বাংলা সমৃদ্ধি ও দারিদ্র দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-৪৪* (অনুবাদ শুভেন্দু দাশগুপ্ত ও অন্যান্য), (কলকাতা: কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পনী, ১৯৯৭), পৃ. সাত।

[৪] দুর্ভিক্ষ ছিল যুদ্ধেরই ফল। এই দুর্ভিক্ষের ফলে গ্রাম বাঙলার মানুষের জীবন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। এই দুর্ভিক্ষের সময় মানিক বাঙলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষী দরিদ্রের না খেয়ে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে এসে অতি দুঃখে (তাঁর বৌদিকে) বলেছিলেন, দুশো বছরের পরাধীনতায় বাঙলার মেরুদণ্ড গেছে ভেঙে। গরীবগুলোকে কত বললাম, না খেয়ে শেয়াল-কুকুরের মতো রাস্তাঘাটে মরে পড়ে না থেকে তোরা একবার উঠে দাঁড়া। সরকারের তালাবন্ধ খাদ্যের গুদামগুলো লুঠ করে একদিনও পেটপুরে খেয়ে বাঁচি—তারপর না হয় জেল খাটবি, কিন্তু ব্যাটাদের কি সাহস আছে। সরোজমোহন মিত্র, ***মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*** (কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রা. লি., ১৯৯৯), পৃ. ১৮২।

[৫] সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ২৭৯-৮০।

হারায়। স্বভাবত, অবহেলিত পতিত সমাজের মেয়েরা পুরুষশাসিত সমাজে চরম নির্যাতন ভোগ করে।[৬]

'আজকাল পরশুর গল্পে' মানসুকিয়া গ্রামের দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের সময় রামপদ স্ত্রী-সন্তানকে ফেলে শহরে যায় কোনো কাজের আশায়। খাদ্যাভাবে তার সাতমাসের ছেলেটি মারা যায়। রামপদর অনুপস্থিতির সুযোগে তার স্ত্রী মুক্তাকে খাদ্যের প্রলোভন দেখিয়ে ভোগ করতে চায় ঐ গ্রামের সমাজপতি ও চালের চোরাকারবারি ঘনশ্যাম দাস। একদিকে খাদ্যাভাব অন্যদিকে ঘনশ্যামের লালসার হাত থেকে বাঁচার জন্য মুক্তা গ্রাম ছেড়ে শহরে যায় এবং দেহব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। দত্তবাবুর মতো একশ্রেণীর অসৎ ব্যবসায়ী মানুষের অসহায়তার সুযোগে অধিক অর্থ-উপার্জনের লক্ষ্যে গ্রামের কুলবধূ ও নারীদের দেহব্যবসায়ের কাজে নিযুক্ত করে। দুর্ভিক্ষ পরবর্তীকালে সমাজকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ এসব নারীদের সংসারজীবনে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে। সমাজকর্মীই মুক্তাকে উদ্ধার করে স্বামীগৃহে পৌঁছে দেয়। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর মুক্তা স্বামীকে তার দুঃখ-দুর্দশার ইতিহাস তুলে ধরেছে :

> খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে। মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা নেই। চাল গুঁড়িয়ে বার্লি মতন করে দিলাম কদিন। চাল ফুরলে কি দিই। না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেদ্ধ খেতাম, তাই দিলাম, করি কি ! তাতেই শেষ হল। ...
> শেষ দুটো দিন যা করলে গো পেটের যন্ত্রণায়, দুমড়ে মুচড়ে ধনুকের মতো বেঁকে। ... দাস মশায় দুধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেতে পরতে। তখন কি জানি মোর অদেষ্টে এই আছে ? জানলে পরে রাজী হতাম, বাচ্চাটা তো বাঁচতো। মরণ মোর হলই, সেও মরল। ...
> খোকন মরল, তোমার কোন পাত্তা নেই। দাসমশায় রোজ পাঠাচ্ছে নেড়ীর মাকে। দিন গেলে একমুঠো খেতে পাই নে। এক রাতে দুটো মদ্দ এলে, কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতটুকুর জন্যে। দিশেমিশে ঠিক রইল না আর, গেলাম সদরে চলে।[৭]

দীর্ঘ এগারমাস পর স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সমাজপতি ও তার অনুসারীরা মুক্তার নামে নানা রকম কুৎসা কটূক্তি করে। রামপদরই ফিরিয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল মুক্তাকে। কিন্তু এ অঞ্চলের চাষাভুষোদেও (অর্থাৎ-চাষি-গয়লা-কামার-কুমোর-তেলি-ঘরামি-জেলে প্রভৃতির) সমাজপতি একরকম ঘনশ্যাম এবং তার অনুসারী কানাই, নিধু, লোচন, বিধু, মধুদের শাসন এবং তাদের টিটকারি, গঞ্জনা, মারধোরসহ গৃহে অগ্নিসংযোগের ভয়ে চিন্তিত হয়ে রামপদ স্ত্রীকে নিয়ে আসতে সাহস পায় না। তবে গ্রামের দুর্ভিক্ষ কবলিত সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই। কারণ, 'না খেয়ে রোগে ভুগে কত মানুষ মরে গেল, কতমানুষ কত পরিবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কোন বাড়ীর দশ জন কোথায় গিয়ে ফিরে এল মোটে দু'জন ধুঁকতে ধুঁকতে, কত মেয়ে-বৌ চালান হয়ে গেল কোথায়, এমনি সব কাণ্ডের মধ্যে কার বৌ কোথায় ক'মাস নষ্টামি করে ফিরে এসেছে, এ কি আবার একটা গণ্য করার মতো ঘটনা ? এ যেন প্রলয়ের সময় কে কার ডোবার জল নোংরা করছে তাই নিয়ে ব্যস্ত হওয়া।'[৮] তারপও ঘনশ্যামেরা কয়জন মুক্তার ব্যাপারে বিচার সভা আহ্বান করে। 'বিচার-সভায় লোক খুব বেশি হল না, মানসুকিয়ার ঘেঁষাঘেঁষি পাঁচ-ছটা গাঁ ধরলে লোক কমেই গেছে দেশে। রোগে শয্যাশায়ী হয়ে আছে বহুলোক। অনেকে আসতে পারেনি, অনেকে

---

[৬] সুবোধ দেবসেন, *বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ (১৯২৩-৪৭)* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯), পৃ. ২৬৫।

[৭] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,'আজকাল পরশুর গল্প', *মানিক গ্রন্থাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রা.লি., ১৯৮৯), পৃ. ২৬৬-২৬৭।

[৮] *তদেব*, পৃ.২৬৬।

ইচ্ছা করে আসেনি। সমাবেশটাও কেমন ঝিমধরা নিরুত্তেজ, প্রাণহীন। ক্ষীণ শীর্ণ অবসন্ন সব দেহগুলি চোখে উদ্দেশ্যহীন ফাঁকা চাউনি। সভার বাকগুঞ্জনও স্তিমিত। কথা কইতে ভাল লাগার দিন যেন নেই। বছর দুয়েক আড়াই আগে, ঘনশ্যামের এই সদর দাওয়া আর সামনের ফাঁকা জমিতে শেষ সামাজিক বিচার সভা বসেছিল এই চাষাভুষো শ্রেণীর, পদ্মলোচনের বোনের ব্যাপার নিয়ে। কি চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা ছিল সে জমায়েতে, মানুষের কলরবে গম গম করছিল। কি ঔৎসুক্য ফুটেছিল সকলের মুখে এক বিবাহিত নারীর কলঙ্কের আলোচনা আরম্ভ হওয়ার প্রতীক্ষায়। তার তুলনায় এ যেন সরকারি জমায়েত ডাকা হয়েছে বর্তমান অবস্থায় গ্রামবাসীদের কি করা উচিত বুঝিয়ে দিতে।'[৯] দুর্ভিক্ষ মানুষকে এমনই বিপর্যস্ত করেছে যার ফলে নারীঘটিত কোনো মুখরোচক ব্যাপারেও তারা নিরুৎসাহিত। পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের দুরবস্থার চিত্র বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

> যে অভাবে চাষী রামপদ অনির্দিষ্টকালের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যায় স্ত্রী এবং শিশুকে ফেলে; সেই অভাবেই রামপদর বউ মুক্তা চলে যায় শহরে। কিন্তু রামপদ ফিরে এলে সমাজ কোনো প্রশ্ন তোলে না; মুক্তা ফিরতে চাইলে সমাজ-শাসকেরা নিষেধের তর্জনী তোলে।[১০]

দুর্ভিক্ষের কারণে গ্রামের বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে, আর যারা জীবিত আছে তারাও মৃতপ্রায়। কাজেই ঘনশ্যামের আয়োজিত বিচার-সভায় থাকেনা কোনো প্রাণচাঞ্চল্য। বনমালী, করালী, গিরি ও রামপদর প্রতিবাদের মুখে ঘনশ্যামেরা টিকতে পারে না। করালীর মন্তব্য : 'গাঁয়ে খেতে পায়নি, সোয়ামি কাছে নেই, তাই সদরে খেটে খেতে গেছে।'[১১] এতে মুক্তার কোনো দোষ নেই। গ্রামের কেউ যেহেতু তাকে বিপদের সময় কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করেনি সে হিসেবে সে শহরে গিয়েও যে বেঁচে আছে সেটাই বড় কথা। বনমালীও গিরি করালীর এ মন্তব্যকে মেনে নেয়। ঘনশ্যাম গিরির পিতাকে নিরুদ্দেশ করে গিরিকে রক্ষিতা হিসেবে রাখে শহরে। অন্যদিকে 'বনমালীর বৌকে সদরের দত্তবাবু ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘর ছাড়িয়ে চালান দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য। প্রথমে সদরে রেখেছিল বৌটাকে, বনমালী হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে তাকে যখন প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছিল তখন আবার তাড়াতাড়ি কোথায় চালান করে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও বনমালী আর হদিস পায়নি। এখনো সে মাঝে মাঝে সদরে গিয়ে সন্ধান করে।'[১২] মহামারীতে লক্ষ লক্ষ দৈহিক মৃত্যু ঘটানোর মতো লোকে যদি তার বৌয়ের নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়েই থাকে তারপরও বৌকে ফেরত পেতে চায় সে। দুর্ভিক্ষের মতো মহামারীর করাল গ্রাস থেকে বাঁচার পরে গ্রামের মানুষ হয়ে ওঠে ভয়শূন্য ও সচেতন। মানুষের সংস্কারবোধ লোপ পায়। মানসুকিয়ার বেলতলায় বছরখানেক আগে যে ভুতের ভয় ছিল তা থাকে না। দুর্ভিক্ষের পরে 'মানুষ অন্ধ কুসংস্কারকে ত্যাগ করে শুধু মানুষ হয়ে বাঁচতে চেয়েছে, শোষণের বিরোধিতা করে।'[১৩]

> দুর্ভিক্ষে মন্বন্তরে হতবল মানুষ আবার নতুন উদ্যমে জেগে উঠেছে এই বলিষ্ট সুরই আজকাল পরশুর গল্পের বড় কথা। গল্পের আঙ্গিকও লক্ষণীয়। রামপদর বৌ মুক্তার ঘরে ফিরে আসা নিয়ে গল্পের শুরু হলেও মুক্তাকে দিয়েই গল্পের শেষ হয় নি। শেষ হয়েছে মুক্তা-গিরির মতো নির্যাতিতা মেয়েদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যে, অন্যায় আর ভীরুতার বিরুদ্ধে বলিষ্ট প্রাণের সঙ্গবদ্ধ উত্থানের মধ্যে। ভুতের ভয়ের দিন শেষে হয়েছে, শুরু হয়েছে প্রতিবাদী মানুষের উত্থান।[১৪]

---

[৯] *তদেব*, পৃ. ২৭০।

[১০] সুমিতা চক্রবর্তী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প : মধ্যবিত্তের আত্মদর্পণ, ছোটগল্পের বিষয় আশয়* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪), পৃ. ১৯৫।

[১১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আজকালপরশুর গল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১।

[১২] *তদেব।*

[১৩] ভাস্বতী লাহিড়ী, *সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প (১৯৪০-৫০)* (কলকাতা: শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯১), পৃ. ৬৮।

[১৪] সরোজমোহন মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮২।

যে কোনো দুর্ভিক্ষে গ্রামের মানুষই বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের বহুমানুষ মারা যায় অনাহারে। অসহায় মানুষ দুর্ভিক্ষের সময় শুধু অনুভব করে দুমুঠো অন্ন খেয়ে বেঁচে থাকার দুরন্ত তাগিদ। এ সময় সহজেই অন্ন মেলে নারীদেহের বিনিময়ে। অসৎ ব্যবসায়ী ও কালোবাজারি নারীদেহ ব্যবসায়ের নতুন পথ বের করে। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য সামান্য অন্নের বিনিময়ে বয়স্কা মেয়েদের বিক্রি করতে বাধ্য হয় নারী ব্যবসায়ীদের কাছে। 'নমুনা' গল্পে গ্রামের অনেকের মতো কেশব চক্রবর্তীও বেঁচে থাকার জন্য বিবাহযোগ্য কন্যা শৈলকে কিছু-খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে নারীব্যবসায়ী কালাচাঁদের কাছে। দুর্ভিক্ষের জন্য এরকম পরিস্থিতি:

> কেবল কেশবের নয়, এ রকম অবস্থা আরও অনেকের হয়েছে। অন্ন নেই কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দু'তিন গুণ। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও, যা দিয়ে খানকয়েক বস্তা কেনা যেতে পারে।[১৫]

কেশবের জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যু হয় তেতাল্লিশ টাকা বেতনে স্কুলে শিক্ষক হিসেবে চাকরিরত অবস্থায়। তার আর এক কন্যার মৃত্যু হয়েছে ম্যালেরিয়ায় ভেজাল ঔষধ সেবনে। একদিকে তার উপার্জনক্ষম পুত্রের মৃত্যু অন্যদিকে দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাব দেখা দিলে শৈলকে ক্রয়ের প্রস্তাব দেয় কালাচাঁদ।

> দুর্ভিক্ষে শহরে মেয়ের চাহিদা বাড়ায় এবং মফঃস্বলে মেয়ে সস্তা ও সুলভ হওয়ায় কালাচাঁদ এদিক ওদিক ঘুরেছে। দেশের গাঁয়ে এসে তার শৈলকে পছন্দ হয়ে গেল। শৈল অবশ্য তখন কঙ্কালসার, কিন্তু এ অবস্থায় এসে না পড়লে কি আর এসব ঘরের মেয়ে বাগানো যায় ? তাছাড়া উপোস দিয়ে কঙ্কাল হয়েছে, কিছুদিন ভাল খেতে দিলেই গায়ে মাংস উথলিয়ে উঠবে। শৈলকে সে আগেও দেখেছে। রূপ তার চলনসই হলেও কালাচাঁদের কিছু এসে যায় না। প্রতি সন্ধ্যায় রূপসৃষ্টি করে দিলেই চলবে। প্রথম কিছুদিন অন্যে তৈরী করে দেবার পর শৈল নিজেই শিখে ফেলবে পথিকের চোখভুলান রূপসৃষ্টির স্থূল রঙিন ফুলেল কায়দা।[১৬]

কেশব কালাচাঁদের নারীমেধ আশ্রমিক ব্যবসা সম্পর্কে জ্ঞাত। কেশব এও জানে যে 'এ গাঁয়ের রাখালের বোন আর দিনেশের মেয়ে এভাবে বিক্রী হয়েছিল। কালাচাঁদের কাছে নয়, অন্য দুজন ভিন্ন লোকের কাছে। তবু তো শেষপর্যন্ত রাখাল বাঁচতে পারেনি। ঘরে মরে পচে সে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। দীনেশ ও তার পরিবারের বাড়তি পড়তি মানুষ কটাকে নিয়ে কোথায় যেন পাড়ি দিয়েছে তার ঠিকানা নেই।'[১৭] কিন্তু তারা কেশবের মতো ব্রাহ্মণ বা ভদ্র নয়। কাজেই এ বিষয়ে কেশব চিন্তিত। দুর্ভিক্ষে মানুষের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়ে যায়। কেশব শৈলকে বিক্রি করে শুধু খাদ্যের জন্য। সে তার মৃত মেয়েটির কথাও ভেবেছে। 'শৈলর চেয়ে সে মেয়েটি ছোট ছিল মোটে বছর দেড়েকের। তার মুখখানাও ছিল শৈলর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। আজ তার বিনিময়ে অন্ন মিলতে পারত। কয়েক বস্তা অন্ন। নগদ টাকা ফাউ।'[১৮]

'খাদ্যাভাব, জীবনরক্ষার তাগিদ প্রভৃতি কেশবের পিতৃত্ব ও মনুষ্যত্বকে কী সীমাহীনভাবে বিপন্ন করে তুলেছে, গল্পের এ অংশটি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। পিতার দায়িত্ব মর্যাদা প্রভৃতি জঠরের ক্ষুধার কাছে সহজেই পরাজিত হয়। সকল মূল্যবোধ, নীতিবোধ ও ধর্মবোধকে ছাপিয়ে জীবনের সবচেয়ে

---

[১৫] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,' নমুনা', *মানিক গ্রন্থাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৯।
[১৬] *তদেব*, পৃ. ২৮।
[১৭] *তদেব*, পৃ. ২৮২।
[১৮] *তদেব*, পৃ. ২৮০।

আদিম ও শাশ্বত চাহিদা অর্থাৎ তার উদরপূর্তির আকাঙ্ক্ষাই একমাত্র সত্য হয়ে থাকে।'[১৯] বছরখানেক পূর্বে কেশব তার সাধ্যমতো 'নগদ গহনা জামাকাপড় আর তৈজসপত্র'সহ শৈলকে বিয়ে দেবার জন্য পাত্রের সন্ধান করেছিল। দুর্ভিক্ষের ফলে অন্ন যোগাতে গিয়ে সে হয়ে গেছে সর্বস্বান্ত। দুর্ভিক্ষ-শেষেও মেয়েকে বিয়ে দেবার সামর্থ্য তার নেই। তাই সে গৃহনারায়ণকে সাক্ষী রেখে বিয়ের মন্ত্র পাঠ করে কালাচাঁদের হাতে সমর্পণ করেছে শৈলকে। কালাচাঁদ শৈলকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু অর্থের কাছে পরাজিত হয় তার সদিচ্ছা। অন্যদিকে কালোবাজারে চাল বিক্রি করে বিপুল অর্থ উপার্জনকারী গজেন শৈলকে ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। আর একাজে সহযোগিতা করেছে মন্দোদরী। নারীব্যবসায়ীর কাছে কন্যা বিক্রির ঘটনায় দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্র যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমন কেশবের পরিবারের অসহায় অবস্থাও পরিস্ফুট হয়েছে।

চোরাকারবারি ও নারীব্যবসায়ীরা দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামে গ্রামে ঘুরে নারী সংগ্রহ করে দেহব্যবসায় নিযুক্ত করেছে। 'তারপর ?' গল্পেও এ চিত্র বর্তমান। কানখালি গ্রামের গিরিশের পুত্র গজেন শিশুকালে কুমীরের মুখ থেকে বেঁচে উঠলেও পরবর্তীকালে নারীব্যবসায়ীদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে। মাত্র পনের বছর বয়সেই সে বিমাতার বৈরী আচরণে দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মিশে যায়। পরপর কয়েকটি কেলেঙ্কারির পর গিরিশ তাকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করলেও ঘরপালানো ছেলের মতো সে অবস্থান করে গৃহেই। তবে 'মাঝে মাঝে দুচার দিনের জন্যে সে গাঁ ছেড়ে উধাও হয়ে যেত। এবার প্রায় ছ'মাস কোথায় গিয়ে কাটিয়ে এল তা কেউ জানে না। সবাই যখন ভাবতে আরম্ভ করেছে যে আরও অনেকের মতো সেও দুর্ভিক্ষের কবলে গেছে চিরদিনের মতো, তখন সে একদিন ফিরে এল। সাজপোষাকের তার উন্নতি দেখা গেল অদ্ভুত রকমের – সিল্কের পাঞ্জাবি, ফাইন ধুতি, চকমকে বার্ণিশ করা জুতো।'[২০]

গজেন কটিবাজারের অসৎ ব্যবসায়ী হারাধনের নারীব্যবসায়ের সহযোগী হিসেবে গ্রামের চাষী পরিবারের কন্যা-বধূদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের অভাবের সময়ে। দুর্ভিক্ষের কারণে হারাধনেরা গ্রাম থেকে অভাবগ্রস্ত নারীদের কাজের কথা বলে দেহ ব্যবসায় নিযুক্ত করে। অর্থ লোভে গজেন তার প্রণয়িনী হাবোকে এবং বিধবা ভাগ্নী রাসীকে পর্যন্ত হারাধনের আস্তানায় নিতে চায়। গ্রামের আরো দুতিনজন নারীকে প্রলোভন দেখিয়ে কটিবাজারে নেবার প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পরই সমস্যা সৃষ্টি হয়। নারী-সংঘের দুজন মহিলাকর্মী কটিবাজার থেকে বৈরাগী দাসের স্ত্রীকে উদ্ধার করে তাকে পুনবার্সিত করে এবং সেই সাথে নারীব্যবসায়ীদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিতে নিষেধ করে গ্রামবাসীকে। মহিলাকর্মীদের 'কথায় জীর্ণ শীর্ণ জ্বরগ্রস্ত বৌটাকে ক্ষমা' করে গ্রহণ করে বৈরাগী। তারা গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে নারীদের বুঝিয়েছে, কোনো লোকের কথায় ভুলে যেন তারা কোথাও না যায়। নারী-সংঘের কর্মীদের পরামর্শে সচেতন হয়ে ওঠে গ্রামের মানুষ। ঘোষপাড়ার ৪/৫ জন যুবক গজেনকে স্পষ্টভাবে হুমকি দিয়ে বলেছে যে,তাদের পাড়ায় সে প্রবেশ করলে তার হাত তারা ভেঙে দেবে। হাবোকে কটিবাজারে নিয়ে গিয়েছিল গজেন, হাবো গজেনের প্রতারণার শিকার হয়ে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করে।

'গোপাল শাসমল' গল্পেও দুর্ভিক্ষের চিত্র লক্ষণীয়। গোপাল কারাবাসের আগে গ্রামের যে চিত্র দেখে গিয়েছিল, কারাবাস শেষে এসে তার বিপরীত চিত্র দেখতে পায়। দুর্ভিক্ষে গ্রামের অন্যান্য দরিদ্র মানুষের মতো তার পরিবারের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র প্রত্যক্ষ করে সে ব্যথিত হয়।

> জেলে যাওয়ার সময় তার বাড়িতে ছিল মন পঁচিশেক ধান, দুটো বলদ, একটা গরু, পুঁইমাচা, লাউমাচা আর তিনটে সজনেগাছ। বাড়ি ফিরে দেখল, ধান মোটেই নেই, একটা বলদ নেই, পুঁই আর লাউ মাচায় নেই লাউ। ... গাঁ প্রায় উজার হয়ে গিয়েছে

---

[১৯] সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০১।

[২০] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,'*তারপর*', *মানিক গ্রন্থাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৪।

তার অনুপস্থিতির সময়টুকুর মধ্যে। বেঁচে যারা আছে তারাও জীবন্ত নয়। খুব বেশি জীবন্ত কোনদিনই ছিল না, কিন্তু যে-টুকু ছিল তাতেই দলাদলি, ঝগড়াঝাঁটি পূজাপার্বনে উৎসবে এমন কি সময় সময় মারামারি কাটাকাটিও করেছে গাঁয়ের লোক। আজ সকলে ধীর,স্থির,শান্ত সুবোধ মানুষের চোখে হতাশার পর্দা, চলনে হতাশার ভঙ্গি, কথায় হতাশার লম্বা টান, প্রতিটি মানুষ যেন—আর কেন, কি আর হবে, সব মায়া, মরা ভাল ইত্যাদির ক্ষীণ প্রাণবন্ত প্রতীক। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া আর প্যাঁচড়া। এমন ব্যাপক না হলেও অন্যরোগেরও ছড়াছড়ি। এমন প্যাঁচড়া গোপাল জীবনে কখনো দ্যাখে নি।[২১]

দুর্ভিক্ষের কারণে গোপালকে 'আধপেটা ভাত' দিয়ে তার মা-বোনকে অনাহারী থাকতে হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে মনে হয়েছে এর চেয়ে হয়তো তার জেলে থাকাই ছিল ভাল। এ গল্পেও জোতদার কানাই ও তার পুত্র শশী অসৎ উপায়ে ব্যবসায়ের মাধ্যমে আরো ধনী হয়ে ওঠে। তবে কানাই আর্থিক দিক থেকে ধনী হলেও সে অর্থপিশাচ নরপশুর পর্যায়ভুক্ত। তেমন কোনো কারণ ছাড়াই সে পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স্ক ভূষণকে কর্মচ্যুত করে। এ ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে ভূষণের পুত্রসহ তার বন্ধুদের কারাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে কানাই। নিজের সন্তানসম্ভবা মুমূর্ষু কন্যা সুধাময়ীকে চিকিৎসার পরিবর্তে ঝাড়ফুকের ব্যবস্থা করেছে। গোপালকে কানাই বলেছে :

সুধাময়ী এসেছে আজ। ... এসেছে মানে আমি আনাইনি—এয়েছে। এনে ফেলে দিয়ে গেছে আমার বাড়ী। বেয়াই বেটা, জানিস গোপাল বজ্জাতের ধাড়ী। ... পেটে তিনবার নাথি মেরেছে। নক্তে ভেসে যাচ্ছে পিথীমী। তাই ফেলে রেখে গেল হারামজাদার দল। এখন আমি ডাকব ডাকতার কবরেজ, টাকা খসাবো মুঠো মুঠো—মরবে জানি, তবুও সব করা চাই। কেন বাবা ? তিলে তিলে দগ্ধে মারা কেন বাপকে ? মরণ সংবাদ দিলেই হত একেবারে।[২২]

বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েও কন্যার চিকিৎসার ব্যাপারে সে চরম উদাসীন। সামান্য চালের বিনিময়ে সে ভূষণের কন্যা রতনের সম্ভ্রম ক্রয় করে। দুর্ভিক্ষের কারণে খাদ্যাভাবে রতনের মতো বহু নারী দেহ বিক্রি করে গ্রামের জোতদার ও চোরাকারবারিদের কাছে।

দুর্ভিক্ষের ফলে কিভাবে গ্রামের গৃহস্থ পরিবার বিপর্যস্ত হয়ে যায় তার বাস্তব চিত্র পরিবেশিত হয়েছে 'নেড়ী' গল্পে। উপার্জনক্ষম স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখের সংসার ছিল তারার। কিন্তু দুর্ভিক্ষ তারার জীবনকে করে দেয় বিপর্যস্ত। গল্পের শুরুতেই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্র লক্ষণীয়—

দুর্ভিক্ষের প্রথম চোটটা লাগল তারার মাথায়। তারার ছিল চুলের বাহার, মাথাভরা চিকণ কাল একরাশি চুল। মাঝে মাঝে কোন কোন মেয়ের এ রকম হয়—চাষীভুষোর ঘরেও। গোড়ায় তেল জুটতো, বাপের বাড়ীতে থাকবার সময় আর শ্বশুরবাড়ি এসে কয়েকবছর, ছেলেমেয়েগুলি জন্মাবার আগে পর্যন্ত। তারপর তেলের অভাবে চুল আবার রুক্ষ হয়ে গেছে মনে হয়। ... তারপর এল প্রাণান্তকর অভাবের দিন। ছারেখারে যাবার দিন। দু'দিনে দু'ফোটা তেল যা জুটতো তারার মাথায় দেবার তাও গেল বন্ধ হয়ে। মাথায় জট বাঁধে, হু হু করে উকুনের বংশ বাড়ে।[২৩]

দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেকে আপনজনকে ফেলে চলে যায় নিরুদ্দেশ হয়ে। আসলে খাদ্যাভাবে মানুষ শুধু নিজের স্বার্থ দেখেছে। পিতা তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ফেলে বাঁচার জন্য শহরে যায়। অভাবের সময় তারার কন্যা, 'মনা এল বিধবা হয়ে, ছেলে হারিয়ে কচি মেয়েটাকে বুকে নিয়ে ধুঁকতে

---

[২১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,'গোপাল শাসমল', *মানিক গ্রন্থাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২৮৮।

[২২] *তদেব*, পৃ. ২৯০।

[২৩] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,'নেড়ী', *মানিক গ্রন্থাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৩০-৩৩১।

ধুঁকতে। তার স্বামী মরবার পর শাশুড়ি আর এক ছেলেকে নিয়ে তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে।'[২৪] সুতরাং এ অবস্থায় পিত্রালয়ে ফিরে আসা ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু সেখানে খাদ্যাভাবে খেয়ে না খেয়ে দি কাটে মনার পিতা-মাতা-ভাই-বোনদের। ঠিকমতো খাদ্য না পাওয়ায় মা-মেয়ে উভয়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায়। দুধের পরিবর্তে চালের হাঁড়ি ঝাড়া ধুলো মেশানো গুঁড়ো সিদ্ধ করে খাওয়ানো হয় শিশুদের। খাদ্যাভাবে একসঙ্গে তারার একটা ছেলে আর একটা মেয়ের মৃত্যু হয়। 'ছেলেমেয়ে অসুখে ভুগছিল। ওষুধের অভাবে যে তারা মরল ঠিক তা নয়, আসলে মরল খেতে না পেয়ে রোগটাকে উপলক্ষ করে।'[২৫] কাঠের অভাবে অর্ধদগ্ধ ভাইবোনকে খালে ভাসিয়ে দেয় তার জ্যেষ্ঠপুত্র ভুতো। একটা মৃত ছাগলছানা নিয়ে সে গৃহে ফেরে। ছাগলছানার মাংসটা মনা রাধে শুধু লবণ হলুদ দিয়ে বিনা তেলে। বিধবা হবার পরই দুর্ভিক্ষের কারণে যেখানে ঠিকমতো খাদ্যই জোটে না, সেখানে তার হবিষ্যি পালন করা হয় না। সেজন্য সে বিধবা হয়েও সব রীতিনীতির কথা ভুলে মাংস রান্নার সময় খানিকটা মাংস খেয়ে ফেলে। এ নিয়ে তাদের দুভাইবোনে হাতাহাতি ও কামড়াকামড়ি হয়।

দুর্ভিক্ষের সময় অনেক বিবেকবান মানুষও অমানুষ হয়ে যায়। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় দুর্ভিক্ষের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে ওই স্কুলের পণ্ডিত হৃদয় জোতদার পূর্ণ ঘোষালের ধানের হিসাবরক্ষক পদে যোগ দেয়ার পর তার মধ্যে মনুষ্যত্ব লোপ পায়। হিসাবরক্ষক পদে চাকরি গ্রহণের মাত্র ছয়মাসের মধ্যে সে মহাজনি কারবার এবং নারী ব্যবসায়ের দালালি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। চিরকাল যে মহান দারিদ্র্যের আদর্শের শোষণে থেঁতো এবং ভোতা হয়ে নির্বিরোধ ভাল মানুষ সেজে ছিল সেই পূর্ণ ঘোষালের সঙ্গে মিশে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে শিখে অমানুষ হয়ে ওঠে। আঠার বছরের বিধবা মনাকে নারীব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবার কৌশল হিসেবে সে মনার পিতার অবশিষ্ট ভিটেটুকু বন্ধক নিয়ে গগন ও তার পুত্র বিশ বছর বয়স্ক ভুতোকে গৃহছাড়া করে। কিন্তু যারাই গ্রাম ছেড়ে একা বা সপরিবারে শহরে গিয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই আবার ফিরে এসেছে আপনজনদের হারিয়ে। দুর্ভিক্ষকালীন কোথাও আশ্রয় পায় না গ্রামের নিঃস্ব অসহায় মানুষ। হৃদয় পণ্ডিতের কুপরামর্শে তারার স্বামী-পুত্র বাড়ি বাঁধা রেখে পনের-বিশ দিনের খাদ্য দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় রোজগারের আশায়। কিন্তু গগণ বা তার পুত্র কেউ-ই ফিরে আসে না।

> খোরাক ফুরিয়ে যায়। সময় কাটে একটা মাস। গগনের কোন সংবাদ মেলে না। শোক দুঃখও দৈহিক যন্ত্রণাবোধ আবার ঝিমিয়ে আসে দুজনের। মনার মেয়েটা মরে যায় দুধের অভাবে কাঁড়া-চাল খাওয়া পেটের অসুখে। তারার কোলের ছেলেটাও মরে একইভাবে। তারপর একে একে এ বেলা একজন আর ওবেলা একজন করে, আরও একটা ছেলে ও মেয়ে মারা যায় তারার। থাকে দুটি—মরমর অবস্থা। দশটির মধ্যে তারার চারটি মরে দুর্ভিক্ষে। হৃদয় পণ্ডিত আসে যায়, পরামর্শ দেয়, উপকার করতে চায় কিন্তু চাল দেয় না।[২৬]

হৃদয় পণ্ডিত তারাদের চারজনের খাদ্যের ব্যবস্থা করে না। সে শুধু মনাকে শাড়ি গয়না পরিয়ে মাছদুধ খাইয়ে সুখে রাখবার জন্য শহরে পাঠিয়ে দিয়ে তার নিজের মাছদুধ খাবার আর স্ত্রীকে শাড়ি গয়না দেবার ব্যবস্থাটা পাকা করে। স্বামী-পুত্র-কন্যার কোনো সন্ধান না পেয়ে তারা দুটো অভুক্ত ছেলেকে হৃদয় পণ্ডিতের বারান্দার মাটিতে শুইয়ে রেখে সদরে চলে যায়। তারপর অনেক কাণ্ড ঘটে তারার জীবনে। সদরে যাওয়ার মাসখানেক পরে হাসপাতালের আয়নায় মুখ দেখে সে যেন নিজেকে চিনতে পারে না। সাতাইখুনি গ্রামের গগনের স্ত্রী হিসেবে তার মাথায় যে চুলের প্রাচুর্য ছিল,তার আর

---

[২৪] *তদেব*, পৃ. ৩৩১।
[২৫] *তদেব*।
[২৬] *তদেব*, পৃ. ৩৩৩।

কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নিজের ন্যাড়ামাথা দেখতে পেয়ে তার বিশ্বাস হয় না যে সে গগনের স্ত্রী তারা।

দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েও ঠিকমতো খাদ্য পায় না। বেঁচে থাকার জন্য ছিন্নমূল মানুষ নানারকম চেষ্টা করে। দরিদ্র কৃষক দুর্ভিক্ষের কারণে নিঃস্ব হয়ে শহরে গিয়ে আশ্রয় নেয় ভাঙা নোংরা পরিত্যক্ত পোড়োবাড়িতে। সেখানকার লঙ্গরখানায় 'ছোট মগের কম মাপের পাতলা খিচুড়ি'র জন্য লাইন দিতে হয়। কয়েকমাস ধরে উপবাসক্লিষ্ট জীর্ণ-শীর্ণ দেহমন নিয়ে ক্ষুধার জ্বালা, আশ্রয়ের অভাব, শীত, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, নোংরামি আর মৃত্যু দর্শনে অটল ও তার স্ত্রী মালতী খাদ্য সংস্থানের চেষ্টায় নানারকম উপায় অবলম্বন করে। সরকারি ত্রাণকর্তার মালীর অনুপস্থিতিতে অটল দু'দিন কাজ করে যা পায় তাতে দুদিনের খাদ্য জোটে। মালতীও গৃহপরিচারিকার কাজ করে তিনদিনের মতো চাল-ডাল-তরকারী-তেল-সাবান ও একখান ধুতি পায়। এক পর্যায়ে স্ত্রীর সম্ভ্রম বিক্রির মাধ্যমে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে অটল। কিন্তু গ্রাম্য মেয়ে মালতী সতীত্ব বিসর্জন দিতে চায় না। সরকারি ত্রাণকতার গৃহে স্ত্রীকে পাঠিয়ে চুরির পরিকল্পনা করে অটল। শেষ পর্যন্ত মালতীর জন্য তা হয়ে ওঠে না।

'ছিনিয়ে খায় নি কেন' গল্পে দুর্ভিক্ষকালে মানবতার সেবায় নিয়োজিত মানবিক গুণসম্পন্ন এক ডাকাতের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। মনুষ্য সৃষ্ট 'দুর্ভিক্ষের সময় যোগী ডাকাতও নাকি মানুষ বাঁচাবার মহৎ কাজে নেমেছিল। সেবাও করত পথেঘাটে মুমূর্ষুর, সুযোগ মতো চুরি-ডাকাতি করে খাদ্য জুটিয়ে বিলিয়ে দিত। কয়েকটা মেয়েকে ক্রেতার কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাঁচিয়েছে শোনা যায়। সাতকোশী খালে সরকারী চালের নৌকায় ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে দু'বছর জেল হয় তার।'[২৭] খাদ্যাভাবে অসংখ্য দরিদ্র মানুষের মৃত্যু হয় অথচ গ্রাম-গঞ্জ-শহরে জোতদার ও কালোবাজারির গুদামে বিপুল পরিমাণ খাদ্য মজুত থাকে। সমাজের ভদ্রমানুষ হিসেবে যারা পরিচিত তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। দুর্ভিক্ষকালে চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে খাদ্যসংগ্রহ করে যোগী ডাকাত হয়েও তা অনাহারী মানুষের মধ্যে বিতরণ করেছে। শুধু তাই নয় নারীব্যবসায়ীদের হাত থেকে সে বাঁচিয়েছে বহু গৃহস্থ ঘরের যুবতীকে। ধনীগৃহে, ব্যবসায়ীদের গুদামে প্রচুর খাদ্য থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ কেন ছিনিয়ে খায় নি এ প্রশ্ন গল্পকারের মনে দেখা দিলে যোগী তার জবাবে বলেছে :

> একদিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকোয় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার তাগিদও ঝিমিয়ে যায়। দু'চারদিন একটু কিছু খেতে পেলেই সেটা মাথা চারা দিয়ে ওঠে। দু'দিন খেতে না পেলেই সেটা ফের ঝিমিয়ে যায়।[২৮]

যোগীর অবর্তমানে তার স্ত্রী নারীব্যবসায়ীদের কবলে পড়ে। কারামুক্ত হয়ে সে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একমাস ধরে খুঁজে সদরের একটা বস্তি থেকে স্ত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। খাদ্যাভাবে তার স্ত্রী গৃহত্যাগ করে যেভাবেই হোক বেঁচে ছিল, তাকে নিয়ে সংসার করতে কোনো আপত্তি থাকে না যোগীর।

দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্র পরিবেশিত হয়েছে 'সাড়ে সাতসের চাল' গল্পে। দুর্ভিক্ষকালে খাদ্যাভাবে পলাশমতি গ্রামের সন্ন্যাসী পরিবারের সবাইকে রেখে শহরে গিয়ে বহুকষ্টে সাড়ে সাতসের চাল সংগ্রহ করে গৃহমুখী হয়। পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য সে চাল নিয়ে স্টেশন থেকে সাতমাইল দূরবর্তী নিজগ্রামে দ্রুত পৌঁছতে চায়। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে প্রায় উপোস থেকে তার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়। তাছাড়া তার বাড়িতে ক'জন জীবিত আছে তা নিয়ে সে চিন্তিত। তারপরও সকলেই জীবিত আছে ভেবে বিলম্ব না করে রাত্রেই গৃহে পৌঁছে প্রাণহীন নিস্তব্দ পরিবেশ দেখতে পায়। দুর্ভিক্ষকালে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ মারা গেছে খাদ্যাভাবে। আর যারা জীবিত ছিল তাদের অধিকাংশই পালিয়ে

---

[২৭] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ছিনিয় খায় নি কেন?', *মানিক গ্রন্থাবলী*, ৮ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪৪।

[২৮] *তদেব*, পৃ. ৪৪৯।

গেছে শহরে। গ্রামে প্রবেশের মুখেই সে বাঞ্ছার বাড়িটি জনশূন্য দেখতে পায়। নিজের বাড়িতে প্রবেশ করে সে দেখে 'বেড়া নেই। পাশের ছোট কলাবাগান আর শব্জীক্ষেতের বেড়ার চিহ্ন লোপ পেয়েছে। সামনে লাউ কুমড়ার মাচা দুটি হয়েছে অদৃশ্য। দেখে একটু স্বস্তি বোধ করল সন্ন্যাসী। বেড়া আর মাচা নিশ্চয় উনানে পুড়েছে। উনানে আগুন জ্বলেছে তার বাড়িতে, রান্না হয়েছে। হয়তো সবাই বেঁচে আছে বাড়িতে, একজনও মরেনি। কোন মতে কুড়িয়ে পেতে একমুখে দু'মুঠো খেয়ে মরমর অবস্থায় ছেলে বুড়ো মেয়েমদ্দ সবাই বেঁচে আছে।'[২৯] এই বিশ্বাসেই সন্ন্যাসী একে একে 'মানদা,সুবল কাকা,সুখী পিসি,সোনা বৌ'ঠান কে ডেকে কারো কোনো সাড়া পায় না। একটা ঘরের দরজায় তালা আর অন্য ঘরের দরজা একেবারে খোলা এবং জনশূন্য দেখতে পেয়ে সে হতাশ হয়। এ অবস্থায় বারান্দায় সাড়ে সাত সের চালের পুঁটুলি নামিয়ে সে দুর্বল ও ক্লান্ত শরীরে চিন্তা করেছে 'সবাই যখন বেঁচেছিল তখন সবাই পালিয়েছে, সোনা বৌঠান শুদ্ধ ? না, অনেকে যখন মরে গিয়েছিল তখন পালিয়েছে বাকী যারা ছিল ? কোথায় পালিয়ে কোথায় মরেছে বাড়ির সবাই, সোনা বৌঠান শুদ্ধ ? ভাবতে ভাবতে ঝিমোতো ঝিমোতে এক সময় দাওয়া থেকে হুমড়ি দিয়ে উঠোনে পড়ে সন্ন্যাসী নিঃশব্দে মরে গেল।'[৩০] দুর্ভিক্ষে 'খাদ্যাভাবে সন্ন্যাসীর পরিবারের সকল সদস্যদের করুণ মৃত্যুর ঘটনাই যেন প্রতিফলিত হয়েছে মন্বন্তরের সামগ্রিক বিভীষিকাময় রূপ।'[৩১]

'অমানুষিক' গল্পে দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। ছিদাম ফুলদিয়া গ্রামের একজন দরিদ্র চাষী। দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হলে জোতদাররা খাদ্য মজুত করে। অন্যদিকে ছিদাম খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়। গ্রামের ধনী ব্যক্তি ললিতবাবুর কাছে বাসগৃহ বন্ধক রাখে ছিদাম। দুর্ভিক্ষের সময় নিঃস্ব হয়ে গৃহে 'বুড়িমা, যোয়ান বৌ আর কচি মেয়েটা'কে রেখে সে শহরে যায় উপার্জনের আশায়। গল্পের শুরুতেই গল্পকার ছিদাম সম্পর্কে লিখেছেন :

> সে ছিল ওরকম অনেকের একজন। আধপেটা সিকি পেটার বেশি না খেয়ে, কখনো বা দু'চারদিন স্রেফ উপোস দিয়ে দেশের চলতি দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়ে টিকে থাকত, যুদ্ধের সুযোগে রক্তমাংস লোভী পোষা রাক্ষসগুলি চড়চড় করে দুর্ভিক্ষ চরমে তুলে দেওয়ায় যারা উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। ছিদামের ইতিহাসটাও আর দশজনের মতো সাধারণ, যদিও ভয়াবহ। প্রথমে গেল তৈজসপত্র, তারপর গেল গাইটা। কুব্জার (স্ত্রীর) রূপোর পৈছেটা দিল সে নিজেই, কানের লুকানো মাকড়ি খুঁজে বার করে কেড়ে নিতে হল জমিটুকু যাওয়ার পর। ভিটেটুকু বাঁধা পড়ল সকলের শেষে।[৩২]

ললিতবাবুর কাছে বাড়িটা ছিদাম বন্ধক রেখেছিল এই ভেবে যে হয়তো একদিন 'জমিজমা গাইবাছুর তৈজসপত্র কুব্জার গয়না, কুব্জার গর্ভে সন্তান'সহ সব ফিরে আসবে। ছেলেটার মৃত্যুর পর সে ধরেই নিয়েছিল একে একে সবার মৃত্যুর কথা। তবুও নিজে এবং সকলকে বাঁচাবার কোনো পথ খুঁজতে সে এক রকম পালিয়েই গিয়েছিল।

> তারপর কতকাল কত পথ হেটেছে ছিদাম, কত দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে, বাজারে বাজারে ফালতু ফেলে দেয়া পঁচা তরকারী মাছ ডিম কাড়াকাড়ি করে বাগিয়ে নিয়ে কাঁচাকাঁচা খেয়ে খেয়ে, এর বাগানের ফলটা ওর বাগানের মুলটা চুরি করে করে, এ কেন্দ্রে খিচুড়ি নিয়ে আরেক কেন্দ্রে পাবার আশায় ছুটতে গিয়ে দম নিতে পথের ধারে ছায়ায় বা রোদে, রোয়াকে বা ধুলো কাদায় বসে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধুঁকে আর ধুঁকে। এমনিভাবে গ্রীষ্ম গেছে, বর্ষা গেছে, শীত গেছে।[৩৩]

---

[২৯] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাড়ে সাত সের চাল', *মানিক গ্রন্থাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫০।
[৩০] *তদেব*, পৃ. ৩৫১।
[৩১] সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৯-২৯০।
[৩২] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,'অমানুষিক', *মানিক গ্রন্থাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭৫।
[৩৩] *তদেব*, পৃ. ৩৭৬।

ছিদাম চুরি, ছিনতাই এবং ভিক্ষা করে দেড়বছর কাটিয়ে দেয় শহরে। গৃহস্থ চাষী সেজে কুজার মতো গাবো নামে এক নারীকে গৃহস্থ চাষীর বউ সাজিয়ে একটা মৃতপ্রায় শিশুকে নিয়ে ভিক্ষা করেও সে উপার্জন বৃদ্ধি করতে পারেনি। শিশুটার মৃত্যুর পর গাবো নীলপ্যান্ট পরিহিত জনৈক আধবুড়ো ব্যক্তির সঙ্গে নিরুদ্দেশ হবার পর ছিদাম গৃহে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়। সে জানে 'বাড়ি আর নেই, বেদখল হয়ে গেছে, বদলে গেছে বা পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। বাড়ির কারো বেঁচে থাকাও প্রায় অসম্ভব। অনেক দিন আগেই সে গৃহে ফিরতে চেয়েছিল কিন্তু মা-বৌ-মেয়েটাকে নিশ্চিত মরণের মুখে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবার লজ্জায় এবং দীর্ঘদিন পর শূন্য হাতে ফেরার লজ্জায় তা হয়ে ওঠেনি। নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর সে গৃহে প্রবেশ করে মা-মেয়ের মৃত্যু সংবাদ শোনে স্ত্রীর কাছে। ছিদামের বাড়িঘর ও স্ত্রীকে দখল করে নিয়েছে ললিতবাবু। ছিদাম বাড়িতে থাকবার অধিকার হারিয়ে আবার অন্তঃসারশূন্য ভিক্ষুক জীবনে ফিরে যায়। আসলে 'ধর্মীয় ও সামাজিক বিচারে কুজা ছিদামের স্ত্রী হলেও অর্থনৈতিক কারণে স্ত্রীর ওপর অধিকার প্রয়োগের সাহস ও সামর্থ্য তার নেই। দুর্ভিক্ষ দু'জনের মধ্যে ললিতবাবু নামক অর্থনীতির এমন এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করেছে যা অতিক্রম কিংবা অস্বীকারের সাধ্য ছিদাম বা কুজা কারো নেই। ললিতবাবু এসে দরজায় কড়া নাড়লে ছিদামকে নিজগৃহ ও স্ত্রীকে রেখে তাই পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে হয়।'[৩৪]

দুর্ভিক্ষকালে ও দুর্ভিক্ষোত্তর কালোবাজারি-মজুতদারদের চক্রান্তের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্য বাজার থেকে আকস্মিকভাবে উধাও হওয়ার ফলে গ্রাম-বাংলার দরিদ্র মানুষের দুর্দশার সীমা থাকে না। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে, অর্ধাহারে-অনাহারে, রোগে-শোকে মানুষের অবস্থা হয় একেবারে সঙ্গীন বা কঙ্কালসার। খাদ্যাভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়। 'পেটব্যথা' গল্পে দরিদ্র চাষী ভৈরবের যুবতী মেয়ে মানো মারা যায় দুর্ভিক্ষের কারণে প্রায় অনাহারে। ভৈরবের দুরবস্থার চিত্র গল্পটিতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট:

> পেটের জ্বালায় মানো মরেছে রোগ হয়ে, ব্যারামে। না খেয়ে না খেয়ে গায়ে শক্তি না থাকায় হয়তো সে মরেছে রোগে, তেমন পথ্য পেলে হয়তো মরত না। ... দুর্ভিক্ষটা কোনো মতে সামলেছে ভৈরব। একবেলা আধবেলা শাকপাতা খুদ-কুঁড়ো কোনোমতে জুটিয়ে হাড়চামড়া টিকিয়ে রেখে কোনোমতে বেঁচে থেকেছে সবাই মিলে,—মানোর অসুখ হল। ওই অবস্থায় পোয়াতি মেয়ে বাঁচে কখনো অসুখ হলো।[৩৫]

ভৈরব আশাবাদী আর কদিন পরে মাঠের ফসল তার গৃহে উঠলে আর কোনো খাদ্য সংকট থাকবে না। কিন্তু জমিদার করালীবাবু যদি বাকি খাজনার দায়ে সব ফসল কেড়ে নেয় তবে তার করার কিছু নেই। ভৈরব মনে করে 'তা, করালীবাবু কি এমন রাক্ষস হবে যে একটা বছর তাকে সময় দেবে না সামলাবার জন্য, এত বোকা কি হবে করালীবাবু যে সে বুঝতে পারবে না একটা বছর তাকে সময় না দিলে সে উৎখাত হয়ে যাবে, বছর বছর খাজনা দেবার কেউ আর থাকবে না তখন।'[৩৬] জমিদারের ভয়ে সে সর্বদা সন্ত্রস্ত। জমিদার ছাড়াও দরিদ্রদের শোষণ করেছে কৈলাস। সে অসৎ ব্যবসায়ী, ঠিকাদার। দুর্ভিক্ষ-শেষে খাদ্যের কোনো উৎস না পেয়ে ভৈরব তার গৃহপালিত ছাগল বিক্রির জন্য শহরে নিয়ে যায়। পথে কৈলাস তাকে 'শুঁড়ির পো' বলে সম্বোধন করে ছাগলটি তার কাছে বিক্রির জন্য হুমকি প্রদর্শন করেছে। ভৈরব কৈলাসের হুমকিকে উপেক্ষা করে অধিকমূল্যে ছাগলটিকে এক ভদ্র গৃহস্থ পরিবারে বিক্রি করে। কাপড়ের দাম বৃদ্ধির কারণে সে 'একখানি গামছা কেনে, শাড়ির বদলে এতেই মানোর মার একরকম চলে যাবে।'[৩৭] কৈলাস ছাগলের দাম আট টাকা দিতে

---

[৩৪] সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১১-১২।

[৩৫] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,'পেটব্যথা', ***মানিক গ্রন্থাবলী***, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮৩।

[৩৬] *তদেব*।

[৩৭] *তদেব*, পৃ. ৩৮৫।

চেয়েছিল,অথচ হাটে সে একুশ টাকায় বিক্রি করে। গ্রামে প্রবেশের মুখে কৈলাস ও তার গুণ্ডাবাহিনী তার সমুদয় অর্থ ছিনতাই করে নেয় এবং তার পেটে লাথি মারে। পথ চলতি রাম শ্যাম যদু মধুরা ভৈরবকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কৈলাসের প্রতিনিধি বলাই আর কুঞ্জ ডাক্তার তাকে শূলবেদনার কথা বলে। পরবর্তীকালে রাম শ্যাম যদু মধুরা কৈলাসকে মেরে কুঞ্জকে জানায় যে তারা আর একজন শূলবেদনার রোগী এনেছে। বস্তুত দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র মানুষ শোষকের ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। এ গল্প থেকে বোঝা যায় মানিক শুধু দুর্ভিক্ষের চিত্রই অঙ্কন করেননি, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে প্রতিবাদী হিসেবেও উপস্থাপন করেছেন।

'মাসী পিসি' গল্পে যেমন দুর্ভিক্ষ জর্জরিত গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক সংকটের চিত্র বর্তমান তেমনি সংগ্রামী চেতনা বা প্রতিবাদের চিত্রও স্পষ্ট। আহলাদীর পিতা-মাতার মৃত্যু হয় দুর্ভিক্ষ-শেষে মহামারীতে। দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী স্মৃতিচারণে দেখা যায় :

> মায়ের বোন মাসি আর বাপের বোন পিসি ছাড়া বাপের ঘরের কেউ নেই আহলাদীর। দুর্ভিক্ষ কোনমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারীতে একটা রোগে, কলেরায় সে তার বৌ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসিপিসি তার আশ্রয়ে মাথা গুজে আছে অনেকদিন, দুর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে নিরাশ্রয় বিধবারা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণপোষণের কিছুটা তারা রোজগার করত-ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গেঁথে, শাকপাতা ফলমুল ডাঁটা কুড়িয়ে এটা ওটা যোগাড় করে। শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দু'জোড়া থান পড়ন-খরচ তো এই। বছরের পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পর্যন্ত হয়েছিল দু'জনের, রুপোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে। আহলাদীর বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাঁটাই করে দিয়েছিল একেবারে পুরোপুরি। তারও তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে না কি বাঁচে, তার ওপর জগুর লাথির চোটে গর্ভপাতে মরমর মেয়ে এসে হাজির। সে কোনদিক সামলাবে ? মাসি পিসির সেবাযত্নেই আহলাদী অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপমাও সেটা স্বীকার করেছে। কিন্তু কি করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি বা সম্ভব অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে।[৩৮]

দুর্ভিক্ষের ফলে মানুষ যখন অনাহারে মারা যাচ্ছিল সে সময়ে মাসি পিসি গ্রাম থেকে তরিতরকারী ফলমূল শহরে নিয়ে বিক্রি করে দু'পয়সা উপার্জনের মাধ্যমে আহলাদীকে নিয়ে বেঁচে থাকে। আহ্লাদীর পিতামাতার মৃত্যুর পর যৎসামান্য জমিজমার লোভে তার স্বামী জগু তাকে নিতে চায়। কিন্তু পুনরায় আহ্লাদী গর্ভবতী হওয়ায় তাকে স্বামীগৃহে পাঠাতে চায় না মাসি-পিসি, বরং জামাইকে আদরযত্নের ত্রুটি রাখে না তারা। মহাজন গোকুল, চৌকিদার কানাই দারোগার ভয় দেখিয়ে আহ্লাদীকে ভোগের সুযোগ খোঁজে। মাসি-পিসি বটি ও চাকু দিয়ে এসব বদ মতলবকারীদের তাড়িয়ে আহ্লাদীকে নিরাপদে রাখে।

'রাসের মেলা' গল্পেও দুর্ভিক্ষের-চিত্র লক্ষণীয়। গ্রাম্য বিধবা বৌ খাদু দুর্ভিক্ষ-কালে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে গৃহপরিচারিকার কাজে যোগ দেয়। খাদ্যাভাবে খাদু 'দুর্ভিক্ষের বন্যায় কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছে এই শহরে বাবুদের বাড়ি ঝি-গিরিতে।'[৩৯] নিকটজনদের ছেড়ে সে একাই থাকে। রাসের মেলায় গিয়ে (অনেকটা তারই মতো অবস্থা)সাইকেল মেরামতকারী দামোদরের সঙ্গে কথা-বার্তায় বেশ কাটে একটি দিন। মানিকের 'চিন্তামণি' উপন্যাসেও কাদুর মতো চিন্তামণি দুর্ভিক্ষের কারণে খাদ্যাভাবে গ্রাম ছেড়ে মধুবনী গ্রামের হরেনাম রাইসমিলের মালিক নীলকণ্ঠের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। চিন্তামণি শেষ পর্যন্ত যুবক গৌড়ের সঙ্গে শহরে

---

[৩৮] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মাসিপিসি', *মানিক গ্রন্থাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭০-৩৭১।

[৩৯] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,'রাসের মেলা' *মানিক গ্রন্থাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬০।

কারখানার কাজে যায়। কিন্তু খাদু মেলা থেকে ফিরে আসে তার মনিব দত্তবাবুর বাড়িতে। 'বেড়া' গল্পে গোবর্ধন আর জনার্দনের পরিবারের লোকজন শাক-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেছে। দুর্ভিক্ষ শেষে তারা জমি বিক্রি বা বন্ধক দেবার কথা ভেবেছে।

'কানাই তাঁতি' গল্পে দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ চিত্র লক্ষণীয়। কানাই তাঁতি বিয়ে করতে চায় রসিক তাঁতির কন্যা মতিকে। মতিও কানাইকে পছন্দ করে। রসিক কন্যার বিয়েতে দু'তিনকুড়ি টাকা পণ চাইলে কানাই অতি কষ্টে 'দুই কুড়ি তিন' টাকা সংগ্রহ করে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের কারণে সুতোর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁতই যেখানে বন্ধ হয়ে যায় সেখানে আর টাকা জমানো সম্ভব হয় না তার। ফলে কানাই-মতির বিবাহের স্বপ্ন সফল হয় না। তাদের 'সব স্বপ্ন গুড়ো হয়ে গেল কাঁচের মতো মহাকালের বুটপরা পায়ের চাপে, মৃত্যু ঘনিয়ে এল দুর্ভিক্ষের রূপে চাষী, তাঁতি কামার কুমোর তেলি জেলের ঘরে। সব বেচে দিল অসহায় মানুষ প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায়, দলে দলে দিশেহারা মানুষ পালিয়ে গেল গাঁ ছেড়ে।'[৪০] রসিক কানাইরা গ্রাম ছেড়ে কোথাও না গেলেও তাদের বেঁচে থাকা হয়ে পড়ে অসম্ভব। দুর্ভিক্ষের শুরুতেই অনাহারে থেকে ক্ষুধার জ্বালায় যদুর স্ত্রী আত্মহত্যা করে গলায় দড়ি দিয়ে। এ ধরনের মৃত্যুকে মেনে নিতে পারে না মতি। তার কথা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনে দেহবিক্রি করা যায়। কানাইয়ের মাকে সে বলেছে :

> সইবার পারল না ক্যান ? যুয়ান মাগী তো, নাকি ব্যারামে বুড়াইছে ? মরণ য্যান সস্তা, গলায় দড়ি দিছে। ভদ্দর ঘরের মাইয়া যেন হারামজাদি, ভদ্দর ঘরের বৌ। বাঁইচা থাইকা প্রাণভরে বাঁচনের লাইগা মরণে দোষটা কি ? মরণ মরণই না আর কিছু। না মইরা বাঁচে কেডা ? মরুম যদি মরণ যখন তখন মরুম, বাঁচুম যখন ক্যান মরুম, গলায় দড়ি দিয়া, নিজেরে খুনী কইরা ? যুয়ান মাইয়া, পুরুষকে যৌবন দিয়া নয় বাঁচতো।[৪১]

দুর্ভিক্ষকালে মতি 'কাঁসার এক আফফোরা' তিন টাকায় বন্ধক রাখতে চেয়েছিল কানাইয়ের কাছে। কিন্তু কানাই তা নেয় না। পরবর্তীকালে কিছু টাকা অথবা বিবাহের কথা বললেও কানাই অস্বীকৃতি জানায়। খাদ্যাভাবে বৃদ্ধা মাতার প্রায় অনিবার্য মৃত্যু জেনে বা অনাহারে মৃতপ্রায় ক্ষীণ দুর্বল মতির কাতর অনুরোধেও কানাই গচ্ছিত অর্থ ব্যয় করে না। মূলত ভবিষ্যতে বাঁচার জন্য সে সঞ্চিত অর্থে হাত দেয় না। কানাই মনে করে : 'আজ যদি টাকাগুলি সে খরচ করে দেয় এখনকার উপোসে কাবু হয়ে, শাকপাতা কুড়িয়ে খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা না করে, কাল যদি খারাপ দিন শেষ হয়ে সুদিন আসে, তবু সে তখন তলিয়ে যাবে।'[৪২] মূলত কানাইয়ের সঞ্চিত টাকাগুলি তার বাঁচার শক্তি যোগায়।

বাংলা ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে শুধু খাদ্যাভাবই নয় বস্ত্রসংকটও তীব্র আকার ধারণ করে। একশ্রেণীর অসৎ ব্যবসায়ী সুতো ও বস্ত্রের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বাংলার দরিদ্র নর-নারীদের বিবস্ত্র হতে বাধ্য করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি গল্পে বস্ত্রের অভাবে নারীদের অসহায় অবস্থার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। 'দুঃশাসনীয়' গল্প হাতিপুর গ্রামের নর-নারীদের বস্ত্র সংকটের করুণ আলেখ্য। 'আব্দুল আজিজ আর সুরেন ঘোষ হাতিপুরের একশ চাষি ও কামার কুমার জোলা তাঁতি আর আড়াইশ ভদ্র স্ত্রী পুরুষের কাপড় যোগাবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। ঘোষ আর আজিজ সভা ডেকে ঘোষণা করেছে হাতিপুরের জন্য কাপড়ের 'কোটা' যা তারা আদায় করেছে। কাজেই এবার কাপড়ের ভাবনা কারো ভাবতে হবে না আর। মনোহর শাহর প্রস্তাবে নিজেদের তারা হাতিপুরের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে। বিশ্বাস না করেও হাতিপুরের লোক ভেবেছে, দেখা যাক।'[৪৩] কিন্তু আজিজ আর সুরেনরা হাতিপুরের জন্য নির্ধারিত কাপড়গুলো অন্যত্র বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ

---

[৪০] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,'কানাই তাঁতি', *মানিক গ্রন্থাবলী*, ৮ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৪।
[৪১] *তদেব*, পৃ. ৪২২।
[৪২] *তদেব*, পৃ. ৪২৪।
[৪৩] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,'দুঃশাসনীয়', ***মানিক গ্রন্থাবলী***, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৬-২৭৭।

উপার্জন করে প্রশাসনের সহযোগিতায়। এর ফলে বৈকুণ্ঠের স্ত্রী, ভোলার স্ত্রী-পুত্রবধূ-কন্যা, গদাধরের স্ত্রী, আনোয়ারের স্ত্রীদ্বয় সহ গ্রামের অধিকাংশ নারী বস্ত্রাভাবে সারাদিন গৃহকোণে আবদ্ধ থেকে রাতের অন্ধকারে গৃহকর্ম সম্পাদন করে। দিবাভাগে এসব নারী-স্বামী-পুত্র বা অন্য কোনো পুরুষের সামনে বের হতে লজ্জাবোধ করে। বস্ত্র একেবারে না থাকায় তারা শুধু রাতেই বের হয়। রাত্রে এইসব বিবসনা নারী যখন গৃহের বাইরে আসে তখন মনে হয় কতকগুলো ছায়া যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে :

> ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসি কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসী, খুড়ী বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদৃষ্টকে, ... কোনো ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোনো ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরুসভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো। [৪৪]

'গ্রাম বাংলার বস্ত্র সংকট একটি মাত্র শব্দে যেন ঘনীভূত হয়েছে।'[৪৫] দুর্ভিক্ষের ফলে হাতিপুরের ঘরে ঘরে খাদ্যাভাবও দেখা দেয়। গদাধর কাজের সন্ধানে এবং স্ত্রী ভূতির কাপড় সংগ্রহের জন্য এগার দিন আগে বের হয়। এর ফলে তার গৃহে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। বারো বছর বয়স্ক ক্ষুধাতুর পুত্রের জন্য ভূতি ছেঁড়া মাদুর গায়ে জড়িয়ে শিকে থেকে পান্তাভাতের হাড়ি নামাতে গেলে তা পড়ে ভেঙে যায়। এ অবস্থায় ভূতি মাদুরটা গা থেকে খুলে ফেলে বিবস্ত্র অবস্থায় কাঁদতে থাকে পড়ে যাওয়া পান্তাভাতের মধ্যে বসে। আনোয়ারের স্ত্রী রাবেয়া ক্ষুধার জ্বালা এক রকম সহ্য করলেও লজ্জা নিবারণের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। কাপড়ের অভাবে সে পায়খানার চটের পর্দাটা গায়ে জড়ায় ঠিকই কিন্তু তাতে সে অস্বস্তিবোধ করে। সে তার স্বামীকে বলেছে :

> আজ শেষ। আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমায় খতম। পুকুরে ডুবব, খোদার কসম। রাবেয়া ক'দিন থেকেই এ ভয় দেখাচ্ছে, তবু তার বিবর্ণমুখ, রুক্ষ চুল আর উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে আনোয়ারের বুক কেঁপে যায়। চাষীর ঘরের বৌ দুর্ভিক্ষের দিনগুলি না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কাটিয়ে দিয়েছে, কথা বলেনি, শাকপাতা কুড়িয়ে এনে খুদ কুড়োর সাশ্রয় করে তাকে বাঁচিয়ে লড়াই করেছে নিজে বাঁচবার জন্য। আজ কাপড়ের জন্য সে কামনা করছে মরণ। খেতে দিতে না পারার দোষ ও গ্রাহ্য করেনি, পরতে দিতে না পারার দোষ ও সইতে নারাজ। ... সেমিজ না পরলে দু'ফেরতা শাড়ী পড়া রাবেয়ার অভ্যাস। এক ফেরতা কাপড় জড়িয়ে মানুষের সামনে সে বার হয় নি কোন দিন। পায়খানার চটের পর্দাটা গায়ে জড়িয়ে নিজেকে তার বিবসনা মনে হচ্ছে। কাপড় যদি নেই, ঘোষ বাড়ির মেয়েরা এবেলা ওবেলা রঙীন শাড়ী বদলে নিয়ে পরে কী করে, আজিজ সায়েবের বাড়ির মেয়েরা চুমকি বসানো হালকা শাড়ীর তলার মোটা আবরণ পায় কোথায় ?[৪৬]

কিন্তু আনোয়ার শত চেষ্টা করেও স্ত্রীর কাপড় সংগ্রহ করতে পারে না। শেষপর্যন্ত রাবেয়া পুকুরের জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। কাপড়ের অভাবে জ্বরে শয্যাগত আমিনার গায়ে চাপানো হয় দুটো চুনের বস্তা। 'আমিনা বলে ফিসফিসিয়ে; গা জ্বলছে পুড়ে যাচ্ছে ! আজ ঠিক মরব। এ বস্তা মুড়ে কবর দেবে মোকে।'[৪৭]

নারীব্যবসায়ী বিপিন সামন্তের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গোকুলের বোন মালতী বেনারসী শাড়ি পরে সম্ভ্রম বিক্রি করতে যায়। দাসু কামারের মেয়ে বিন্দীও একই উপায়ে শাড়ি পেলেও বিপিনের সঙ্গে

---

[৪৪] *তদেব*, পৃ. ২৭৪।

[৪৫] শিখা ঘোষ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প অবয়বগত বিশ্লেষণ* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৯০), পৃ. ১৭১।

[৪৬] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,'দুঃশাসনীয়', *মানিক গ্রন্থাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৬।

[৪৭] *তদেব*।

যেতে ভয় পায়। সতের মাইল দূরে স্বদেশ সেবক তপন বাবুর গুদামে কয়েকশত গাঁট ধুতি শাড়ি জমে থাকার গোপন তথ্য আবিষ্কার করায় শরৎ হালদারের মেজ ছেলে বঙ্কু আর তার সাত সহযোগীকে মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার অভিযোগে কারাগারে পাঠায় তপন প্রশাসনের সহযোগিতায়। আজিজ-সুরেনদের প্রতারণায় কাপড়ছাড়া গৃহে ফিরতে হয় হাতিপুর গ্রামবাসীদের। আনোয়ার-ভোলা কাপড়ের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত বা কাপড় লুঠ-ছিনতাই করতে চায়। কিন্তু দৃঢ় মনোবল তাদের না থাকায়, সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণের অভাবে তা সম্ভব হয় না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সুদেবও দরিদ্র মানুষের পক্ষে না গিয়ে হাত মেলায় আজিজ-সুরেনদের সাথে। পুলিসের পোশাক পরিহিত সুদেবের সামনে দিয়েই হাতিপুরের জন্য নির্ধারিত কাপড় লরী ভর্তি হয়ে অন্যত্র চলে যায়। সুদেব ঘুষ খেয়ে সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে শুধু বঞ্চিতই করে না সে সুরেন ঘোষকে বলেছে :

> পরশু পচেটপুরে গেছলাম নন্দজানার বাড়ী। বাড়ীর সামনে যেতেই হাত জোড় করে বললে, কী করে ভেতরে যাবেন হুজুর, মেয়েরা সব ন্যাংটো। ওরা রসুই ঘরে যাক, সাড়া বাড়ী তল্লাস করুন। আমায় যেন বোকা পেয়েছে। রসুই ঘরের ফেরারী ছোঁড়াটাকে সরিয়ে সরা বাড়ী সার্চ করাবে। আমি বললাম বেশ। তারপর সোজা রসুই ঘরের দরজা ভেঙ্গে একদম ভেতরে আরে বাপরে বাপ, সে যেন লাখ শালিকের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেল মশাই। সব কটাই প্রায় বুড়ী। কিন্তু একটা যা ছিল মিঃ ঘোষ, কি বলব আপনাকে। পাতলা একটা উড়নি পড়েছে, একদম জলের মতো, গায়ের রঙ দেখে তো আমি মিস্টার—।[৪৮]

'রাঘব মালাকার' গল্পে দুর্ভিক্ষ পরবর্তী বস্ত্র সংকটের চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাঘব দুর্ভিক্ষের কারণে অর্থ উপার্জনের জন্য চোরাকারবারি ও অসৎ ব্যবসায়ী গৌতম মুখোপাধ্যায়ের কাপড়ের গাঁট বহনের কাজ করতে বাধ্য হয়। ফুলবাড়ীর চৌমাথা থেকে পত্তুগাঁ হয়ে মালদিয়া থেকে নির্জন পথে গৌতমের বস্ত্রের গাঁট বহন করে রাঘব। দুর্ভিক্ষে পত্তুগাঁসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহুলোকের প্রাণহানি ঘটায় গ্রামগুলো যেন জনহীন। এই জনহীন পথেই রঘুর মাথায় কাপড়ের মোট দিয়ে গৌতম নিজেও কিছু কাপড়ের বোচকা নিয়ে যায়।

> ফুলবাড়ীর চৌমাথা থেকে নামামাত্র পথটা মাঠ জলা বন-বাদাড়ের ভিতর দিয়ে দু'ক্রোশ তফাতে মালদিয়া গিয়াছে। এই দুই ক্রোশের মধ্যে গাঁ বলতে কিছু নেই, এখানে ওখানে কতগুলি কুঁড়ে জড়ো করা বসতি আছে মাত্র। হাটবারের দিন কিছু লোক চলাচল করে পথ দিয়ে, অন্য দিন সন্ধ্যায় পথটা থাকে প্রায় জনহীন। নির্জন হোক, পথটা নিরাপদ। ...
>
> খানদশেক কুঁড়ের নামহীন গাঁয়ের কাছে এসে হাঁপ ধরে রাঘবের। ... দশ কুঁড়ের গাঁ যেন জনহীন।—কুকুর পর্যন্ত ডাকে না। পথের পাশে জলায় শালুক ফুটেছে আগুন্তি-দু'মাস আগে পর্যন্ত এই শালুকের ফসল তুলে প্রাণ বাঁচিয়েছে এই বস্তি-গাঁগুলির স্ত্রী-পুরুষ—অবশ্য সবাই নয়। পরের গাঁয়ে রাঘবের ঘর, ফুলবাড়ী আর মালদিয়ার প্রায় মাঝামাঝি। এটাকে মোটামুটি গাঁ বলা যায়। ... সাত আট রশি দূরে খান ত্রিশেক ঘরের নামওয়ালা বস্তিগাঁ, এটাও যেন খানিক আগের দশকুঁড়ে গাঁ-টার মতো নিঃশব্দ, জনহীন, মৃত। উলঙ্গ ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ছুটে আসে না পয়সা ভিক্ষা করতে, পথ দিয়ে পথিক কেউ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, তাতে যেন কিছু এসে যায় না তাদের। ... এই জলাজঙ্গল, কুঁড়ে, পথ আর এই গামছা পরা মানুষ এসব পুরনো সব কিছু যেন নতুন নতুন মনে হয়, গাঁয়ের শব্দহীন স্তব্ধতায়।[৪৯]

রাঘব বস্ত্রহীন নরনারীর জন্য কিছু কাপড় চায় গৌতমের কাছে। সে 'হুমড়ি খেয়ে পড়ে গৌতমের পায়ে। দুহাতে দুপা চেপে ধরে বলে, আজ চলাচলি নাই বাবা ঠাকুর। কাপড়গুলো মোদের দিয়ে তুমি

---

[৪৮] *তদেব*, পৃ. ২৭৮।

[৪৯] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রাঘব মালাকার', *মানিক গ্রন্থাবলী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৯-৩২১।

যাওগে। দানছত্তর করে যাও বাবাঠাকুর কাপড়গুলো। মোদের ঘরে মেয়ে বৌ ন্যাংটো হয়ে আছে গো।'[৫০] কিন্তু গৌতমের হৃদয় গলে না রাঘবের কাতর আহ্বানে। গৌতমের কাছে প্রথমে দান চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর বাধ্য হয়ে বস্ত্রলুটের ব্যবস্থা করে রাঘব। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী গৌতমকে হত্যা করতে চেয়েছিল গ্রামবাসী। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধির জোরে কৌশলে বেঁচে পালিয়ে যায় সে। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে আনোয়ার ও ভোলারা যা করতে পারে না রাঘব ও তার গ্রামবাসী তা করে। লুণ্ঠিত কাপড়ের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে দাঙ্গায় দুজন খুন হয় আর আহত হয় অনেকে। রাঘবের মাথাও ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই। তবুও গৌতম অবৈধ কাপড়গুলোর বৈধ দলিলপত্র দুর্নীতির মাধ্যমে সংগ্রহ করে পুলিসের সহায়তায় পরদিনই আঘাত হানে রাঘব ও তার গ্রামবাসীর ওপর। রাঘব মালাকার কারাগারে বসে মহাভারতের কাহিনী মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে।[৫১]

'কৃপাময় সামন্ত' গল্পেও বস্ত্র সংকটের চিত্র লক্ষণীয়। ভূধর মহাজনের পুকুর ঘাটে গ্রামের বৌ-ঝিরা স্নান করতে ও জল নিতে আসে 'ছেঁড়া ন্যাকড়ায় কোনমতে কিংবা খানিকটা লজ্জা' ঢেকে। সোনা জেলের বৌ সামান্য একটু কাপড়ে তার যৌবন-উথলানো তাজা দেহটার অংশ বিশেষ ঢেকে মাছ বিক্রি করে। কৃপাময়ের পুত্রবধূ স্বামীর 'ছেঁড়া সেলাই করা গেঞ্জি গায়ে' দিয়ে কোনমতে লুঙ্গি পড়েছে। কৃপাময় খানিকটা লাউ এবং কিছু পরিমাণ চিংড়ি সংগ্রহ করলেও ঘরে তার চাল বাড়ন্ত। দুর্ভিক্ষ-কালীন বস্ত্র সংকটের বিষয়টি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন', সুবোধঘোষের 'তমসাবৃতা' প্রভৃতি ছোটগল্পেও পরিস্ফুট হয়েছে।

চার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ভিক্ষ-বিষয়ক গল্পগুলো ১৯৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দের মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত। গ্রামের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর ছিল গভীর মমত্ববোধ। তিনি গভীর অভিনিবেশে গ্রামাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের জীবন চিত্রের পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষ সমাজের মধ্যবিত্তদের দ্বারা নানাভাবে শোষিত-নির্যাতিত। দুর্ভিক্ষে গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ বিপর্যস্ত হয়েও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় তৎপর। গ্রাম্য মহাজন-জমিদার-সম্পন্ন গৃহস্থ-অসৎ ব্যবসায়ী ও কালোবাজারিদের কাছে দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষ দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাবে নিঃস্ব হয়ে পরিবার-পরিজনকে ত্যাগ করে বা সঙ্গে নিয়ে শহরে গিয়েও কোনো সুবিধা করতে না পেরে পুনরায় গ্রামে ফিরে এসেছে। দুর্ভিক্ষে নারীরা বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। পিতা তার কন্যাকে দু'মুঠো অন্নের জন্য নারী ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দিয়েছে, স্বামী তার স্ত্রী-সন্তানকে অনাহারে রেখে পালিয়ে গিয়েছে। পুরুষ অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে খাদ্যাভাবে বিপর্যস্ত নারীরা অনেক সময় অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে গ্রাম্য মহাজন বা নারীব্যবসায়ীর কাছে। দুর্ভিক্ষ শেষে অবশ্য ভুক্তভোগী নারীদের গৃহে আশ্রয় দিয়েছে তাদের স্বামীরা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষ-বিষয়ক গল্পগুলিতে কেবল দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর চিত্রই আঁকেননি, এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে বাঁচার সংগ্রামও দেখিয়েছেন। সমালোচকের ভাষায় 'দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরে অনাহারী, অসহায়, উলঙ্গ মানুষের দুর্দশাকে অনেক সাহিত্যিকই সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। কিন্তু মানিক তাকে চিত্রিত করেছেন অন্যরূপে, অন্যভাবে। সামাজিক মানুষের বেঁচে থাকার দাবিকে বিচার করেছেন সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে।'[৫২] এই দৃষ্টিকোণ হলো সকল বিপর্যয় শেষেও সর্বহারা নিঃস্ব মানুষের ঘর বেঁধে বাঁচার স্বপ্ন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ভিক্ষ-আশ্রয়ী গল্পগুলিতে এ বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে এবং এ গল্পগুলো ছোটগল্প হিসেবে সার্থক।

---

[৫০] *তদেব*, পৃ. ৩২২।
[৫১] *তদেব*, পৃ. ৩১৯।
[৫২] শিখা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৭।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২

বিশ শতকে নারী রচিত বাংলা উপন্যাসে নারী-শিক্ষার স্বরূপ

মোহাং শাহ্ কামাল ভূঁঞা*

Abstract: In the beginning of the 20th century, the women of Bangladesh were deprived of the opportunity of modern education. The social superstitions have created obstacles in the way of their education. The perception of women's freedom has been enriched by the efforts of Begum Rokeya and some other social workers in this time and the obstacles have been decreasing gradually. In the second stage of 20th century the importance of women education had been increased and they have come forward in every sphere of education rapidly. The picture of the condition of women education has been reflected in the novel written by Bangladeshi women. In this article, there is an effort for the observation of the condition of women education of Bangladesh pictured in the Bangla novel by the women of 20th century.

পটভূমি

বাংলাদেশে নারী-শিক্ষার ইতিহাস সুদীর্ঘ নয়। উনিশ শতকে ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত এ অঞ্চলে (পূর্ববঙ্গে) মুসলিম মহিলাদের শিক্ষার হার ছিল প্রায় শূন্যের কোটায় (বেগম, ১৯৯৩: ৩৯)। বিশ শতকের প্রথম দশকে তা (সাক্ষরতা) শতকরা এক ভাগে উন্নীত হয় (বেগম, ২০০২: ৭১)। হিন্দু নারী-শিক্ষার উদ্যোগ-আয়োজনও ছিল পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা কেন্দ্রিক। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনই সর্বপ্রথম পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও চট্টগ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। তবে তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহ দীর্ঘস্থায়ী হতে সক্ষম হয়নি (বেগম, ১৯৯৩: ৪০-৪১)। পরবর্তী উদ্যোক্তা হিসেবে ১৮৪৯-৫০ সালে এলিয়ট বেথুনের অন্যতম সহযোগীরূপে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন (ঘোষ, ১৯৭৩:২১১)। কিন্তু তখন সমাজের সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর মন থেকেও স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলির একটিও দূর হয়নি। এ পরিস্থিতিতে বিদ্যাসাগর ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে-র নেতৃত্বে বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের কাজে সহযোগী হন (ঘোষ, ১৯৯৩: ২২৩)। অবশ্য তাঁর এ প্রচেষ্টা ভারত সরকারের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়, পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে প্রসারিত হয়নি।[১] সেই সুদূর অতীতে, যখন পূর্ববঙ্গে

---

* ড. মোহাং শাহ্ কামাল ভূঁঞা সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ।

[১] নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮-এ কয় মাসে বিদ্যাসাগর যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তা হচ্ছে হুগলী জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি, নদীয়ায় ১টি। বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৩০০ (ঘোষ, ১৯৭৩:২২৩)।

নারী-শিক্ষার কোনো উদ্যোগই সফল হয়নি, তখন নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান বালিকাদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য কুমিল্লা শহরে নিজ নামে প্রতিষ্ঠা করেন ফয়জুন্নেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (এটি বর্তমানে কলেজে রূপান্তরিত)। ১৮৭৫ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইডেন কলেজ। পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গে নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে "ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী" (১৮৮৩)-র আবদানও উল্লেখযোগ্য (বেগম, ১৯৯৩:৪৫)। এত উদ্যোগ-আয়োজনের পরও ১৯১৬ সাল পর্যন্ত এ দেশে একটি মুসলিম বালিকাও মেট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হয়নি।[২] এ সময় বাংলাদেশের রংপুর জেলার সন্তান, মুসলিম নারী-শিক্ষা কার্যক্রমে কিংবদন্তীতুল্য, বেগম রোকেয়ার নারী-শিক্ষা প্রসারের সকল কর্ম-প্রচেষ্টা ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমও ছিল উর্দু।[৩] তবে কালক্রমে তাঁর নারী-শিক্ষা আন্দোলন পূর্ববঙ্গের নারী-সমাজকে প্রভাবিত করে। এ হিসেবে বাংলাদেশে নারী-শিক্ষার প্রচলন ও প্রসারে নারীদের অবদানই অধিক বলে বিবেচিত এবং ফয়জুন্নেছাই এ কার্যক্রমের অগ্রপথিক (বেগম, ১৯৯৩ : ৪৮)।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে এ দেশে নারী-শিক্ষা প্রসারে যেসব বাধা ও প্রতিকূলতা (যেমন, সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, বাল্যবিবাহ, নারী-শিক্ষার বিষয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিতর্ক প্রভৃতি) বিদ্যমান ছিল; ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকেও তার অবসান ঘটেনি (আলম, ১৯৯৮ : ৬৩-৭৬)। এ সময় মুসলিম পরিবারের মেয়েদের ধর্মশিক্ষা ছাড়া অন্যান্য আধুনিক শিক্ষা (যেমন—বাংলা, ইতিহাস, ইংরেজি, গণিত ইত্যাদি) নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য এ প্রতিকূল প্রতিবেশেও কোনো কোনো নারী স্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত হতে সক্ষম হয়েছেন। ষাট ও সত্তরের দশক থেকে নারী শিক্ষার বাধাসমূহ ধীরে ধীরে দূর হতে থাকে এবং সমাজে নারী-শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। সত্তর, আশি ও নব্বইর দশকে নারী-শিক্ষা বিষয়ে সরকারের জাতীয় নারী উন্নয়ননীতি ও পঞ্চবার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। নব্বইর দশকে বাংলাদেশের নারী-সমাজ শিক্ষার সকল স্তর ও বিভাগে সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়। বিশ শতকের নারী রচিত বাংলা উপন্যাসে বাংলাদেশের নারী-শিক্ষা পরিস্থিতির এ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।[৪]

উপন্যাসে নারী শিক্ষা পরিস্থিতি

বিশ শতকের প্রথমার্ধে নারী রচিত বাংলা উপন্যাসে বাংলাদেশের নারী-শিক্ষা পরিস্থিতির তেমন প্রতিফলন ঘটেনি। ষাট ও সত্তরের দশকে রচিত কোনো কোনো উপন্যাসে শিক্ষিত নারীর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশের নারী রচিত উপন্যাসসমূহে নারী-শিক্ষার অতীত প্রেক্ষাপট ও বর্তমান প্রসঙ্গের উপস্থাপন শুরু হয়।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে নারী রচিত বাংলা উপন্যাসগুলির মধ্যে বেগম রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ উপন্যাসটির পটভূমি কলকাতা হলেও এতে চিত্রিত তারিণী-ভবনের 'বিদ্যালয় বিভাগে' বেগম রোকেয়ার নারী-শিক্ষা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি, নারী-শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য,

---

[২] সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী: স্ত্রী-শিক্ষা, ১৯১৬: উদ্ধৃত করেন আনিসুজ্জামান: মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ২০০১, প্যাপিরাস: ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৭৫।

[৩] ১৯১১ সালে বেগম রোকেয়া কলকাতায় স্থাপন করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্কুল'; যেটি ১৯৩১ সালে হাই স্কুলে উন্নীত হয়।

[৪] বর্তমান নিবন্ধে বিশ শতকে রচিত ১৯ জন মহিলা ঔপন্যাসিকের প্রতিনিধিত্বশীল ২৭টি উপন্যাসে চিত্রিত বাংলাদেশের নারীশিক্ষা পরিস্থিতির স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশিত (১৯৭১-১৯৯৫ খ্রি. পর্যন্ত) উপন্যাসগুলির ওপরই অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এ পঁচিশ বছর কালসীমায় রচিত উপন্যাসসমূহে বিশ শতকের বাংলাদেশে নারী-শিক্ষার সার্বিক চিত্র তথা গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজে নারী-শিক্ষার গুরুত্ব, বিষয়, বিবর্তিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও অন্তরায়সমূহের প্রতিফলন ঘটে।

নারী-শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষা-পদ্ধতি প্রতিফলিত হয়েছে।[৫] তারিণী-ভবন পরিকল্পনায় তাঁর স্কুল পরিচালনার অভিজ্ঞতা রূপায়িত হয়েছে। রোকেয়ার সমকালে অবিভক্ত বাংলার কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে নারী-শিক্ষানীতি ও কর্ম-কৌশল প্রণয়ন এবং এর সফল বাস্তবায়ন ও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা দুরূহতম কাজ ছিল।[৬] এ প্রতিকূল পরিবেশেও বেগম রোকেয়া অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন। 'পদ্মরাগ'-এ প্রতিষ্ঠিত তারিণী-ভবনের বিদ্যালয় বিভাগে ব্রাহ্ম, হিন্দু, খ্রিস্টান ও মুসলমান শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী রয়েছে।

শুধু সরকারের সাহায্য-সহযোগিতা ও অর্থ-বরাদ্দের দিকে তাকিয়ে থাকলে নারী শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ যে সম্ভব নয়—বেগম রোকেয়া আন্তরিকভাবে তা উপলব্ধি করেছেন। এক্ষেত্রে সমাজের বিদ্যানুরাগী বিত্তবানদের এগিয়ে আসা জরুরী। 'পদ্মরাগ'-এ তারিণী-ভবন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মাধ্যমে বেগম রোকেয়া এমন উদাহরণই উপস্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ 'Sultana's Dream' (১৯০৮)-এ সুলতানার স্বপ্নে তিনি এমন নারীস্থান প্রত্যক্ষ করেছেন।[৭]

বেগম রোকেয়ার সমসাময়িক নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী সামান্য গৃহশিক্ষাকে অবলম্বন করে সাতটি উপন্যাস রচনা করলেও নারী-শিক্ষা বিষয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনা বেগম রোকেয়ার চেয়ে অগ্রসর ছিল না।[৮] তাঁর উপন্যাসে গার্হস্থ্য পরিবেশ, রোমান্সরস ও ইতিহাসপ্রীতি লক্ষ করা গেলেও তাতে সমকালের ধর্মীয় প্রভাব, সামাজিক আন্দোলনের মত্ততা ছিল অনুপস্থিত (রহমান, ১৯৯১: ৪৯৪)।

দিলারা হাশেমের 'ঘর মন জানালা' (১৩৭২) উপন্যাসে প্রবেশিকা পাশ নাজমার উপস্থিতি লক্ষ করি। এ সময় নিম্নবিত্ত পরিবারেও নারী-শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষিতা নারীরা তাদের অর্জিত শিক্ষাকে অর্থোপার্জনের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে। উপন্যাসে চিত্রিত নিম্নবিত্ত পরিবারের বড় সন্তান নাজমা প্রবেশিকা পাশের পর পরই অর্থের সন্ধানে চাকরিতে যোগদান করে। নীলিমা ইব্রাহীমের 'বিশ শতকের মেয়ে' (১৯৫৮) উপন্যাসেও শিক্ষিতা নারীর পদচারণা পরিদৃষ্ট হয়।

---

[৫] "... যে বালিকার কেহ নাই, সে কোথায় শিক্ষা লাভ করিবে? তারিণী-বিদ্যালয়ে। ... দেশের সুশিক্ষিতা মহিলাদের সহিত পরামর্শ করিয়া দীন-তারিণী নিজেই পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করেন। ... বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র-সবই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন। ... নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষত তাঁহারা আত্মনির্ভরশীলা হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী-পুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় (পদ্মরাগ, পৃ. ২৯৭-২৯৯, বেগম রোকেয়া রচনাবলী, ১৯৯৩)।

[৬] বিদ্যালয় পরিচালনা তথা শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা-প্রশাসনের চিত্রও 'পদ্মরাগ'-এর ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে ('বিদ্যালয়ে দরবার'-এ) পরিদৃষ্ট হয়। তাতে ছাত্রীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিচর্যা, উন্নত চরিত্রপঠন ও ফলাফলের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার প্রদান, যাতায়াত ব্যবস্থা, অভিভাবকদের অভিযোগ পর্যালোচনা ও তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় পরিলক্ষিত হয়।

[৭] যেখানে নারীদের অসাধারণ জ্ঞান-প্রতিভার বিকাশ দেখে সুলতানা নিজের আত্মার মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও আত্ম-প্রত্যয় অনুভব করে খুবই উৎফুল্ল হয়েছে। নারী যে ক্ষমতা সম্পন্ন, সে-যে পুরুষের মতো, এমনকি তার চেয়েও অধিক প্রতিভাবতী হতে পারে—তার শক্তিকে জাগ্রত করলে সে-যে পুরুষের বিন্দুমাত্র সাহায্য ছাড়াই পৃথিবীতে নির্মল সৌন্দর্য, সম্পদ ও কল্যাণের বিরাট ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে, তা সুলতানার স্বপ্নে চিত্রিত 'Lady land'-এর নারীদের ক্ষমতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বেগম রোকেয়া অতি-অসহায় বাঙালি নারী হৃদয়ে আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-শক্তির বীজ বপন করেছেন। (আবুল হুসেন: Sultana's Dream. *সাধনা*, ১৩২৮ সন, বেগম রোকেয়া রচনাবলীতে সংকলিত, পৃ. ৫৫৫-৫৬।)

[৮] 'স্বপ্নদৃষ্টা' (১৯২৪), 'জানকীবাঈ বা ভারতে মোসলেম বীরত্ব' (১৯২৪), 'আত্মদান' (১৯২৫), 'নিয়তি', 'ভাগ্যচক্র', 'বিধিলিপি' ও 'গাঙ্গুলী মশায়ের সংসার' (১৯২৮)।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। সৈয়দা লুৎফুন্নেসার 'রাজনন্দিনী' (১৯৭১)-তে সোনাগাঁয়ের জমিদার বখতিয়ার চৌধুরী তাঁর মেয়ে মমতাজকে 'খান্দানীর ইজ্জতের অজুহাতে' গৃহশিক্ষক রেখে লেখাপড়া শেখাননি। কিন্তু প্রথমা পৌত্রী জহরত আরাকে কলকাতা থেকে মেম শিক্ষয়িত্রী এনে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছিলেন (পৃ. ৭৮)। এ সময়ে মুসলিম পরিবারের মেয়েদের বাংলা শিক্ষার ব্যাপারেও বাধা-নিষেধ ছিল। এ পরিস্থিতিতেও সামস রাশীদের 'পঞ্চালিকা' (১৯৭৬)-তে কাঞ্চন পুরের জমিদার-পত্নী রাবেয়াকে দেবর হাসানের সহযোগিতায় সুশিক্ষিতা হতে দেখি। রাজিয়া খানের 'প্রতিচিত্র' (১৯৭৬)-এর সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের কিশোরী আয়েশাকে ওর অভিভাবক পৃথক পৃথক গৃহশিক্ষক রেখে ধর্মীয় (কুরআন) শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

সামস্ রাশীদের 'পঞ্চালিকা (১৯৭৬)-এ বিশ শতকের প্রথম দিকে নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও নারী-শিক্ষা সম্পর্কিত নতুন চেতনা সঞ্চরিত হতে দেখি। এ সময় সাহা, শুঁড়ি, ধোপা ও নাপিত শ্রেণীর অভিভাকেরা তাঁদের মেয়েদের শিক্ষা প্রদানে এগিয়ে এসেছেন। বগুড়ার আদম পুকুরের কাশী কামার তাঁর আট বছরের কন্যা পদ্মাকে 'বাবুদের' মতো লেখা-পড়া শেখাতে চেয়েছেন। রাবেয়া খাতুনের 'মোহর আলী' (১৯৮৫) উপন্যাসে বিশ ও ত্রিশের দশকে সাধারণ মুসলিম পরিবারের শিক্ষানুরাগী কিশোরী-তরুণীর সাক্ষাৎ পাই। লক্ষণীয়, এ সময় মুসলিম সমাজে নারী-শিক্ষার বিষয় বা ধরন সম্পর্কিত স্ববিরোধী ও পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। মোহর আলী তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা অন্তরাকে বাংলা শিক্ষার জন্যে নিজেই উদ্যোগী হয়ে পুষ্পবতীর পাঠশালায় ভর্তি করিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা কমলার ক্ষেত্রে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা তথা কুরআন শিক্ষা দানই যথেষ্ট মনে করেছেন। কমলার মা পেয়ারাজানের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন্তব্য থেকেও সাধারণ মুসলিম পরিবারের মেয়েদের বাংলা শেখার বিরোধিতার কারণ সম্পর্কে জানা যায় : 'বাংলা হরফ মেয়ে লোকের লাগি গজবের মতন' (পৃ. ১৭)। কারণ, 'বাংলা হরফ প্যাটে গেলে মাইয়ারা যে নিলাজ হয়' (পৃ. ৫১)। বাংলা শিক্ষার প্রতি পেয়ারাজানের এরূপ বিরোধিতার প্রধান কারণ, তাঁর লেখা-পড়া জানা জ্যেষ্ঠ কন্যা অন্তরার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। এজন্যে শ্বশুর-বাড়ির লোকজনও তাকে সুনজরে দেখেননি এবং শুধু এ অপরাধেই তাকে স্বামী-সংসার থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। অন্তরার এভাবে স্বামী-পরিত্যক্তা হওয়ার জন্যে পেয়ারাজান তাঁর স্বামীকেই অভিযুক্ত করেছেন।[৯] উল্লেখ্য, তখন শিক্ষিতা মেয়ের উপযুক্ত পাত্র যোগাড় করাও সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। তাই অন্তরাকে অপাত্রেই বিয়ে দিতে হয়েছে। এ বিষয়ে পেয়ারাজান লেখা-পড়ার শুরুতেই অন্তরাকে সতর্ক করেও[১০] ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এগারো বছরের কমলার খুনে 'বিদ্যার বীজ' লক্ষ করে তিনি শঙ্কিত হয়েছেন এবং 'তা ডালপালা ছড়াবার আগে' তাকে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে স্বামীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন। নারী-শিক্ষা সম্পর্কে এ আশঙ্কা সমকালীন সামাজিক ইতিহাসেও লক্ষ করি (মুরশিদ, ১৯৯৩ : ৭৪)।

উনিশ শতকের তিরিশের দশকে হিন্দু সমাজে নারীর বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে বিধবা হওয়ার যে কুসংস্কার প্রচলিত ছিল (আলম, ১৯৮৯ : ৫২), মোহর আলীর প্রতি কমলার একটি প্রশ্ন থেকে প্রতীয়মান হয়, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মুসলিম নারী সমাজেও বাংলা শিক্ষা গ্রহণ করলে বিধবা হওয়ার একই ভীতি ও সংশয় বিদ্যমান ছিল।[১১]

সুতরাং নারী-শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের স্ববিরোধী মনোভাব, উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ার আশঙ্কা, শিক্ষিতা মেয়ের দাম্পত্য দ্বন্দ্বের নজির, সামাজিক কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিশ

---

[৯] "বিদ্যাধরী করার সখ আছিলো মেয়েকে ফরাসী শেখাতে। মানেফানে বুঝতো না। বাংলা শিখে, মানে জেনে মেয়ে হয়েছে দেমাগী। অখন সামলাও।" (মোহর আলী, পৃষ্ঠা: ১৯)।

[১০] "বিদ্যাবতী তো হইতাছিস। দুলা জোটাতে পরাণ বার হয়া যাবে তর বাপের।" (মোহর আলী, পৃ. ১৭)।

[১১] "আচ্ছা বাবা, লেখাপড়া শিখলে মেয়ে লোকেরা বিধবা হয়-কথাটা কি ঠিক? (মোহর আলী, পৃ. ২০)।

শতকের তিরিশের দশক পর্যন্ত নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। সমকালীন সামাজিক ইতিহাসেও অনুরূপ তথ্য চিত্র লক্ষণীয় (আলম, ১৯৯৮ : ৬৩)।

বিশ শতকের ষাটের দশক থেকে গ্রামীণ সমাজে শিক্ষিতা নারীর উপস্থিতি 'সীমিত হলেও' লক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে। রাজিয়া মজিদের 'নক্ষত্রের পতন' (১৯৮২)-এর রাকিবা গ্রামীণ স্কুলের মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রী, তাদরেই একজন। সত্তরের দশক থেকে নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রামীণ সমাজে যুগান্তকারী চেতনার বিকাশ ঘটে। সাধারণ পরিবারের অভিভাবকেরাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, মেয়েদের লেখাপড়া না শেখালে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা লক্ষ করি, রাবেয়া খাতুনের 'ই-ভরা বাদর মাহ ভাদর' (১৯৮৮)-এ সখী পুরের সবুর ব্যাপারী নারী-শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেন[১২] এবং নিজের মেয়ে জোবেদাকে, গ্রামের স্কুলের-দশম শ্রেণীর ছাত্রী, লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বেশি বয়সেই উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মেয়েদের দাম্পত্য সুখ-শান্তির কথা বিবেচনা করেই অভিভাবকেরা এভাবে নারী-শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

নূর হাসনা লতিফের 'মুক্ত অভ্র' (১৯৮৮)-এ লক্ষ করি, আশির দশকে গ্রামের সাধারণ পরিবারের মেয়েরাও উচ্চ শিক্ষার জন্যে শহরমুখী হয়েছে। এ উপন্যাসের পারুল মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। তার অনুসরণ ও অনুপ্রেরণায় কদমতলী গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সুমি স্বচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যয়ন করেছে। তার লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহের উৎস সম্পর্কে পারিবারিক (মা-বাবার) বিতর্কের[১৩] মধ্য দিয়ে নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে ঐ সময়ের অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সুমির মা মরিয়ম বেগম মেয়েকে টাকা খরচ করে উচ্চ শিক্ষা দানের ঘোর বিরোধী। কিন্তু সুমির বাবা উপলব্ধি করেন, তাঁদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। আধুনিক যুগের মেয়েদের লেখাপড়ার সাথে আরো অনেক কিছু শিখতে হয়। এতে মেয়েদের ভালোপাত্রে বিয়ে হবার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়, যা গ্রামে থেকে অসম্ভব। লেখিকা মরিয়ম বেগমের উপলব্ধিতেও এ চেতনা সঞ্চারিত করে গ্রামীণ নারী-সমাজকে জাগ্রত করতে প্রয়াসী হন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা লক্ষ করি, গ্রামীণ সমাজে বিশ ও তিরিশের দশকে নারী-শিক্ষাকে দাম্পত্য সংঘাতের অন্যতম কারণ-হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও পরবর্তী দশকগুলোতে এ ধারণার ক্রম পরিবর্তন সাধিত হয়। সত্তরের দশক থেকে নারী-শিক্ষা উপযুক্ত বর প্রাপ্তির যোগ্যতা এবং দাম্পত্য সুখ-শান্তির আকর হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আশির দশকে নারী-সমাজ শিক্ষাকে স্বাবলম্বী হওয়ার উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নূর হাসনা লতিফের 'এক দিগন্তে দৃষ্টি' (১৯৮৯)-তে বিধবা নারী শিউলী পরিণত বয়সে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। সে অসীম সাহস, দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় ও সংগ্রামী চেতনায় বলীয়ান হয়ে নিজের নির্মম ভাগ্যের পরিবর্তন সাধন করে পুরুষশাসিত সমাজের যাঁতাকলে পিষ্ট নারীদেরও প্রেরণার উৎস হয়েছে। উল্লেখ্য, শিউলী শুধু নিজের কল্যাণ সাধনই করেনি, সে 'মধুপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি' গঠন করে সমাজের অসহায় নারী-সমাজকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে বাঁশ, বেত ও চামড়ার দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি এবং হাঁস-মুরগি পালনে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেছে। আরেফা আহসান রত্নার 'শেষ পরিচয়' (১৯৯৪)-এ শাকতলা গ্রামের মুন্সী আবদুর রহিমের বিধবা স্ত্রী রাশেদা খানম নিজের জীবন থেকে উপলব্ধি করেছেন, "বর্তমান যুগে

---

[১২] "তা পড়ুক, আইজ কাইল-এট্টু বস্‌সে বিয়া অইলে ক্ষেতি নাই। ... আর চাইর দিকে দেইখা শুইনা এই আক্কলও অইছে বিদ্বান দুলা পাইবার চাইলে কয়নারেও বকলম থাকলে চলে না। অশান্তি অয়।" (ই ভরা বাদর মাহ ভাদর, পৃ. ২৬)।

[১৩] "তোমার আমার যুগ শেষ হয়ে গেছে। এ যুগ অন্য রকম। ঢাকায় থেকে পড়া শুনার সাথে আরও অনেক কিছু শিখবে, মেয়েটার একটা ভালো বিয়েও হতে পারে, যা এ পাড়া গাঁয়ে থেকে সম্ভব নয়।" ('মুক্ত অভ্র', পৃ. ৫২)।

মেয়েদের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন ছেলেদের তুলনায় বেশি" (পৃ. ১৭)। উল্লেখ্য, তিনি নিজের সামান্য শিক্ষাকে অবলম্বন করে ছোট মেয়ে রীমার লেখা-পড়া অব্যাহত রেখেছেন।

বিশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকের মতো চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর ও আশির দশকেও গ্রামীণ সমাজে নারী-শিক্ষা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মখোমুখি হয়েছে। রাজিয়া মজিদের 'নক্ষত্রের পতন'-এ রাকিবার প্রতি স্থানীয় বখাটেদের অবাঞ্ছিত প্রেম নিবেদন এবং রাবেয়া খাতুনের 'ই-ভরা বাদর মাহ ভাদর'-এ জোবেদার অপরিণত বয়সের প্রেম-চর্চার প্রেক্ষিতে অভিভাবকদের রূঢ় নির্দেশে তাদের স্কুলে যাবার পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। দৌলতননেছা খাতুনের 'কমরপুরের ছোট বৌ'-এর রাকা মা-বাবাকে হারিয়ে সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন হয়ে পড়লে তার পড়া-লেখার পাঠ চুকিয়ে যায়। নূর হাসনা লতিফের 'মুক্ত অভ্র'-এর সুমি শিক্ষা জীবনে নিদারুণ দরিদ্রতার শিকার হয়েছে। সেলিনা হোসেনের 'কাঁটাতারে প্রজাপতি'-র গরিব পরিবারের মেয়েরা গ্রামের মোড়ল ও জোতদারদের দেয়া আব্রু বিনষ্ট হওয়ার 'ফতোয়া'র সম্মুখীন হয়েছে। লক্ষণীয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রবীণ নারী-সমাজও নারী শিক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সুতরাং গ্রামীণ সমাজে নারী-শিক্ষার অন্তরায় হিসেবে স্থানীয় বখাটেদের উপদ্রপ, অপরিণত বয়সে প্রেমচর্চা, আশ্রয়হীনতা, দরিদ্রতা, প্রবীণা নারীদের কুসংস্কার, অবরোধ প্রথা প্রভৃতিকে চিহ্নিত করা যায়।

নাজমা জেসমিন চৌধুরীর 'সামনে সময়' (১৯৮১) উপন্যাসে সত্তরের দশকের বিবাহিতা ছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ও শিক্ষা-জীবন চিত্রিত হয়েছে। সাজেদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সের ছাত্রী। তার স্বামী ফিরোজ লনডন প্রবাসী। সহপাঠিনী ও বান্ধবী কুলসুমের সঙ্গে আলাপচারিতা থেকে তার পড়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়। সে স্পষ্টভাবেই বলে, স্বামীর ও নিজের সামাজিক স্ট্যাটাস বৃদ্ধির জন্যেই তার পড়া। এ ছাড়া তার অন্যকোনো 'মহৎ উদ্দেশ্য' নেই (পৃ. ৩৫)। পরীক্ষা শেষে স্বামীর কাছে চলে যাবে সে। কিন্তু ঘন ঘন পরীক্ষা পিছুচ্ছে বলে তার বিদেশ যাবার দিনও পিছুটান দিচ্ছে। সে পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তবুও তাকে পড়তে হয়। "প্রতি মুহূর্তে এই জোর করে পড়া শেষ করবার গ্লানি তাকে আচ্ছন্ন করে থাকে। পড়তে ইচ্ছে হয় না।" (পৃ. ২১)। এভাবে বারবার পরীক্ষা পেছানোর ফলে সে মানসিকভাবে বিপন্নবোধ করে। পড়া ও পরীক্ষার প্রতি সে বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে: "এই কাঁচকলার পরীক্ষার জন্যে ফিরোজের (স্বামীর) কাছে যাওয়া হচ্ছে না।" (সামনে সময়, পৃ. ৩৪)

অবশ্য সাজেদার বান্ধবী কুলসুমের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চাকরি করে স্বাধীন-স্বাবলম্বী জীবন-যাপন করা। এক্ষেত্রে সে স্বামী-শাশুড়ির অসহযোগিতা ও বিরোধিতাকে গ্রাহ্য করেনি; নিজের প্রচেষ্টায় এবং পিতার অর্থ ব্যয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জন করেছে।

চল্লিশের দশক থেকেই নারী-শিক্ষার উদ্দেশ্যগত দৃষ্টিভঙ্গির এ পরিবর্তন সূচিত হয়। যদিও এ সময় নারী-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভালোপাত্রে বিয়ে হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা; চাকরি করে স্বাবলম্বী হওয়া বা জ্ঞানার্জন নয়। সাম্স রাশীদের ' মন প্রসূন' (১৯৮২) উপন্যাসে রাজশাহী শহরের মেয়ে শমী আলীর মধ্যে এ নতুন প্রবণতা লক্ষণীয়। সে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জনের জন্যেই এমএ পড়তে চেয়েছে। তখন মুসলিম পরিবারের অবিবাহিতা মেয়েদের এমএ পড়া সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। অভিভাবকেরা তাঁদের অবিবাহিত মেয়েকে ছেলেদের সঙ্গে 'কো-এডুকেশনে'র পথে বাড়িয়ে দিতে রাজি ছিলেন না। শমীর ক্ষেত্রেও এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মেয়ে মহল থেকেও প্রবল আপত্তি উঠেছে: মেয়েরা বেশি পড়লে চেহারা পুরুষালি হয়ে যায়। তাছাড়া প্রবীণারা নিজেদের সবসময় পুরুষের অধস্তন ভাবতে অভ্যস্ত। তাঁরা মনে করেন, এমএ পাশ করবে শুধু পুরুষেরা। মেয়েরা লেখা-পড়ায় স্বামীর সমকক্ষ হলে দাম্পত্য-জীবনে বনিবনা হয় না। "বিএ পর্যন্ত পড়া মানেই তিনটি পাশ; মেয়েদের জন্য ওই যথেষ্ট। আর বেশি পড়লে বিয়ের বয়স চলে যায়।" (সামনে সময়, পৃ. ১২৮) তাই শমীর বড় বোন মণি তার এমএ পড়ার চেয়ে বিয়ের প্রতিই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। যদিও মণির স্বামী শমীকে বিএ পাশ করার পর বিলেত পাঠানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন সফল না

হলেও এ উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলিম নারী-শিক্ষার নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সত্তরের দশকে মেয়েদের বিলেত গিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সংকল্পে তাঁর এ স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে।

সত্তরের দশকের পটভূমিকায় রচিত আনোয়ারা সৈয়দ হকের 'সোনার হরিণ' (১৯৮৩) উপন্যাসে নারীর উচ্চ শিক্ষা ও বিদেশি ডিগ্রির প্রতি আকৃষ্ট হবার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নাজমা ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রী। তার হবু বর বিলেত প্রবাসী। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরপরই তার বিয়ে হয়ে যাবে। বান্ধবী ছবির সঙ্গে কথপোকথনে তার স্বপ্নের কথা প্রকাশিত হয় : সে বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে বিলেত গিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে। তার বিশ্বাস, "বিদেশে পড়লে আরো নাম হবে।" (পৃ. ৩৮) উল্লেখ্য, নাজমার উচ্চ-শিক্ষার উচ্চাভিলাষের কথা শুনে ছবিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছে। সেও বিলেত গিয়ে অর্থনীতি বিষয়ে পিএইচডি করবে। নাজমা বিয়েকে পড়ার পথে অন্তরায় ভাবেনি, বরং উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ হিসেবে গণ্য করেছে। ফলে বিয়ে স্থির হওয়ার পরও পড়ার প্রতি তার আকর্ষণ বহুগুণ বেড়ে যায়। নাজমা ও ছবির উচ্চ শিক্ষার প্রতি তীব্র আকর্ষণ, বিদেশি ডিগ্রির গুরুত্ব অনুধাবন এবং বিলেতে পড়ার দৃঢ় সংকল্পে সত্তরের দশকের নাগরিক সমাজের মেধাবী মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

আশির দশকের শুরুতে কোনো কোনো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বাধীনচেতা মেয়েকে উচ্চশিক্ষার বিষয় নির্বাচনে নিজের ইচ্ছেকেই প্রাধান্য দিতে দেখা যায়। কোন বিষয়ে পড়লে 'গ্ল্যামার' বৃদ্ধি পাবে—এ ব্যাপারেও তারা পূর্ণ সচেতন। অথচ এ সময়কার সাধারণ চিত্র হচ্ছে মেয়েরা কোন বিষয়ে কোথায় কিভাবে পড়বে—এ ব্যাপারে অভিভাবকেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং মেয়েরা তা মেনে নেয়। আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মেয়েদের স্বাধীন মতামত কিংবা পছন্দ-অপছন্দের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা সম্ভবও নয়। মকবুলা মনজুরের 'বৈশাখে শীর্ণ নদী' (১৯৮৩)-তে অধ্যাপক পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা অবন্তী উচ্চ শিক্ষার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্ণস্বাধীনতা লাভ করেছে। সে মায়ের পছন্দকে গুরুত্ব না-দিয়ে 'ইংরেজি সাহিত্যে' উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জেদ ধরেছে। তার নিকট 'ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট' সবচেয়ে বেশি 'গ্লামারাস'। লক্ষণীয়, অবন্তী পড়া-শোনাকে জীবনের সবচেয়ে 'জরুরি ব্যাপার' মনে করেনি বরং জীবনের অন্যান্য 'সখের আইটেমে'র মতোই ধরে নিয়েছিল। তাই সে 'সিরিয়াস'ভাবে পড়েনি, পরীক্ষা দেয়নি। আর 'রেজাল্ট'ও 'থার্ডক্লাস'। অবন্তীর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য, প্রচেষ্টা ও ফলাফলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, নারী-শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও যথার্থ জ্ঞানার্জন না হলে তাতে সাফল্য আসে না।

প্রবাসী বাঙালি অভিভাবক মাত্রই মেয়েদের শিক্ষার রুচিশীল ও নিরাপদ পরিবেশের জন্যে উদ্‌গ্রীব থাকেন। নাজমা জেসমিন চৌধুরীর 'ঘরের ছায়া' (১৯৮৪)-তে অভিভাবকদের এ উদ্বেগের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ইংল্যান্ড-প্রবাসী সাদিয়ার মা-বাবা তার লেখা-পড়া ও নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কারণ, ইংল্যান্ডে উঠতি বয়সের মেয়েদের নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়। সত্তরের দশকে সাদিয়ার মা ওকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন এবং গ্রীন রোডে একটি অত্যাধুনিক ডিজাইনের বাসা ভাড়া নিয়ে মেয়েকে কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন। বাসায় অনাকাঙ্ক্ষিত আত্মীয়-স্বজন এলে ওর মা ওকে অন্যত্র নিরিবিলি স্থানে রেখে আসেন। তখন ঢাকার সব এলাকার পরিবেশও মেয়েদের জন্যে নিরাপদ ছিল না।

রাজিয়া মজিদের 'দাঁড়িয়ে আছি একা' (১৯৮৭) উপন্যাসের সারা ব্যাংকার মুনিম খানের স্ত্রী। সন্তানের লেখাপড়ার পরিবেশের ব্যাপারে তিনিও অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। আশির দশকে তাঁর ছোট মেয়ে রুমার স্কুলে যাবার বয়স হলে তাকে স্কুলে ভর্তি এবং পুরানো ঢাকা থেকে ভালো পরিবেশে বাসা বদলের জন্যে তিনি স্বামীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তাঁর স্বামী অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় সন্তানদের লেখাপড়ার দিকে খেয়াল রাখতে ব্যর্থ হলে তিনি উদ্বিগ্ন ও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন :

"মেয়েটার যে স্কুলে যাবার বয়স হলো, খেয়াল আছে? শুধু দিনরাত অফিস, অফিস? ঘর-সংসার গোল্লায় যাক, তাতে ক্ষতি কি?" (দাঁড়িয়ে আছি একা, পৃ. ৫৫)।

সারার এ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে আশির দশকে কন্যা সন্তানের শিক্ষার পরিবেশ-সচেতন মায়ের মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। এ সচেতনতার ফলে মুসলিম সমাজে নারী-শিক্ষার প্রসার ঘটে; যা পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশকেও, কতিপয় চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীর পরিবার ছাড়া অন্যত্র, পরিলক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ এসময় উদীয়মান মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরাই অত্যন্ত ক্ষীণভাবে শিক্ষার আলো দেখতে শুরু করে। রাবেয়া খাতুনের 'পাখীসব করে রব' (১৯৮৭)-এ পঞ্চাশের দশকে ঢাকা শহরের নারী-শিক্ষার এ চিত্র অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। তখন হিন্দু সমাজের মেয়েরাই শিক্ষা-ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল। হিন্দু নারীর এ অগ্রগতির ধারা বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই লক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে। উল্লেখ্য, সাম্স রাশীদের 'পঞ্চালিকা' (১৯৭৬)-তে হিন্দু সমাজের নারী-শিক্ষা সচেতনতার এ চিত্র দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

আশির দশকে নাগরিক সমাজের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে নারীর উচ্চশিক্ষাকে স্বামীর মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক হিসেবেই দেখা হয়েছে। জাহানারা ইমামের 'নয় এ মধুর খেলা' (১৯৯০)-তে এ সমাজ বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়। সাব্রিনা মেডিকেলের ছাত্রী। ইন্টার্নিশীপ করার সময়ই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও জ্ঞাতি ভাই রাশেদের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ডাক্তারি পাশের পর তার চাকরি করা না-করা নিয়ে স্বামী-শাশুড়ির দৃষ্টিভঙ্গি ও বাধা তার শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করেছে। তাঁরা চাননি যে সে চাকরি করুক। তার শাশুড়ি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, "ঘরের বউ চাকরি করলে সংসারের শ্রী থাকে না।"[১৪] স্বামী-শাশুড়ির বাধা অগ্রাহ্য করে সাব্রিনা একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি গ্রহণ করেই উপলব্ধি করেছে, তার স্বামী ডাক্তার মেয়ে বিয়ে করেছে শুধুমাত্র সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে, চাকরি করানোর জন্যে নয়। তার ব্যবসায়ী স্বামীর অগাধ টাকা থাকলেও সে নিজের উপার্জনে স্বনির্ভর হতে চেয়েছিল। কিন্তু সে অন্যের অধীনে চাকরি করবে-এটা তার স্বামী মেনে নিতে পারেনি। এ নিয়ে তাদের দাম্পত্য জীবনে 'খিটমিট' শুরু হয়ে গেলে তাকে বাধ্য হয়েই চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছে। সাব্রিনা নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজ-বাস্তবতার যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছে তা হচ্ছে : বাঙালী মেয়েরা এখনো ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ভালো বিয়ে হবার জন্যে।" (পৃ. ২০) ভালোপাত্রে বিয়ে হবার এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মেয়েদের 'ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিং'-এ পড়ার প্রবণতাও দিন দিন বেড়ে চলেছে।

আনোয়ারা সৈয়দ হকের 'তৃষিতা' (১৯৯০)-তে আশির দশকের ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের হোস্টেল জীবন, প্রেম-ভালোবাসা ও দাম্পত্য-বিরহের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, বিবাহিতা ছাত্রীদের সব সময় স্বামী-সন্তানের চিন্তায় মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই লেখাপড়ার পর্ব শেষ করতে হয়। ফলে লেখাপড়ায়, যে মানসিক স্থিতির প্রয়োজন, তা তারা পায় না। তাসমিনা এদেরই একজন। দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পর ওর বিয়ে হয়; তৃতীয় বর্ষে বাচ্চা হয়। বাচ্চা থাকে গ্রামে, মায়ের কাছে। স্বামী বিলেতে। প্রতি সন্ধ্যায় স্বামী ও সন্তানের চিন্তায় তার মাথা বিগড়ে যাবার উপক্রম হয়। সে নিজেকে বন্দিনী মনে করে। এ বন্দিদশাকে তার ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছে। তার আশঙ্কা : পড়াও শেষ হবে না, সেও হয়তো আর কোনদিন স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখের সংসার গড়তে পারবে না। পঞ্চম বর্ষে তার মন একেবারে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে : "হায়রে, কোথায় পড়ে আছে আমার বাচ্চা। কোথায় বা আমার স্বামী। আর আমি এখানে বিদ্যাদিগগজ হবার জন্যে বসে আছি। আর বোধ হয় কোনো দিন ওদের মুখ দেখতে পাব না।" (তৃষিতা, পৃ. ৮৮)

---

[১৪] আনিসা হোসেনের 'পারাবার' (১৯৯৫) উপন্যাসে সান্তনুর শাশুড়িও পুত্রবধূর চাকরি করার ঘোর বিরোধী। তিনি তাকে সরাসরি এর নেতিবাচক দিক তুলে ধরেন : "বাড়ির বৌ বাইরে গেলে স্বামীর মন ঘরে টিকে না।" (পারাবার, পৃ. ১৪)।

বিবাহিতা ছাত্রীদের স্বামী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার এ যন্ত্রণা উপলব্ধি করে অন্য ছাত্রীরাও সচেতন হয়। নাজমা জেসমিন চৌধুরীর 'সামনে সময়'-এ মাস্টার্সের ছাত্রী সাজেদা এ জন্যেই 'সন্তান হবার ঝুঁকি নেয়নি'। তার স্বামী ফিরোজও বিলেত প্রবাসী।

শিরীন মজিদের 'গোলাপী বারুদে নূর হোসেন' (১৯৯১) উপন্যাসে আশির দশকের নাগরিক জীবনে অশিক্ষিত ও বিত্তহীন (বস্তিবাসী) শ্রেণীর নারী-শিক্ষা-পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এ শ্রেণীর মেয়েদের শিক্ষার প্রধান অন্তরায় দারিদ্র্য। তাই শিক্ষাকে তারা ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করে : টাকা খরচ করে ছেলেকে পড়ালে যেমন 'রিটার্ন' পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, মেয়েদের ক্ষেত্রে তেমন নয়। কারণ, মেয়েরা বিয়ের পর পরের ঘরে চলে যায়। কাজেই লেখাপড়া শিখিয়ে কোনো লাভ নেই–এমন ধারণা এদের বদ্ধমূল। তারা মেয়েদের সামান্য বাংলা হরফের জ্ঞান ও কোরান শিক্ষাকে যথেষ্ট মনে করে।[১৫] ঢাকা শহরের বস্তিবাসী নারী মরিয়মের এ দৃষ্টিভঙ্গিতে সমশ্রেণীর নারীদের মনোভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু মরিয়মের চাকরিজীবী ছেলে, বাম রাজনীতির কর্মী, নূর হোসেনের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী-শিক্ষা বিষয়ে প্রগতিশীল চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করি। সে তার ছোটবোন শাহানাকে লেখাপড়া শিখিয়ে 'জজ-ব্যারিস্টার' করার স্বপ্ন দেখে এবং নারী-শিক্ষা বিরোধী মায়ের (মরিয়মের) মনেও এ স্বপ্ন জাগায়[১৬] এবং শাহানাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। নূর হোসেনের উপলব্ধি, সংকল্প ও প্রত্যাশা বিত্তহীন সমাজে নারী-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

আশির দশকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজেও অসচ্ছলতা নারী-শিক্ষার অন্যতম অন্তরায় ছিল। ফলে এ শ্রেণীর অনেক মেধাবী মেয়ে ও গৃহবধূর উচ্চ শিক্ষার সাধ অপূর্ণ থেকে যায়। নাসরীন জাহানের 'উড়ুক্কু' (১৯৯৩)-তে নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে নারী-শিক্ষার এ অন্তরায় ও ব্যর্থতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নীনা তরফদার নিম্নম্যধবিত্ত পরিবারের মেয়ে ও গৃহবধূ। তার পিতা ও স্বামী সামান্য বেতনের চাকুরে। আর্থিক অনটনের কারণে নীনার অনার্স পড়ার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। পাশাপাশি উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েদের শিক্ষাকে শুধু 'ফ্যাশন' হিসেবে গ্রহণ করতে দেখা যায়। 'উড়ুক্কু'-তে উচ্চবিত্ত পরিবারের কিশোরী সিনথির আচরণে তা-ই প্রকাশিত হয়েছে। সিন্থি নীনার নিকট বাধ্য হয়ে স্কুলে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বলে, "(স্কুলে) যাওয়াটা একটা ফ্যাশন, না গেলে চলছে না, সে জন্যে (যাওয়া)"। (উড়ুক্কু, পৃ. ১৯০)

উচ্চবিত্ত শ্রেণীর কিশোরী-তরুণীরা মনে করে, জীবনোপভোগের জন্যে বেশি লেখাপড়া জানার দরকার নেই। সিনথি তার মাকে দেখেই এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, তার মেট্রিক পাশ-করা মা সারাক্ষণ পার্টি, হুল্লোড়, ড্রিংকস ইত্যাদি নিয়েই মেতে থাকেন। যখন-তখন লণ্ডন-ফ্রান্স 'ফ্লাই' করেন। কোথাও আটকে যাচ্ছেন না। সিন্থির বয়স সতের পার হয়নি। তাই মায়ের মতো 'এনজয়' করার অধিকার পায়নি সে, এই যা।

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পাশাপাশি আর্ট কলেজে পড়তেও দেখা যায়। সত্তরের দশকের পটভূমিকায় রচিত জুবাইদা গুলশান আরার 'বিবর্ণ নগরী' (১৯৯৫)-তে ঢাকা আর্ট কলেজের ছাত্রী কান্তাকে দেখতে পাই। সে পারিপার্শ্বিক বাধায় থমকে দাঁড়ায়নি। তখন স্কুল-কলেজগামী ছাত্রীদের জন্যে রাজপথ যে নিরাপদ ছিল না, এ বিষয়ে আমরা ইতঃপূর্বেও সামান্য আলোকপাত করেছি। 'বিবর্ণ নগরী'র রাস্তাঘাটে রয়েছে মাস্তান আর বখাটেদের উপদ্রব। ছাত্রীদের এসব উৎকট বাধা অতিক্রম করেই স্কুল-কলেজে যেতে হয়েছে। তাই মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যাপারে

---

[১৫] "কি হবে মেয়ে মানুষের লেখাপড়া শিখিয়ে? সেই ত বিয়েই দিতে হবে। ওর জন্যে একটু বাংলা হরফ আর কোরানটা পড়াতে পারলেই হলো। এর চেয়ে বেশি দরকার নেই।" (গোলাপী বারুদে নূর হোসেন, পৃ. ১১৫)।

[১৬] "তুমি (মা) দেখে নিও শানু আমাদের লেখাপড়া শিখে জজ ব্যারিস্টার হবে।" (গোলাপী বারুদে নূর হোসেন, পৃ. ১১৫)।

অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাও লক্ষ করার মতো। কান্তার কলেজে যাবার কথা শুনলেই ওর মা আয়েশা বেগম কেন যে ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠতেন, তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, "যে একখানা শহর, পথে ঘাটে তোমরা বেরুলে সারাক্ষণ প্রাণ কাঁপে আমার।" (বিবর্ণ নগরী, পৃ. ৮)

কান্তাদের বাসায় ভাড়াটের স্কুলগামী মেয়ে কাজল বখাটেদের ভয়ে একা বেরুতে সাহস পায় না। কান্তা ব্যক্তিত্ব ও সাহসের জোরে সব উৎকট ঝামেলা অতিক্রম করেছে এবং কাজলকেও সাহসিনী হতে মানসিক শক্তি যুগিয়েছে।[১৭] রাবেয়া খাতুনের 'পাখী সব করে রব'-এ স্কুল-ছাত্রী টোঁভীর স্কুলে যাবার পথে বখাটেদের অরুচিকর কথা লিখে রাখার ঘটনা থেকে জানা যায়, পঞ্চাশের দশক থেকেই মেয়েরা এসব অনাকাঙ্ক্ষিত জঞ্জাল অতিক্রম করে শিক্ষার পথে এগিয়ে চলেছে।

বর্তমান আলোচনায় বাংলাদেশের নাগরিক জীবনে নারী-শিক্ষা পরিস্থিতির যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিভাবকেরা তাঁদের মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন শুধুমাত্র ভালো পাত্রে বিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে শিক্ষা মেয়েদের মানবিক গুণ না হয়ে শুধুমাত্র ভালোপাত্রী তথা শিক্ষিত পাত্রের যোগ্য পাত্রী হওয়ার একটি বিশেষ গুণ হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। শিক্ষিত পুরুষেরা শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করেছে একান্তই নিজের ও পরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে। মেয়েরাও বিয়ের পরপরই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কিংবা বেকার থেকে একথাই প্রমাণ করেছে যে, শুধু ভালোপাত্রে বিয়ের জন্যেই তারা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেছে। এ পরিস্থিতিতে খুব স্বল্প সংখ্যক মেয়েই নিজের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে প্রয়াসী হয়েছে কিংবা বিয়ের পরেও পড়ালেখা চালিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তারা স্বামী ও পিতা-মাতার পূর্ণ সহযোগিতাও পেয়েছে। এমন কিছু স্বাধীনচেতা মেয়েকেও দেখা যায়, যারা শিক্ষাকে 'সখের আইটেম' হিসেবেই বিবেচনা করেছে। উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েরা শিক্ষাকে নিছক 'ফ্যাশন' হিসেবেই গ্রহণ করেছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে জীবন-ভোগের জন্যে অধিক লেখাপড়া জানাটা একান্ত জরুরী নয়। অশিক্ষিত ও বিত্তহীন সমাজের অভিভাবকেরা নারী-শিক্ষার প্রতি তেমন আগ্রহী ও সচেতন নয়; তবে যারা শিক্ষার কিছুটা আলো পেয়েছে, তারা নারী-শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে। আশার কথা এই যে, অশিক্ষিত ও নিম্নবিত্ত সমাজেও নারী-শিক্ষার প্রতি উৎসাহ ও সচেতনতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপজাতীয় নারীর শিক্ষা-পরিস্থিতি

নারী রচিত উপন্যাসে বাংলাদেশের প্রান্তিক সীমানায় বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীর নারীশিক্ষার চিত্র খুবই সামান্য পরিসরে পরিদৃষ্ট হয়। রিজিয়া রহমানের 'একাল চিরকাল' (১৯৮৪) উপনাসে সাঁওতাল ও ওরাওঁ জাতির নারীদের শিক্ষা সচেতন হয়ে ওঠার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ওরাওঁ পাড়ায় স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং মেয়েদের লেখাপড়া শেখা দেখে সাঁওতাল তরুণী মুনির কৌতূহলী হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে উপজাতীয় নারীর শিক্ষা গ্রহণের ইতিবাচক ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। চম্পার নিকট সে জানতে চায়ঃ "হেই মাসী—সত্যি রে! সুনসুনের বউ (ওরাওঁ নারী) নাকি পড়া জানে। গীরজায় ইস্‌কুল দিয়েছে। সেখানে ছেলে মেয়েদের পড়ায়।" (একাল চিরকাল, পৃ. ৯৩)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি'তেও দেখা যায়, বিশ শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকে সাঁওতাল নারীরা লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ সময় শিক্ষিতা নারীদের আর ক্ষেত খামারের কাজে নামতে দেখা যায় না। তারা সরকারি-বেসরকারি অফিসে বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত হয় (জলিল, ১৯৯১: ১০৬)। এক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিতা নারীরা অনেক অগ্রসর।

---

[১৭] "ওদের ভয় করবার কোনো মানে হয় না কাজল। ওরা কি করবে শুনি? করবার ক্ষমতা আছে? তাই বসে বসে কেবল খিস্তি করা। অসভ্যগুলো।" (বিবর্ণ নগরী পৃ. ৬)

রাবেয়া খাতুনের 'নীল পাহাড়ের কাছাকাছি' (১৯৮৫) এবং সেলিনা হোসেনের 'খুন ও ভালোবাসা' (১৯৯০) উপন্যাসে লুসাই ও মণিপুরি মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে দেখা যায়। 'খুন ও ভালোবাসা' উপন্যাসে মণিপুরি মেয়ে রেণুবালাকে স্কুলে যেতে এবং শিক্ষিতা লুসাই তরুণী রুহিনার বাবাকে মেয়ের সংগীত বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্যে শিলং পাঠানোর ব্যাপারে ভাবতে দেখি। লক্ষণীয় যে, ধর্মান্তরিত লুসাই নারীর শিক্ষা, রুচি, পোশাক, সংস্কৃতি ও জীবন যাত্রার মান আদিবাসী লুসাইদের থেকে অনেক সমৃদ্ধ: "বাগানের ভেতর কমলার চেয়ে টকটকে পাহাড়ী মেয়েরা। রঙীন স্কার্ট, সার্ট, স্কার্ফ, ধব ধবে সাদা পিটিসুর সঙ্গে লাল মোজার স্বাস্থ্যবতী যুবতীদের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না।" (নীল পাহাড়ের কাছাকাছি, পৃ. ১০) খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় লুসাই নারীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

উপসংহার

নারী রচিত বাংলা উপন্যাসে গ্রামীণ নারীর জীবন-চিত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর কালে (গ্রামের দরিদ্র পরিবারেও) কন্যা সন্তানের প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ ও আস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় সুনাগরিক রূপে গড়ে তোলার স্বপ্ন ও প্রয়াস প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। নারী-শিক্ষার উদ্দেশ্যগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও শিক্ষার প্রসার ঘটে। তবে এর ব্যাপ্তি সর্বত্র সুবিস্তৃত নয়; অনেকটা সচ্ছল পরিবারগুলোতেই সীমাবদ্ধ। এ পর্যায়ে নারী-শিক্ষা শুধু বিয়ে দেবার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, স্বনির্ভর হবার অবলম্বন হিসেবেও চিহ্নিত ও গৃহীত হয়েছে। অবশ্য নাগরিক জীবনে কেউ কেউ শিক্ষাকে সমাজের উঁচু স্তরে ওঠার সিঁড়ি কিংবা সামাজিক স্ট্যাটাসের সূচক মনে করেছেন। আর উচ্চবিত্ত পরিবারেরর মেয়েদের নিকট শিক্ষা হচ্ছে নিছক ফ্যাশন মাত্র।

বাংলাদেশে নারীর শিক্ষা ও অধিকার সচেতনতার যতই প্রসার ঘটুক না কেন নারী-সমাজ বাল্যবিবাহ ও বহুবিাহের নির্মম পরিণতি থেকে নিস্কৃতি পায়নি। গ্রামীণ সমাজে বহুবিবাহকারী পীর-ফকিরের প্রভাব এবং গ্রাম্য সমাজপতিদের প্রতাপে তাদের জীবন-যৌবন অকালেই বিনষ্ট হয়। নারী-সমাজের একটি অংশ শিক্ষা-দীক্ষায় সচেতন হলেও বৃহত্তর অংশটি বিভিন্ন কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত। তারা ধর্মে অনুমোদিত অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও পুরুষতন্ত্রের ভয়ে প্রতিবাদ করে না। এতে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা যেমন খর্ব হয়, তেমনি লঙ্ঘিত হয় মানবাধিকার। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, নারী-শিক্ষার প্রধান অন্তরায় যে-অসচ্ছলতা তা দূরীকরণে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং পর্যায়ক্রমে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে তাদের অধিকতর উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার বিষয়টি বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের রচনায় তেমন লক্ষযোগ্য প্রাধান্য পায়নি। এ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে নারী শিক্ষার দ্রুত বিস্তার এবং কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নয়নে যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে তা নারীশিক্ষানুরাগী মাত্রই সহৃদয়তার সঙ্গে উপলব্ধি করেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আলোচিত উপন্যাস

আনোয়ারা সৈয়দ হক, *সোনার হরিণ*, ১৯৮৩, সব্যসাচী, ঢাকা।
আরেফা আহসান রত্না, *শেষ পরিচয়*, ১৯৯৪, সাহিত্যমালা, ঢাকা।
জুবাইদা গুলশান আরা, *বিবর্ণ নগরী*, ১৯৯৫, সরদার প্রকাশনী, ঢাকা।
দৌলতননেছা খাতুন, *কমরপুরের ছোট বৌ*, ১৯৮৮, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা।
দিলারা হাসেম, *ঘর মন জানালা*, ১৯৬৫, ঢাকা।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *সামনে সময়*, ১৯৮১, মুক্তধারা (২য় প্রকাশ, ১৯৮৬), ঢাকা ।
ঘরের ছায়া, ১৯৮৪, মুক্তধারা, ঢাকা।
নাসরীন জাহান, *উড়ুক্কু*, ১৯৯৩, মাওলা ব্রাদার্স (৮ম মুদ্রণ, ১৯৯৯), ঢাকা।
নীলিমা ইব্রাহীম, *বিশ শতকের মেয়ে*, ১৯৫৮, ঢাকা
নূর হাসনা লতিফ, *মুক্ত অভ্র*, ১৯৮৮, সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা।
এক দিগন্তে দৃষ্টি, ১৯৮৯, কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী, ঢাকা।
বেগম রোকেয়া, *পদ্মরাগ*, ১৯২৪ (আব্দুল কাদির সম্পাদিত, *বেগম রোকেয়া রচনাবলী*, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা)।
মকবুলা মনজুর, *বৈশাখে শীর্ণ নদী*, ১৯৮৩, রুনা প্রকাশনী, ঢাকা।
রাজিয়া খান, *প্রতিচিত্র*, ১৯৭৬, মুক্তধারা, ঢাকা।
রাজিয়া মজিদ, *নক্ষত্রের পতন*, ১৯৮২, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।
দাঁড়িয়ে আছি একা, ১৯৮৭, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা
রাবেয়া খাতুন, *মোহর আলী*, ১৯৮৫, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।
নীল পাহাড়ের কাছাকাছি, ১৯৮৫,নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।
পাখী সব করে রব, ১৯৮৭, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।
ই-ভরা বাদর মাহ ভাদর, ১৯৮৮ : মুক্তধারা (২য় সংস্করণ, ১৯৯৫), ঢাকা।
রিজিয়া রহমান, *একাল চিরকাল*, ১৯৮৪, মুক্তধারা, ঢাকা।
শিরীন আখতার (শিরীন মজিদ), *গোলাপী বারুদে নূর হোসেন*, ১৯৯১, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।
সাম্স রাশীদ, *পঞ্চালিকা*, ১৯৭৬,রাশীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
মন প্রসূন, ১৯৮২, রাশীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
সেলিনা হোসেন, *কাঁটা তারে প্রজাপতি*, ১৯৮৯, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।
খুন ও ভালোবাসা, ১৯৯০, সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা।
সৈয়দা লুৎফুন্নেসা, *রাজনন্দিনী*, ১৯৭১, পাকিস্তান একাডেমী; ১৪/আবদুল গণি রোড, ঢাকা-২।

সহায়ক গ্রন্থ

আখতার, তাহমিনা, *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)*, ২০০১ প্যাপিরাস, ঢাকা।
আলম, তাহমিনা, *বাংলার সাময়িক পত্রে বাঙালি মুসলিম নারী-সমাজ*, ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
আলম, মুহম্মদ শামসুল, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্য*, ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
ইসলাম, মাহমুদা, *'বাংলাদেশে বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা'*, ১৯৭৮, অনুবাদ, মনোয়ারা হোসেন, উমেন ফর উইমেন : নারী ও শিক্ষা, বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডি গ্রুপ, ঢাকা।
কাদির, আব্দুল (সম্পাদিত), *বেগম রোকেয়া রচনাবলী*, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
ঘোষ, বিনয়, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, ১৯৬৮, পাঠ ভবন, কলকাতা।
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ১৯৭৩, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা।
জলিল, ডক্টর মুহম্মদ আবদুল, *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*, ১৯৯১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
জাহান, রওনক, *বাংলাদেশের নারী*, ১৯৭৪, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক-সোসাইটি, ঢাকা।
বেগম, রওশন আরা, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
বেগম, হান্নান, *মানব সম্পদ: বাংলাদেশের নারী*, ২০০২, বাংলা একাডেমী: ঢাকা।
মুরশিদ, গোলাম, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী জাগৃতির একশো বছর*, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
রহমান, শেখ আতাউর, *বাংলা কথা সাহিত্য : মুসলিম চরিত্র পরিবার ও সমাজ*, ১৯৯১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
রায়, শর্মিষ্ঠা, *'সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম বাংলার নারী শিক্ষার অন্তরায়'*, ১৯৯৮, আই.বি.এস. জার্নাল, ১৪০৪ : ৫, এপ্রিল সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, *বেগম রোকেয়া*, ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বিশেষ গ্রন্থ

নারী ও শিক্ষা, বাংলাদেশ, ১৯৭৮, উইমেন ফর উইমেন, রিসার্চ অ্যান্ড স্ট্যাডি গ্রুপ, লালমাটিয়া, ঢাকা।
বাংলাদেশ : শিক্ষা, ১৯৯৩, ইউনিসেফ, ঢাকা।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২

নকশি কাঁথার সামাজিক, ব্যবহারিক ও কাব্যিক মূল্য

বিলকিস বেগম*

Abstract: Kanthas form an integral part of Bangladesh cultural history. It is universally agreed that the legendary nakshi kanthas are the best examples of embroideries of Bangladesh. The beauty of the kantha lies not just in the surface design, but also in its many meanings, it furnishes an illustration of the wonderful patience, craftsmanship and resourcefulness of the village women. In the expression of the lives of the rural women which, while describing in pictorial detail the world around them, mutely voices at the same time, in symbol and motif, their hopes and fears, their desires and aspirations. But now this traditional aesthetic excellence going to be deleted some what with the flow of modern way of life and expansion of urbanization, industrialization, improvement of technology and development of communication. In order to save the traditional rural cultural heritage of this country, it is necessary to revitalize them.

ভূমিকা

বাংলাদেশের লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন হলো নকশি কাঁথা। লোকশিল্প বলতে গ্রামীণ সনাতন কৃষিনির্ভর স্বল্প আয়সম্পন্ন মানুষের মধ্যে প্রচলিত শিল্পকর্মকে বোঝায়। এই শিল্পধারা বিশেষভাবে ঐতিহ্যনির্ভর এবং নকশাধর্মী।[১] নকশি কাঁথা মূলত মেয়েলি শিল্প।[২] অর্থাৎ এতে পুরুষের কোনো বিচরণ নেই, একান্তভাবেই নারীসমাজের সৃষ্টি এবং কেবলমাত্র মা-বোনের স্নেহ ভালবাসার ও চিন্তা চেতনার ফসল। কাঁথার এক একটি ফোঁড়ে মিশে থাকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না। কাঁথা নারীদের অব্যক্ত মনের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। পল্লী রমণী তার মনের কারুকার্যময় সৌন্দর্য এবং নান্দনিক অনুভূতি মিশিয়ে কাঁথার পাটাতন তৈরি করে। শুধু সুখই নয় কাঁথার নকশায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে শিল্পীর ক্রোধ, বিভীষিকাসহ নানা রকম চিন্তা ও অনুভূতি। সুচ-সুতার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা এই হস্ত নৈপুণ্য শিল্পীর যৌক্তিকতা ও প্রশিক্ষণ বহির্ভূত। সমাজের কৃষ্টি, সভ্যতা, ধর্মীয় অনুভূতি, ঐতিহাসিক উপাদান, পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদি অনেক বিষয়বস্তুই নকশি কাঁথা তৈরিতে অনুপ্রেরণা জোগায়। যে কোনো আকার, আকৃতি, ফুল-লতাপাতার নকশা সুচ-সুতার বুননে স্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। বহুজাতির মিলনভূমি এই বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের পালা-পার্বণ, পূজা-অর্চনা সংগঠিত হয়, তাই বিভিন্ন উৎসব, ধর্মানুষ্ঠান, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সবকিছুই

---

*ড. বিলকিস বেগম, সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] এবনে গোলাম সামাদ, *শিল্পকলার ইতিহাস* (ঢাকা, ১৯৬০), পৃ. ৬৮।

[২] খগেশকিরণ তালুকদার, "লোকায়ত শিল্পকলা," *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য*, শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ২৬৯।

আজ নকশি কাঁথার মোটিফ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু এদেশের তৈরি পুরনো আমলের কাঁথাগুলি আজ লুপ্তপ্রায়। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত যে কয়টি নমুনা রয়েছে তা অতি সামান্য। ঝড়, বৃষ্টি, খরা, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশে আমাদের প্রাচীন দৃষ্টান্ত রক্ষণাবেক্ষণ সত্যিই দুরূহ কাজ। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁর নিজ উদ্যোগে সোনার গাঁ লোকশিল্প জাদুঘরে বেশ কিছু কাঁথা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। জসীমউদ্‌দীন তাঁর 'নক্সী কাঁথার মাঠ' গীতিকাব্যটি রচনার মধ্য দিয়ে নকশি কাঁথাকে অনন্য এক শিল্পবস্তু হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেন *বৃহৎবঙ্গ* গ্রন্থে কাঁথাকে শিল্পজগতের উচ্চাসনে রেখে নানারূপ আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন। এভাবেই অনেক সুধীজন কাঁথা শিল্পের জগৎ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা ও লেখালেখি জোরদার করেন। অত্যন্ত সস্তা ও সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে তৈরি হলেও কাঁথার সামাজিক, পারিবারিক, ব্যবহারিক ও কাব্যিক মূল্য অনেক বেশি।

কাঁথার সামাজিক মূল্য

সংস্কৃত শব্দ 'কন্থা' ও প্রাকৃত 'কথ্‌থা' থেকে বাংলা 'কাঁথা' শব্দের উৎপত্তি বলে অনুমান করা হয়। নকশি কাঁথা, নকশি খেতা, ফুলের কাঁথা, ফুলকাটা কাঁথা ইত্যাদি নকশি কাঁথারই বিভিন্ন আঞ্চলিক নাম।[৩] 'কাঁথা' বলতে বোঝায় কতগুলো কাপড় একত্রে সেলাই করে তৈরি আস্তরণ বা শীতবস্ত্র। আর নকশি কাঁথা হলো নানা রঙের সুতার সমন্বয়ে নকশা তুলে সেলাই করা কাঁথা। দীনেশচন্দ্র সেন পুরনো দিনের কাঁথা সম্পর্কে বলেন, "যে সকল শাড়ী পুরাতন হইয়া ছিঁড়িয়া যাইত তাহা ফেলিয়া না দিয়া নিম্ন শ্রেণী এবং সময়ে সময়ে বিপন্ন মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহলক্ষ্মীরা কাঁথা সেলাই করিতেন। ইহা বিক্রয় করিয়া তাঁহারা কায়কষ্টে জীবিকা চালাইতেন। কখনও কখনও স্নেহ-ভালবাসাই ইহার একমাত্র প্রেরণা দিয়াছে, স্বামী ও পুত্রকে দিবার জন্য রমণীরা দিনরাত পরিশ্রম করিয়া কাঁথা সেলাই করিতেন।"[৪] উল্লিখিত অংশে দীনেশচন্দ্র সেন বাংলার রমণীদের শিল্পকৌশল ও সুনিপুণ কৃতিত্বের বর্ণনা করেছেন। একইভাবে কাঁথার শিল্পগুণ বিচারে গ্রামের মহিলাদের প্রশংসা করেছেন গুরুসদয় দত্ত। তাঁর মতে:

> The name 'kantha' signifies a poor man's wrap consisting of old used up cloth patched up and sewn into a single garment. In the original sense the art of the kantha furnishes an illustration of the wonderful patience, craftsmanship and resourcefulness of the village women.[৫]

নকশি কাঁথা গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের শিল্পবোধ ও নিজস্ব অনুভূতি থেকে সৃষ্ট। সকল সম্প্রদায়ের মেয়েরা এই শিল্পের রূপকার। কাঁথার অপূর্ব সৃজনীশক্তি ও প্রতিভার নিদর্শন শিল্পকলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কাঁথার সংজ্ঞা হলো, "বস্তুত পুরানো জীর্ণ কাপড়ের কানি হলেই কাঁথা হয় না, একাধিক পুরানো কাপড়ের টুকরো পাট করে একখানার উপরে আর একখানা রেখে অবিচ্ছিন্নভাবে সেলাই করে নিলে তবেই কাপড় কাঁথায় পরিণত হয়।"[৬]

কাঁথা পূর্বে কখনই বাজারে বিক্রির জন্য তৈরি হয়নি। গৃহস্থালীর ফাঁকে ফাঁকে মেয়েরা এই কাজ করতেন। নকশি কাঁথা অবসরের শিল্প হলেও এর রূপ অতি চমৎকার। জীবনের প্রয়োজনে সৃষ্ট নিতান্ত সাদামাটা কাঁথায় এমন চমৎকারিত্ব বাঙালি নারীর অসীম ধৈর্য ও সুপ্ত প্রতিভাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই শিল্পে নারী হৃদয়ের কাঙ্ক্ষিত বস্তুর বা এলোমেলো চিন্তার, ঘর-গৃহস্থালীর কথা, গ্রামীণ জীবন বা পল্লী প্রকৃতির ছায়াপাত ঘটে এবং মানব জীবনকে আরও সুন্দর ও মধুর করে গড়ে তুলতে প্রেরণা

---

[৩] তোফায়েল আহমদ, *লোক ঐতিহ্যের দশদিগন্ত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ১০৩।

[৪] দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩), পৃ. ৪৩০।

[৫] Gurusaday Dutta, "The Art of the kantha," *The Modern Review*, October, 1939, p. 457.

[৬] কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলার কাঁথা* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৬), পৃ. ১ –১৩।

জোগায়। এ শিল্পকর্মে তেমন কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না এবং ছেঁড়া কাপড়গুলি আবারও ব্যবহারোপযোগী হয়ে ওঠে। নকশি কাঁথার মধ্য দিয়ে একটি জাতির সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটে থাকে। কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> Though every kantha is functional and founded on thrift, it is imbued with so much romance, sentiment and philosophy that is transcends the orbit of a mere craft as does a painting or sculpture.[৭]

নকশি কাঁথার নকশায় বর্তমান ও অতীতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক জীবনের অনেক পার্থক্যই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রিয়জন, বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজনকে উপহার বা উপঢৌকন হিসেবে কাঁথা দান করার রীতি বহু পুরনো। গ্রাম বাংলার মানুষের মনকে দোলায়িত করেছে কিংবা মনে রেখাপাত করেছে এমন অনেক ঘটনাই কাঁথার ফোঁড় ও নকশায় শিল্পী তুলে ধরে। "আমায় যেন ভুলোনা" বা "ভুলনা আমায়"—প্রেমিকের কাছে এমন প্রাণের আকুতি নিয়ে যে প্রেমিকা শিল্পী কাঁথা বা রুমাল তৈরি করে তা নিঃসন্দেহে কোমল স্পর্শে আরও সুন্দর ও মনোরম হয়ে ওঠে। সন্তানবৎসল মা তার আদরের পুত্র, কন্যা বা প্রবাসী স্বামীর জন্য কাঁথা সেলাই করে, কখনো বিরহী সাজুরা পলাতক রূপাদের জন্য স্মৃতির জাল বুনে চলে কাঁথার পাটাতনে। এখানে নারী হৃদয়ের উজাড় করা প্রেম-প্রীতি, দুঃখ-বেদনা, স্নেহ-ভালবাসা এবং মান অভিমানের স্বাক্ষর মূর্ত হয়ে দেখা দেয় কাঁথার সূক্ষ্ম ফোঁড়ে ও নকশায়। কাঁথা কেবল সুই সুতার ফোঁড় আর রঙিন নকশার সমন্বয় এভাবে দেখলে চলবে না, একে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে; তবেই বোঝা যাবে কাঁথার সঠিক মর্মকথা।[৮]

কাঁথা সেলাই মূলত সহিষ্ণু পরিশ্রমের ফসল। অত্যন্ত ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে এই কাঁথা সেলাইয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। দীনেশচন্দ্র সেন কাঁথা সেলাইকে অতি ধীর গতিসম্পন্ন কর্ম হিসেবে বিবেচনা করেন। প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উল্লেখ করে তিনি বলেন, "শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থা।" তাঁর মতে, একখানি কাঁথা সেলাই করতে অন্তত ছয়মাস সময় লাগে।[৯] কাঁথা তৈরির সময়কাল সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীনের উক্তিটিও উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর মতে, শোনা যায়, একখানা কাঁথা তৈরি করতে তিন চার পুরুষও কেটে যায়। মা যে কাঁথাখানি তৈরি করতে আরম্ভ করেছিল, মেয়ে সারাজীবনেও তা শেষ করতে পারল না, মরার সময় সেই বৃদ্ধ মায়ের নাতনীটিকে কাঁথাখানা শেষ করার ভার দিয়ে যায়। কন্যা তার মৃত মায়ের এই অসমাপ্ত কাজ সারা জীবনের তপস্যা দিয়ে সমাধা করে। এমনি একখানা কাঁথার মধ্যে তিনটি পুরুষের স্নেহমমতার ইতিহাস লেখা থাকে।[১০] সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নানা ছায়া পড়ে কাঁথাশিল্পীদের উপরে। কাঁথা সেলাই করতে করতে কখনও তাকে শুনতে হয় পাশের বাড়িতে নবজাতকের কণ্ঠস্বর, কখনো বা মৃত্যু-সংবাদ কিংবা বিয়েশাদির মুখরোচক খবর। তখন কাঁথা সেলাই ছেড়ে শিল্পীকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে সেখানে ছুটে যেতে হয় এবং ফিরে এসে তাৎক্ষণিকভাবে তার আর কাঁথা নিয়ে বসা হয় না। এমনিভাবে প্রিয়জনের মৃত্যু কিংবা বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে দীর্ঘ দিন ব্যস্ত থাকার কারণে কাঁথা সেলাইয়ের কাজটি থেকে অনিচ্ছাকৃত তাকে বিরত থাকতে হয়।

কাঁথার ব্যবহারিক মূল্য

অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি ঘরে অর্থাৎ গরিবের কুঁড়েঘর থেকে শুরু করে ধনীর প্রাসাদে কাঁথার ব্যবহার অনন্য। কাঁথার ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করার

---

[৭] Kamaladevi Chattapadhaya, *Indian Embroidery* (New Delhi, 1977), p. 55, 59.

[৮] কামরুল হাসান, "লোকশিল্পের মর্মকথা", *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য*, পৃ. ৪৪৬।

[৯] দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, পৃ. ৪৩২।

[১০] জসীমউদ্‌দীন, "পূর্ববঙ্গের নক্সী কাঁথা ও শাড়ী, *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য*, পৃ. ২৭০।

পূর্বে লোক শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে শ্রী অশোক মিত্রের বক্তব্য উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর মতে, লোকশিল্পজাত দ্রব্য কখনও অপ্রয়োজনীয় হয় না। নিত্য ব্যবহার্য কাজে লাগে বলেই তার একটি ব্যবহার্য আবশ্যিক রূপ ফুটে ওঠে এবং যেহেতু সেসব সামগ্রী সাধারণ গৃহস্থের ঘরের জিনিস তাই সে ব্যবহার্য রূপের মধ্যে আসে আঁটসাঁট, সংক্ষিপ্ত, বাহুল্য বর্জিত কার্যোপযোগী গড়ন।[১১] তিনি লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এর রূপ, রং, ডিজাইনের পাশাপাশি ব্যবহার উপযোগিতার কথা স্বীকার করেছেন বারংবার। যা নকশি কাঁথার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশে সাধারণ অবস্থার লোকদের মধ্যে কাঁথার বহুল প্রচলনের প্রধানতম কারণ হচ্ছে শীতবস্ত্রের প্রধান উপাদান পশম এখানে উৎপন্ন হয় না। তাছাড়া এদেশের মানুষের আর্থিক অবস্থাও তেমন ভাল নয় যে, তারা বাইরে থেকে আমদানি করা পশমি কাপড়, কম্বল, শাল ইত্যাদি শীত নিবারণের সামগ্রী চড়া দামে কিনতে পারে। আবহমান কাল ধরে আজ অবধি নকশি কাঁথার ব্যবহার বিভিন্ন দেশে অতি সুপরিচিত। এর বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সুষমামণ্ডিত ব্যবহার দেখা যাবে বিভিন্ন প্রকার কাঁথার ক্ষেত্রে। বর্তমান সময়ে কাঁথা শুধু গরিবেরই শীতবস্ত্র নয় ভদ্র সমাজেও এর বহু উপযোগিতা আছে। পাণিনির ব্যাকরণ সূত্রে কাঁথা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য জানা যায়। মহর্ষি হারীতের 'হারীত সংহিতার' একটি বচনে শীতনিবারণে কাঁথার বিশেষ উপযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা: "গৃহাশ্রম ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময়ে কোন ভোগপোকরণ গ্রহণ করিবে না। কেবল আচ্ছাদনার্থে কৌপীন, শীত নিবারণী কন্থা এবং পাদুকা এই কয়টি বস্তু সংগ্রহ করিবে"।[১২] তাই কাঁথা শব্দটি উচ্চারণ করতে গেলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কতকগুলো পুরনো কাপড় একসঙ্গে সেলাই করা যা শীতের মোটা বস্ত্র। তাছাড়া বাংলাদেশের ঋতুচক্র ভেদে হেমন্তের হালকা ঠাণ্ডায় এবং বর্ষার শীতল রাতে বিছানায় পাতলা কাঁথার প্রচলন শহর ও গ্রামের প্রতিটি ঘরেই দেখা যায়। কাঁথা শুধুমাত্র শীতবস্ত্রই নয়, পরিধানের ক্ষেত্রেও এর ব্যাপক ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত। বুদ্ধদেবের পোশাক ছিল ছেঁড়া কাপড় দিয়ে তৈরি কাঁথা। তাই এ রীতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বৌদ্ধ শ্রমণ ও সন্ন্যাসীরাও কাঁথা ব্যবহার করেন। এ প্রসঙ্গে স্টেলা ক্রামরিশ উল্লেখ করেন :

> The Buddha wore a patch work robe (sanghati). Some of the reliefs of the Mathura school or the second century A. D. show him thus clad. Lord Chaitanya (1485-1533), the apostle and visionary, draped in a kantha the ecstasies which overwhelmed his body. The patched robe of the Buddha or of a saint belongs to him in his nature of savior. The rags are given a new wholeness. They cloth holiness.[১৩]

কাঁথা বৈরাগ্যের প্রতীক, সেজন্যই মহাভারতের শান্তিপর্বে জীর্ণ 'কন্থা' গ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে বলা হয়েছে "জীর্ণ কন্থা, ততঃ কিম"।[১৪] বাংলার কবি ভারতচন্দ্র বাঙালির একান্ত প্রিয় দেবতা সর্বত্যাগী ভোলা মহেশ্বরকে (শিব) পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন, "ঝুলি কাঁথা, বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড্ডু" অর্থাৎ কাঁথা, ঝুলি আর বাঘছাল পরিহিত পুরুষ রূপে। বৌদ্ধ যুগের কন্থা এখন বাউলদের তালি মারা পোশাকে পরিণত হয়েছে। এদেশের ফকির, দরবেশ, যোগী একইভাবে কাঁথা পরিধান করে। সিদ্ধার্থের দানশীলতার কথা আমরা জানি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় চির অজ্ঞাতের অন্বেষণে ব্রতী' রাজকুমার সিদ্ধার্থের দারিদ্র্যবরণ সম্পর্কে বলেছেন :

---

[১১] অশোক মিত্র, *ভারতের চিত্রকলা* (কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিসার্স, ১৯৫৬), পৃ. ২৩৬।

[১২] গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, *প্রাচীন শিল্প পরিচয়* (কলকাতা: সুবর্ণ রেখা, ১৯৭২), পৃ. ৩২।

[১৩] *Unknown India : Exploring India's sacred Art* (Selected writings of Stella Kramrisch), Ed. by Barbara Stoler Miller (New Delhi, 1994), p. 110.

[১৪] বিজনকুমার মণ্ডল, *সংগ্রহশালা ও লোকশিল্প* (কলিকাতা: ব-দ্বীপ প্রকাশনা, ১৯৯৯), পৃ. ৪১।

শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা
বিষয়ে বিরাগী, পথের ভিক্ষুক।[১৫]

এমনিভাবে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাঙালির অতি পরিচিত ও প্রয়োজনীয় কন্থা বাংলার ঘরে ঘরে বাঙালির ব্যবহারিক প্রয়োজন ছাড়াও পুরানো ছেঁড়াফাঁড়া কাপড়ের উপর একটা মাহাত্ম্য এবং লোকবিশ্বাস এদেশের মানুষের সাথে মিশে আছে। তাই মুসলমানদের বিভিন্ন পীরের আস্তানায় এবং হিন্দুদের কল্পতরুতে মানত হিসাবে ছেঁড়া নেকড়া ঝুলতে দেখা যায়।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কাঁথার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। কাঁথা সেলাই মেয়েদের একটি অনন্য গুণ তাই বিবাহযোগ্য কনেকে পাত্রস্থ করার সময় গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজের পাশাপাশি মেয়ের কাঁথা সেলাইয়ে পারদর্শিতার কথা বরপক্ষকে জানানো হয়ে থাকে। এমন কি কনের তৈরি বিভিন্ন কাঁথা বরপক্ষকে খুশি করার জন্য দেখানো হয়। গ্রামের অধিকাংশ পরিবারে দেখা যায়, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের প্রতিটি জিনিসই কাঁথার দ্বারা আবৃত থাকে। যেমন খাবার ঢাকা, বালিশ ঢাকা, টেবিল-চেয়ার, বাক্স ইত্যাদি সবকিছু কাঁথা দিয়ে ঢাকা থাকে। তাছাড়া কাঁথা প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার কাজেও সর্বদা প্রচলিত। নিজের হাতের তৈরি মায়া-মমতায় ভরা একখানি কাঁথা মা তার মেয়েকে স্বস্নেহে শ্বশুর বাড়িতে পাঠানোর সময়ে সঙ্গে দিলে মেয়ে তা সারা জীবনে নষ্ট না করে বুকে আঁকড়ে রাখত। আবার মেয়ে তার বাবাকে কাঁথা উপহার দিলে কাঁথার এক কোণে তার কুমারী জীবনের পিতৃবংশীয় নাম লিখে নিজের উপস্থিতি স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রসূতির বাচ্চা হলে কাঁথা উপহার দেওয়ার নিয়ম গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে। কোনো মেয়ের বাচ্চা হবার পর বাপের বাড়ি থেকে যদি কাঁথা পাঠানো না হয়, তবে মেয়েকে শ্বশুর বাড়িতে বিভিন্ন রকম কটু কথা শুনতে হয়।

বহুভাবেই নকশি কাঁথা উপযোগিতার কাজ করছে। কাঁথার ব্যবহারিক মূল্য ছাড়াও এর মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধ মিশে আছে। যেমন নকশি কাঁথাগুলোতে যে লৌকিক ডিজাইন দেওয়া হয় তা কোনো ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও প্রতীকের সংমিশ্রণ এবং সেগুলোকে আচারগত শিল্পে উন্নীত করা হয়েছে। কাঁথার ব্যবহার ও তার মূল্য সম্পর্কে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন:

এক গৌড়িয়া দিয়াছে কান্থা ধুঞা শুখাইতে ॥
তারে কহে আরে ভাই কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ মোরে ॥
সেই কহে হাস্য কর প্রামাণিক হঞা।
বহুমূল্য ভোট দিবে কেনে কাঁথা লঞা ॥
তেহোঁ কহে হাস্য নহে কহি সত্যবাণী।
ভোট লহ তুমি দেহ মোরে কাঁথাখানি।
এতবলি কাঁথা লইল ভোট তারে দিয়া।
গোসাঞির ঠাঞি আইল কাঁথা গলে দিয়া ॥[১৬]

অতি মূল্যবান ভোটের বিনিময়ে তার পছন্দের কাঁথাখানি দেওয়ার জন্য যে আকুতি প্রকাশ পেয়েছে, তাতে কাঁথার মূল্য বিচার দুঃসাধ্য নহে। কাজেই দেখা যায়, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃস্টান ধর্ম-বর্ণ, জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে কাঁথা বাঙালির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নিজস্ব শিল্প এবং সকলের উৎসব অনুষ্ঠান বিশেষত বিবাহাদি অনুষ্ঠানের অপরিহার্য উপকরণ এবং উপঢৌকন দেয়ার ব্যাপারেও স্বীকৃত। তাছাড়া কাঁথার সাথে যুক্ত রয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং বংশ ও গোত্রগত আভিজাত্য। কাঁথার মধ্যে রয়েছে রূপবৈচিত্র্য ধর্মীয় ও লোকজ বিশ্বাস, শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবাদ এবং শৈল্পিক লালিত্যে ভরা সাবলীল রসবোধ।

---

[১৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; "এবার ফিরাও মোরে", *রবীন্দ্ররচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮), পৃ. ৪৭৬।

[১৬] সুকুমার সেন সম্পাদিত, *কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত* (কলকাতা: ১৯৮৩), পৃ. ৩৬৩।

কাঁথার কাব্যিক মূল্য

কাঁথা যেন এক সূতোয় গাঁথা প্রাচীন কাব্যকথা। কত রং-এ কত ঢং-এ কতকালের চিত্রকথা শিল্পীর বয়নে প্রকাশ পায়—তা বর্ণনাতীত। বুকভরা স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার আবেগে আপ্লুত পল্লীবধূর একটু একটু করে অবসরের সঞ্চিত ফসলই এই সূচিশিল্পী। কালের গহ্বরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি কিন্তু চিরন্তণ রয়ে গেছে নকশি কাঁথা নামের এক অনন্য শিল্পরূপ। নানা রকম ছড়া, কবিতা, ধাঁধা, লোকগাথা, প্রবাদ-প্রবচন, গান বা বিভিন্ন গীতি এবং নানা উপদেশমূলক বাক্যের মাধ্যমে কাঁথা শিল্পীর কাব্য ও সাহিত্য সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, বহু প্রাচীনকাল থেকেই কাঁথা বাঙালির জীবনচর্যার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পূর্ববঙ্গগীতিকা, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, অন্নদামঙ্গল, নাথ গীতিকায় কাঁথার উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া নানারকম সংস্কৃত শ্লোক, উপদেশবাণী, আশীর্বচনেও কাঁথার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

বিশেষ করে ছোটবেলায় নানী-দাদীর কাছে রূপকথার গল্প শোনার সময় ম্যাজিক কাঁথা'র বর্ণনা অনেকেরই জানা আছে। ম্যাজিক কাঁথায় চড়ে চক্ষের নিমিষে রাজকন্যা রাজপুত্রের কাছে যেতে পারে আবার যা গায়ে দিয়ে অদৃশ্য হওয়া যায়। তাছাড়া দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র কলাবতী রাজকন্যা গল্পে, জনমানবহীন এক রাজপুরীতে একশ বছর বয়সের এক বুড়িকে কাঁথা সেলাইরত অবস্থায় দেখা গেছে বলে বর্ণনা করেছেন।[১৭]

কাঁথাশিল্পে শিল্পীর আবেগ, অনুভূতি, প্রেরণা, রূপরসে সিঞ্চিত হয়ে ওঠে। শিল্পী এখানে তার শিল্পকর্মের মাধ্যমে যেন একটি রূপকথাকেই রূপায়িত করে থাকেন। কখনও তার জীবনের মহাসত্যটি অপসারিত হয়ে স্বপ্নের জগতে পদার্পণ করে আবার কখনও অলীক স্বপ্নটাই আলোর মত ঝকমকে সত্য হয়ে শিল্পীর চোখের সামনে ধরা দেয়। যেমনটি ধরা দিয়েছিল জসীমউদ্‌দীনের 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যের বিরহিনী কাঁথাশিল্পী সাজুর বেলায় :

> কাঁথার উপরে আঁকিল যে সাজু তাহার কবরখানি,
> তারি কাছে এক গেঁয়ো রাখালের ছবিখানি দিল টানি; ...
> এ ব্যথা সে মাগো কেমনে সহিবে, বোলো তারে ভালো করে,
> তার আঁখি জল ফেলে যেন এই নক্সী-কাঁথার পরে।"[১৮]

কাঁথার কাব্য ও সাহিত্য মূল্য বিচারে পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাব্য গ্রন্থটি এক অনন্য সৃষ্টি। পল্লীবালা সাজু ও রূপার প্রেম, হাসি-আনন্দ, ও দাম্পত্য সুখ রঙিন স্বপ্ন-সুতোয় প্রথম দিকে কাঁথাটিতে অঙ্কিত হলেও রূপা গ্রাম ছেড়ে যাবার পর সাজুর বিরহ-বেদনার করুণ সুর কাঁথাটির চিত্রপট বদলে ফেলে। অশ্রুজলে গাঁথা সাজুর নকশি কাঁথাটি কাহিনীর শেষে হয়ে যায় মূল চরিত্র এবং কবি কাব্যটির নামকরণ করেন 'নক্সী কাঁথার মাঠ'।

কাঁথার ফোঁড়ে পল্লীরমণীর প্রাণের আকুতি আরও নানা ছড়া এবং গীতের মধ্যেও ফুটে উঠে। যেমন 'যাও পাখী বলো তারে, সে যেন ভুলেনা মোরে'। এভাবে শিল্পের মধ্যে অমর হয়ে থাকার জন্য ফোঁড় তুলে লেখা হয়। রুমাল কাঁথাতে পাখীর প্রতীক এঁকে বিদেশে অবস্থানরত স্বামী বা প্রিয়জনকে নিজের নাম স্মরণ করানোর চেষ্টা করা হয়।

নতুন শিশুকে ঘিরে কাঁথা তৈরির বর্ণনা অজস্র মেয়েলি ছড়া ও গীতে দেখা যায়। যেমন :

> নিজের অঙ্গের কাঁথাখানি যাদুর অঙ্গে দিয়া,
> সারা নিশি গোয়াইল মায় জাগিয়া বসিয়া ॥ (আশরাফ সিদ্দিকী, ১৯৯৫)

---

[১৭] *দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৩৮৬), পৃ. ১৪।

[১৮] জসীমউদ্‌দীন, *নক্সী-কাঁথার মাঠ* (ঢাকা, ১৩৯২), পৃ. ৬৬।

স্নেহময়ী বড় বোন শিশু ভাইকে উদ্দেশ্য করে কাঁথায় লেখে:

সোনামনি ভাই আমার সুখে নিদ্রা যাইও,
আভাগিনী বুবুর কথা নিরলে ভাবিও ॥

অভাগিনী বোন কিংবা বিবাহযোগ্য কন্যা কাঁথা সেলাইরত অবস্থায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমে ঢুলে পড়ে:

কাঁথা না বিছাইয়া, কাঁথা না খুলিয়ারে,
ছবি না তুলিতে গো, ঘুমে কাতর হইল নারে ॥

শুভবিবাহ কন্যার জীবনের বহু আকাঙ্ক্ষিত শুভদিন। এ দিনটিকে কল্পনা করে ভবিষ্যতের সুখ মিলন চিত্রের স্বপ্ন দেখে অনেকেই :

সেই না কাঁথায় লিইখ্যা থইছে
হাসাহাসির জোড়া গো।
সেই না কাঁথায় লিইখ্যা থইছে
ময়ূর পংখীর জোড়া গো ॥
এই কাঁথা কাঁথা নয়রে আরও কাঁথা আছে।
সেই কাঁথার মধ্যে মধ্যে বুটি তোলা গেছে।[১৯]

রাজশাহীর একটি আঞ্চলিক ছড়াতে কাঁথার উল্লেখ আছে :

কথার নাই মাতা
বলদে খা'ল ক্যাঁতা
ক্যারে বলদ তুই ক্যাঁতা খাস ক্যান?
তোর আকোলে জি ঘাস দ্যায় না![২০]

কাঁথা মুড়ি দিয়া শুয়ে থাকা বাঙালি জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার; সেটা রাগ করেই হোক আর প্রয়োজনের তাগিদেই হোক:

আমার ল্যাইগা আনবেন কিন্যা
ঢাকাই তাঁতের শাড়ী।
শাড়ী যদি না পাই,
কইবনা আর কথা,
রাগ কইর‍্যা শুইয়া থাকব
গায়ে দিয়া কাঁথা।[২১]

ঠিক তেমনিই কাজী নজরুল ইসলামের শীতের সকালের বর্ণনাতেও কাঁথা মুড়ি দিয়ে শান্তিতে ঘুমানোর কথা আছে :

ঊষা দিদির উঠার আগে উঠব পাহাড় চূড়ে
দেখব নীচে ঘুমায় শহর শীতের কাঁথা মুড়ে।[২২]

জামাই শ্বশুর বাড়িতে এলে তার জন্য উন্নতমানের আয়োজন প্রতিটি বাঙালি পরিবারেই দেখা যায়, সেক্ষেত্রে পরিবারটি দরিদ্র হলেও তার মাফ নেই :

এল জামাই বাড়িতে, তেল নাই খারিতে, সতে দেব কি?
ভাঙ্গা কুলো ছেঁড়া কাঁথা, জোগাড় করেছি।

অনেক গীতির মধ্যে কাঁথার প্রসঙ্গ শোনা যায়; যেমন :

আসমান জোড়া ফকিররে ভাই
জমি জোড়া কেথা

---

[১৯] আশরাফ সিদ্দিকী, "নকসী কাঁথা" *লোক কারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব, ১৯৯৫* (সোনারগাঁও: বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন), পৃ. ৯।

[২০] আলমগীর জলীল সম্পাদিত, *রাজশাহীর ছড়া* (ঢাকা, ১৩৭০), পৃ. ৫৫।

[২১] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, দ্বিতীয়খণ্ড (কলকাতা: ১৯৬৩), পৃ. ৩৮৩।

[২২] নজরুল ইসলাম, "ঘুম জাগালো পাখি" *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (ঢাকা: চৌধুরী পাবলিসার্স, ১৯৭৪), পৃ. ১৪।

এসব ফকির মরলে পরে
এর কবর হবে কোথা রে, ...[২৩]

ময়মনসিংহ গীতিকার অন্যতম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী তাঁর রামায়ণ কাব্যে গীতার অন্যান্য গুণের সঙ্গে কাঁথা সেলাইয়ে তার পারদর্শিতার কথাও বলেছেন—

সীতার গুণের কথা কি কহিব আর। ...
কন্থায় আকিল কন্যা চান সূরুয পাহাড়॥
আরও যে আকিল কন্যা হাসা আর হাঁসি।
চাইরো পাড়ে আকে কন্যা পুষ্প রাশি রাশি॥[২৪]

কাঁথা মেয়েলি শিল্প হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছের' অন্তর্গত 'পণরক্ষা' গল্পের নায়ক রসিককে কাঁথাশিল্পী হিসেবে দেখানো হয়েছে। পুরুষ মানুষ হয়েও নিজের দক্ষতায় নানা রঙের সুতা মিলিয়ে মনের মত নকশা দিয়ে রসিক তার প্রণয়িনী সৌরভীকে উপহার দেয়ার জন্য কাঁথা তৈরি করে। অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যে ভরপুর এই চমৎকার কাঁথাটি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ অমরত্ব লাভ করে।[২৫]

কাঁথাকে ঘিরে প্রচলিত কিছু প্রবাদ বাঙালির মুখে মুখে সর্বদা শোনা যায়। যেমন "ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।" এখানে অলীক কল্পনা বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ বাঙালির সাধ আছে, কিন্তু সাধ্য নেই। আবার "কোনো কাজ না থাকলেও থাকে কাঁথা সেলাই-এর কাজ।"[২৬] এভাবে নানা প্রবাদ প্রবচনে, রূপকথার গল্পে, বাউল গানে, চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে, এমনকি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক গানেও কাঁথার প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে।

উপসংহার

সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে কাঁথার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা অনেক। সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। অতীতের প্রজন্ম লোকশিল্পের ভাণ্ডার যেভাবে সমৃদ্ধ করেছে, বর্তমানের লোকশিল্পীরা তা গ্রহণ ও বর্জন করে ঢেলে সাজাচ্ছেন। সে অনুযায়ী ভবিষ্যৎ বংশধররাও অনুপ্রাণিত হবে—তাতে কোনো সন্দেহ নাই। এই কাঁথা শিল্পের ব্যাপকতা আমাদের দেশের লোকশিল্পকে শুধু দেশের মধ্যেই নয়, দেশের বাইরে সংস্কৃতিতেও একটা নিজস্ব গণ্ডি তৈরি করে সামনে এগুবে এবং আরো সুন্দর অবস্থান সৃষ্টি করবে বলে আশা করা যায়। তাই কাঁথাশিল্পের উৎপাদন ও ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসকারি পর্যায়ে এর বিনিয়োগ ও বাজারজাতকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা কৃষ্টিগত ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, তাই ঐতিহ্যবাহী কাঁথাশিল্পের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া পল্লী অঞ্চলে দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং বিভিন্ন জনপদ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সখ্য বা বন্ধুত্ব স্থাপনের লক্ষ্যে কাঁথা শিল্পীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের শিল্প নৈপূণ্য উন্নয়নের ব্যাপারেও আমাদের সজাগ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

---

[২৩] Md. Syedur, "Nakshi Kantha," *Folklore of Bangladesh,* Edited by Shamsuzzaman Khan, VolumeTwo, (Dhaka, 1992), p. 58.

[২৪] আশরাফ সিদ্দিকী, "নকসী কাঁথা," *লোকজ উৎসব ১৯৯৫*, পৃ. ৯।

[২৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পণরক্ষা," *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৫৯১।

[২৬] Mahmud Shah Qureshi, *Culture and Development* (Dhaka: National Book Centre, 1982).

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২

গ্রামীণ নারীর জীবন-জীবিকা-ক্ষমতায়ন : একটি গ্রামভিত্তিক সমীক্ষা

কানিজ ফাতেমা কানন

Abstract: The rural women of Bangladesh are living in extreme poverty. Most of them are not capable to meet their basic needs. It was observed that most of the rural women tried to achieve their economic solvency in taking small credit from different agencies. It was also observed that without economic solvency no woman could take part in decision making of her family. In this article, the researcher tried to explore the daily life and empowerment of rural women through utilizing small credit.

ভূমিকা

বাংলাদেশের গ্রামীণ নারী সমাজ সাধারণভাবে ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের সাথে সংশিষ্ট এবং গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া নারী অধস্তনতা ও প্রান্তিকতা এক বিশ্বব্যাপী প্রপঞ্চ। তবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, প্রগতি, সচেতনতা ইত্যাদি অর্জনের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সমাজে মাত্রাগত পার্থক্য লক্ষণীয়। বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত মুসলিম অধ্যুষিত দেশে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সমাজ সংস্কৃতিতে মিশে থাকা ধর্মীয় প্রভাব এ দেশের নারীর পৃথক্করণ, বশ্যতা ও অধীনতা প্রতিষ্ঠায় মূল নির্ণায়ক। সমাজে পুরুষাধিপত্যের বিপক্ষে নারীর নিজস্ব মতাদর্শ নির্মাণে নারীর আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় ব্যাখ্যা, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অপরিহার্যতা ও অবস্থান সম্পর্কে নারীর কৌশল চিহ্নিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিক হিসেবে নারী-পুরুষের পার্থক্য না করলেও, চলমান পুরুষতন্ত্রের কাঠামোতে অসম সম্পর্ক লালন করে চলেছে, যা উদারনৈতিক দর্শনে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, লিঙ্গ নির্ধারণী দর্শন, পুরুষাধিপত্য ও পুঁজিবাদ বিষয়ক তত্ত্ব বিশেষণে প্রতীয়মান।

গ্রাম বাংলার নারী সমাজ প্রতিদিন সূর্য ওঠার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, আবার কোনো কোনো সময়ে মধ্যরাত পর্যন্ত গৃহস্থালীর নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও তাদের এ কাজের কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই। এরা আমৃত্যু একঘেঁয়ে জীবন যাপন করে। আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর জীবন, জীবিকা ও ক্ষমতায়ন অর্থাৎ তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী সম্পর্কে পর্যালোচনা করা। আর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নির্বাচিত একটি গ্রামের মহিলাদের ওপর পদ্ধতিগত সমীক্ষা চালানো হয়েছে। বর্তমান গবেষণার সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে জরিপ পদ্ধতি ও এর বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া গবেষণার বিষয়ে গভীর অনুধ্যানের জন্য প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং কেস-স্টাডি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণা এলাকা হিসেবে নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার অন্তর্গত মালাহার গ্রামকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়। মালাহার গ্রামটি ধামইরহাট উপজেলার প্রায় ১ কিলোমিটার

---

* এম.ফিল গবেষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। গ্রামটির আয়তন ২৮১.৬৯ একর (১.১৪ বর্গ কি.মি.)। মোট জনসংখ্যা ১২৫০ জন; পুরুষ ৬২৯ জন ও মহিলা ৬২১ জন। গ্রামটিতে মোট ২৪১টি পরিবার রয়েছে। শিক্ষার হার ২৮.৪০%। গ্রামটি মুসলিমপ্রধান। মোট জনগোষ্ঠীর ৯.১২% বেকার, ২৫.৭৬% কৃষক, ২২.২৪% কৃষি শ্রমিক, ১.২৮% রাজমিস্ত্রি, ২.০৮% ব্যবসায়ী এবং ৬.১৬% অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত (তথ্য: ক্ষেত্র জরিপ)। গ্রামে বিবাহিতা নারীর প্রায় সবাই গৃহিণী। গ্রামটির অধিকাংশ নারী পরিবারিক সচ্ছলতার জন্য বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে মোট ২০০ জন নারীকে নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১০০ জন নারী সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থ থেকে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেছে এবং কোনো ঋণ গ্রহণ করেনি এমন নারীর সংখ্যা ১০০ জন। গবেষণায় এই দুই শ্রেণীর নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ: উভয়ের দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী ও ক্ষমতায়নের তুলনামুলক পর্যলোচনা করা।

আলোচ্য গবেষণার তিনটি প্রত্যয় হলো: গ্রামীণ নারীর জীবন, জীবিকা ও ক্ষমতায়ন। গ্রামীণ নারীর দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকা মূলত তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বিতা ঘটলেই যে নারী সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতায়িত হবে, তা ঠিক নয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার সাথে সাথে নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন হলেই, নারী ক্ষমতায়িত হবে।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কেবল ভোটদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাবি আদায় এবং উচ্চ মজুরি বা ইতিবাচক শর্তযুক্ত কাজের জন্য দাবি জানানোর সামর্থ্যই হলো রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন (হাসেমী, ১৯৯১:৪৭)। তবে নারীর স্বাবলম্বিতা নারীর ক্ষমতায়নকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

নারীর ক্ষমতায়ন বর্তমান বিশ্বে একটি অন্যতম আলোচিত বিষয়। আমাদের দেশের অনেকেই 'ক্ষমতা' ও 'ক্ষমতায়ন' প্রত্যয় দুটি সমার্থক বিবেচনা করে থাকেন। অনেকেই মনে করেন নারী ক্ষমতায়িত হলে, পুরুষদের স্থলে নারীরাই জোরপূর্বক ক্ষমতায় আসীন হবে। আসলে বিষয়টি তা নয়। ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টির অর্থ হলো, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ।

> Empowerment is a process of awareness and capacity building leading to greater participation, to greater decision-making power and control, and to transformative action (Karl, 1995:14).

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে নারী-ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান উৎস হলো নারীর স্বাবলম্বিতা। আমাদের দেশের গ্রামীণ নারী-সমাজ তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণপূর্বক হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি করে থাকে। বিগত কয়েক দশক হতে বাংলাদেশ সরকার নারী উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে এবং অর্থনৈতিক জীবনে নারীর অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো কাজ করছে । World Bank-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে:

> Micro credit gradually became an important element of the development programs of most of the national and local NGOs particularly from mid 80s. But at present, micro-credit has become a source to create opportunities for self-employment, which eventually leads, alleviates poverty in Bangladesh. Micro-credit creates only partial employment for the people. Again, Micro credit economic initiatives by women are enacting changes at individual and family levels as well as in the society.

> Shifting from micro crudite to micro enterprise also enables to create positive changes in economic activities, as a housewife or an unemployed women is involved in income-generating activities, it reduces man's burden as the role earning member in the family. (The World Bank, 1999:45)।

পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশেষণ করলে দেখা যায় দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী হওয়া সত্ত্বেও নারীর মর্যাদা সর্বস্তরে ভূ-লুণ্ঠিত। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীরা মুলত পরমুখাপেক্ষী ও পুরুষ-নির্ভর। এ ক্ষেত্রে A. Duza'র উক্তি প্রণিধানযোগ্য:

> Women in Bangladesh have always been dependent on men and they have rarely had any opportunity to participate in social, political and economic decisions. Through they contributed heavily to the country's economy by their participation in agriculture, along with the household chores. The source of power formal as well as informal-wire vested in the male; society was dominated by men, and women formed an especially neglected and deprived group. The uncritical acceptance of male superiority and women's deprived (Duza, 1989:9).

নির্বাচিত নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে অর্থাৎ নির্বাচিত এলাকার নারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ কতটুকু সহায়ক ভূমিকা পালন করছে সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য স্বল্প পরিসরে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ জন্য উত্তদাতার বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিবারের ধরন ও আকার, বাসস্থান, জমিজমা, বার্ষিক আয়-ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা করা হলো।

সারণি ১: নির্বাচিত নারীর বয়স

নির্বাচিত নারীর বয়স	সংখ্যা (%) N = ২০০	
	ঋণগ্রহীতা N = ১০০	অ-ঋণ গ্রহীতা N = ১০০
২৫-৩৫	৩৫%	৩৯%
৩৬-৫০	৬৫%	৬১%
মোট	১০০%	১০০%

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বর্তমান গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ঋণগ্রহীতাদের বয়স ২৫ হতে ৩৫ বছরের মধ্যে ৩৫% এবং ৩৬ হতে ৫০ বছর পর্যন্ত ৬৫%। অপর পক্ষে, অ-ঋণগ্রহীতাদের বয়স ২৫ হতে ৩৫ বছরের মধ্যে ৬৫% এবং ৩৬ হতে ৫০ বছর পর্যন্ত ৬১%। অর্থাৎ সকল নারীই কর্মক্ষম (সারণি ১)।

সারণি ২ : নির্বাচিত নারীর শিক্ষা

নির্বাচিত নারীর শিক্ষা	সংখ্যা (%) N = ২০০	
	ঋণ গ্রহীতা N = ১০০	অ-ঋণ গ্রহীতা N = ১০০
নিরক্ষর	-	৪২%
পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত	৭২%	৪৭%
ষষ্ঠ হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত	২৮%	১১%
মোট	১০০%	১০০%

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অ-ঋণগ্রহীতাদের ৪২% নিরক্ষর কিন্তু ঋণগ্রহীতাদের ১০০% নারী লেখাপড়া জানে (সারণি ২)। উলেখ্য, ন্যূনতম স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন না হলে বেশিরভাগ ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়।

সারণি ৩ : নির্বাচিত নারীর বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	সংখ্যা (%) N = ২০০	
	ঋণ গ্রহীতা N = ১০০	অ-ঋণ গ্রহীতা N = ১০০
বিবাহিতা	৮৯%	৯২%
বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা/ তালাকপ্রাপ্তা	১১%	৮%
মোট	১০০%	১০০%

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য।

নির্বাচিত নারীদের মধ্যে বিবাহিতা এবং স্বামীর সঙ্গে বসবাস করে, এমন নারীর সংখ্যাই বেশি (ঋণগ্রহীতা ৮৯%, অ-ঋণগ্রহীতা ৯২%) । বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং তালাকপ্রাপ্তাদের সংখ্যা খুবই কম (সারণি ৩)।

সারণি ৪ : নির্বাচিত নারীর পরিবারের ধরন

পরিবারের ধরন	সংখ্যা (%) N = ২০০	
	ঋণ গ্রহীতা N = ১০০	অ-ঋণ গ্রহীতা N = ১০০
একক পরিবার	৯৫%	৯৪%
যৌথ পরিবার	৫%	৬%
মোট	১০০%	১০০%

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য।

গ্রামটিতে ঋণগ্রহীতাদের ৯৫% এবং অ-ঋণগ্রহীতাদের ৯৪% একক পরিবার, যা সাম্প্রতিককালে এ দেশের গ্রামে যৌথ পরিবারের ভাঙন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে (সারণি ৪)।

সারণি ৫ : নির্বাচিত নারীর পরিবারের সদস্য সংখ্যা

পরিবারের সদস্য সংখ্যা	সংখ্যা (%) N = ২০০	
	ঋণ গ্রহীতা N = ১০০	অ-ঋণ গ্রহীতা N = ১০০
৩ হতে ৫	৭৩%	৬৮%
৬ হতে ৭	২৭%	৩২%
মোট	১০০%	১০০%

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য।

ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ হতে ৫ জনের মধ্যে ৭৩% ও ৬ হতে ৭ জনের মধ্যে ২৭%। অপর পক্ষে অ-ঋণগ্রহীতাদের সদস্য সংখ্যা ৩ হতে ৫ জনের মধ্যে ৬৮% এবং ৬ হতে ৭ জনের মধ্যে ৩২% (সারণি ৫)।

সারণি ৬ : নির্বাচিত নারীর বাসস্থানের ধরন

বাসস্থানের ধরন	সংখ্যা (%) N = ২০০	
	ঋণ গ্রহীতা N = ১০০	অ-ঋণ গ্রহীতা N = ১০০
সম্পূর্ণ পাকা	৪%	-
টিনের চালা মাটির দেয়াল	৭৮%	৫৭%
খড়ের চালা মাটির দেয়াল	১২%	৩২%
খড়ের চালা ছাঁচার বেড়া	৬%	১১%
মোট	১০০%	১০০%

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য।

গবেষণার জন্য নির্বাচিত সকল মহিলাই তাদের নিজস্ব বাসস্থানে বসবাস করে। তবে ঋণ গ্রহীতাদের বাসস্থান অ-ঋণ গহীতাদের বাস্থানের চেয়ে তুলনামুলকভাবে উন্নত। উলেখ্য, অধিকাংশ (৭৮%) ঋণ গ্রহীতা নারীর বাসস্থানই মাটির দেয়াল ও টিনের চালা দ্বারা তৈরি। ৪% ঋণগ্রহীতা নারীর বাসস্থান সম্পূর্ণ পাকা (সারণি ৬)।

সারণি ৭ : নির্বাচিত নারীর চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ

চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ	সংখ্যা (%) N = ২০০	
	ঋণ গ্রহীতা N = ১০০	অ-ঋণ গ্রহীতা N = ১০০
ভুমিহীন	৩২%	৩৮%
১ বিঘা পর্যন্ত	১৬%	২২%
২-৩ বিঘা পর্যন্ত	৩৬%	২৬%
৪-৫ বিঘা পর্যন্ত	১২%	১০%
৫-৬ বিঘা পর্যন্ত	৪%	৪%
মোট	১০০%	১০০%

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য।

গবেষণার জন্য নির্বাচিত মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশই ভূমিহীন (ঋণ গ্রহীতা ৩২% এবং অ-ঋণ গ্রহীতা ৩৮%)। তাছাড়া বাকি সব মহিলাদের সকলেরই কিছু কিছু চাষাবাদযোগ্য জমি রয়েছে (সারণি ৭)। উভয় প্রকার নারীর সবাই (১০০%) টিউবওয়েলের পানি পান করে। গবেষণাধীন গ্রামটি পলী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়। উভয় প্রকার উত্তরদাতারা হারিকেন ও কুপি বাতি ব্যবহার করে। গবেষণা এলাকার মহিলারা মোটামুটি স্বাস্থ্য-সচেতন। প্রায় সব বাড়িতেই পায়খানা রয়েছে; তবে এ গুলোর অধিকাংশই কাঁচা। শুধু মাত্র ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৮% মহিলার বাড়িতে পাকা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে।

সারণি ৮ : নির্বাচিত নারীর বার্ষিক আয় (আনুমানিক)

বার্ষিক আয় (আনুমানিক)	সংখ্যা (%) N = ২০০	
	ঋণ গ্রহীতা N = ১০০	অ-ঋণ গ্রহীতা N = ১০০
১০,০০০-১৫,০০০ টাকা	১২%	৭৮%
১৫,০০০-২০,০০০ টাকা	২৬%	১২%
২০,০০০-২৫,০০০ টাকা	৪২%	৬%
২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা	১৮%	৪%
৩০,০০০-তদোর্ধ টাকা	২%	-
মোট	১০০%	১০০%

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য।

গবেষণা এলাকার নির্বাচিত মহিলাদের মধ্যে ঋণগ্রহীতাদের বার্ষিক আয় অ-ঋণগ্রহীতাদের তুলনায় বেশি। এর কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে যে, ঋণগ্রহণকারী মহিলারা গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে উপার্জনমূলক কাজ করে থাকে। অপর পক্ষে, পুঁজির অভাবে অ-ঋণ গ্রহীতা মহিলারা আয় বর্ধক কোনো কাজ করতে পারে না।

ক্ষুদ্রঋণ ও নারীর স্বাবলম্বিতা

প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা থেকে নারীদের নিজস্ব অবস্থান সৃষ্টি ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে হাঁস-মুরগি ও পশু পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ও অন্যান্য আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ করছে অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঋণনির্ভর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে যোগদানের মাধ্যমে নারীরা পরিবারে অর্থনৈতিক অবদান রাখছে। বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ থেকে তারা যে আয় করছে তা দিয়ে একদিকে যেমন স্বাবলম্বী হচ্ছে অন্যদিকে সংসার পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে। তাই বলা যায়:

> Work for women outside-inside the home has implications not only for the financial well being of the family but also for women's status within the home (McCarthy: 1980:17).

এ দেশের অধিকাংশ নারী অর্থ উপার্জন করতে পারে না বলে তাদেরকে অন্যের ওপর নির্ভর করে চলতে হয়। তাই নারীর নির্ভরশীলতা দূর করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন শর্তে নারীদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে। এমতাবস্থায় গবেষণাধীন এলাকার ঋণ গ্রহীতাদের স্বাবলম্বিতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা হলো।

সারণি ৯: ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ঋণ গ্রহীতা নারী

ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	ঋণ গ্রহীতা নারীর সংখ্যা (%) N = ১০০
বিআরডিবি	৬৭%
সমাজকল্যাণ	১৫%
ব্র্যাক	৮%
টিএমএসএস	৪%
আশা	৪%
অন্যান্য	২%
মোট	১০০%

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য।

আলোচ্য গবেষণায় ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বাবলম্বিতা সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে অধিকাংশ ঋণগ্রহীতা নারী তাদের স্বামী ও নিকট কোনো আত্মীয়ের অনুপ্রেরণায় ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। পরিবারের অভাব-অনটন ও অসহায় অবস্থার প্রেক্ষিতে স্বামীরা তাদের স্ত্রীকে ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত হতে সহায়তা করেছেন। গবেষণা এলাকায় বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন : বিআরডিবি, সমাজকল্যাণ, ব্র্যাক, টিএমএসএস, আশা ইত্যাদি। আর ঋণগ্রহীতা মহিলারা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সাথে ১০ থেকে ২০ বছর ধরে সংশ্লিষ্ট। এক সপ্তাহে কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী সপ্তাহে তা পরিশোধ করা যায়—এই সুবিধার কারণে ৬৭% উত্তরদাতা বিআরডিবি'র সদস্য হয়ে সেখান থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। এছাড়া ১৫% উত্তরদাতা সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর থেকে প্রদত্ত

ঋণ গ্রহণ করেছে, ৮% ব্র্যাক থেকে, ৪% টিএমএসএস, ৪% আশা ও ২% ঋণ গ্রহীতা নারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেছে সারণি ৯)।

সারণি ১০ : গৃহীত ঋণের টাকা ব্যবহার

গৃহীত ঋণের টাকা ব্যবহার	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা (%)N = ১০০
হাঁস-মুরগি পালন	৩৪%
ক্ষুদ্র ব্যবসা	২৮%
সেলাই মেসিন ক্রয়	১৭%
গাভী পালন	১২%
অন্যান্য	৯%
মোট	১০০%

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য।

গৃহীত ঋণের টাকায় ৩৪% নারী হাঁস-মুরগি পালন, ২৮% নারী ক্ষুদ্র ব্যবসা, ১৭% নারী সেলাই মেশিন ক্রয়, ১২% নারী উন্নত জাতের গাভী পালন ও ৯% নারী অন্যান্য আয় বৃদ্ধিমুলক অথবা পারিবারিক প্রয়োজন, যেমন মেয়ের বিয়েতে যৌতুক প্রদান, জমি ক্রয় ইত্যাদি খাতে ব্যয় করেছে (সারণি ১০)।

নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষ পরিবারের প্রধান হওয়ায় তার উপার্জিত অর্থের দ্বারাই সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হয় এবং সেক্ষেত্রে নারীর কোনো ভূমিকাই থাকে না। ফলে গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে,

> There is a discrepancy between the way Bangladeshi women are viewed and the actual way Bangladeshi women live (Marun,1982:23)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীদের নিজেদের জীবন, পরিবার এবং পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা বোঝায়। এমতাবস্থায় গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে যা কেবলমাত্র আয় বৃদ্ধিই করে না বরং বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা, কায়িক পরিশ্রমের মজুরি বৃদ্ধি এবং দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়ায় (আকতার, ১৯৯৭:৪৯)। এ ক্ষেত্রে গবেষণার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী নারীদের পরিবারে সিদ্ধান্তগ্রহণ, পরিবারে সম্পর্ক ও পারিবারিক সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিরূপ ভূমিকা রাখে সে সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা হলো।

সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে অ-ঋণগ্রহীতাদের (১৯%) চেয়ে ঋণগ্রহীতাদের (৬৮%) এবং সন্তানের বিবাহের ক্ষেত্রেও অ-ঋণগ্রহীতাদের (২৫%) চেয়ে দ্বিগুন সংখ্যকের বেশি ঋণগ্রহীতা (৬৫%) সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে। কিন্তু গ্রাম-বাংলার ধনী-দরিদ্র সকল নারীরা যেহেতু গৃহস্থালীর কাজে অভ্যস্ত সেহেতু কোনো মৌসুমে কোনো ফসল চাষ করতে হবে তা সাধারণত পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই নির্ধারণ করে থাকে; তা সত্ত্বেও জমি বর্গা/বন্ধক কিংবা ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেখানে অ-ঋণগ্রহীতাদের কোনো মতামতই গ্রহণ করা হয় না (২%) সেখানে ৬৯% ঋণগ্রহীতার মতামত গ্রহণ করা হয়। তবে কিছু ব্যাপারে যেমন, ভোট প্রদান, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে নারীদের সচেতন মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। যদিও ঋণগ্রহীতা ও অ-ঋণগ্রহীতা উভয় প্রকার উত্তরদাতাদের বেশি অংশই নিজর পছন্দমতো ব্যক্তিকে ভোট দিতে পারে না তারপরও ঋণগ্রহীতাদেও ৯৩% স্বাধীনভাবে পছন্দনীয় প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে; আর

অ-ঋণগ্রহীতাদের মাত্র ১৮% তাদের পছন্দনীয় প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে নারী সমাজের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টিতে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছোট সংসারের সুফল ভোগ করতে প্রায় সবাই আগ্রহী। তাছাড়া ঋণের টাকার সহায়তায় ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা করার ক্ষমতাও ঋণগ্রহীতাদের বৃদ্ধি পেয়েছে; কেননা অ-ঋণগ্রহীতাদের (৩৭%) তুলনায় ঋণগ্রহীতারা (৭৬%) নিজস্ব ইচ্ছামতো পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। যদিও আর্থিক অভাব অনটনের কারণে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ খাদ্য বা চিকিৎসা খাতে পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম নয়; তথাপি আয়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর অ-ঋণগ্রহীতাদের তুলনায় (খাদ্যের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ৭১% ও অ-ঋণগ্রহীতা ৪৬%, চিকিৎসা ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ৬২% ও অ-ঋণগ্রহীতা ১৬%) ঋণগ্রহীতাদেরই বেশি পছন্দের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

সারণি ১১ : পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মতামত সম্পর্কিত তথ্য

সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়	মতামতের গুরুত্ব আছে	
	ঋণগ্রহীতা N = ১০০	অ-ঋণগ্রহীতা N = ১০০
সন্তান গ্রহণ	৭৩%	২১%
সন্তানের পড়াশুনা	৬৮%	১৯%
সন্তানের বিবাহ	৬৫%	২৫%
পছন্দ মতো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ	৭৬%	৩৭%
ইচ্ছা মতো খাদ্য গ্রহণ	৭১%	৪৬%
ইচ্ছা মতো চিকিৎসা গ্রহণ	৬২%	১৬%
জমি বর্গা/বন্ধক নেবার ক্ষেত্রে	৬৯%	২%
দ্রব্য ক্রয়/বিক্রয়ের ক্ষেত্রে	৭৪%	১৫%
কোনো দ্রব্য ধার প্রদানের ক্ষেত্রে	৫৪%	২৯%
অতিথি আপ্যায়নে	৭১%	১৩%
সিনেমা নাটক দেখার ক্ষেত্রে	৭৯%	৬%
আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যাবার ক্ষেত্রে	৭৩%	১২%
ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন	১০০%	১০০%
নির্বাচনে ইচ্ছা মতো ভোট প্রদান	৯৩%	১৮%

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য।

বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় পরিবারের প্রয়োজনে জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের মতামতই বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কিন্তু সময় এবং পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে বিষয়টি একচেটিয়াভাবে ঘটছে না। উত্তরদাতাদের (অ-ঋণগ্রহীতা ১৫%, এবং ঋণগ্রহীতা ৭৮%) এ ব্যাপারে মতামত প্রদান করতে পারে।

স্বাধীন মতামতের পূর্বশর্ত আর্থিক সচ্ছলতা। গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলে নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী অনেক কাজই করতে পারে, যেমন অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে অ-ঋণগ্রহীতাদের (১৩%) তুলনায় ঋণগ্রহীতারা (৭১%) অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। ৭৯% ঋণগ্রহীতা নারী নিজের ইচ্ছামতো সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখতে পারলেও অ-ঋণগ্রহীতাদের মাত্র ৬% নারী এ ধরনের সুযোগ পায়। আবার ঋণগ্রহীতাদের ৭৩% এবং অ-ঋণগ্রহীতাদের ১২% নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যেতে পারে (সারণি ১১)। এছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, রাজনৈতিক সচেতনতা ইত্যাদির সাথে কিছু নির্ধারিত আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের (বয়স, শিক্ষা ইত্যাদি) সম্পর্ক তুলে ধরার মাধ্যমে দেখা গেছে

অপেক্ষাকৃত কম বয়সী, যৌথ পরিবার, নিজের কম উপার্জিত আয়, কম সময় ধরে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততার তুলনায় ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে বেশি বয়সী (ন্যূনতম ৩০ বছর), একক পরিবারের সদস্য, নিজের উপার্জিত আয়ের পরিমাণ বেশি এবং দীর্ঘ সময় ধরে প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এমন ঋণগ্রহীতা নারীর ক্ষেত্রেই বেশি ক্ষমতায়ন হয়েছে।

গ্রামীণ নারীর জীবন, জীবিকা ও ক্ষমতায়ন

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বৈচিত্র্যহীন একঘেঁয়েমি জীবন যাপন করে থাকে। বংশপরম্পরায় এ ধরনের জীবন যাপনেই তারা অভ্যস্ত। এখানে লিঙ্গ-বৈষম্য সীমাহীন। একজন নারী, সে কিশোরী হোক, যুবতী হোক বা বর্ষীয়ানই হোক; নিজের ইচ্ছামতো কোনো কিছুই করতে পারে না। পরিবারের বর্ষীয়ান পুরুষ অথবা কর্তা-ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির বাইরে যাওয়াও নিষেধ। তবে ইদানীং সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে এ ধরনের কড়াকড়ি অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়েছে। তারপরও এ দেশের অনেক গ্রামীণ নারী ফতোয়াবাজির শিকার হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। গ্রাম বাংলার একজন সাধারণ নারী সকাল থেকে মধ্য রাত অবধি নানা রকম পারিবারিক কাজে কর্মব্যস্ত থাকে। অথচ তাদের এই কাজ পরিবারের কাছে অর্থনৈতিকভাবে মূল্যহীন। গ্রামের অশিক্ষিত ও অনগ্রসর মহিলারা এ সব বিষয় নিয়ে কখনোই কোনো চিন্তাভাবনা করে না। আগের দিনে দরিদ্র পরিবারের মহিলারা অনেক সময়ে না খেয়ে উপোস করতো, তবুও অর্থের বিনিময়ে কোনো কাজ করার জন্য ঘরের বাইরে যেতো না। অসুখ-বিসুখে গ্রাম্য ওঝার পানি পড়া ব্যতিত আধুনিক চিকিৎসার কথা তারা ভাবতেও পারতো না। তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিবারের পুরুষ সদস্যরা ছিল একেবারেই উদাসীন। নারীর স্বাধীন সত্তা বলতে কিছুই ছিল না। তাদের মূল কাজ ছিল নিয়মিত সন্তান উৎপাদন এবং সংসারের যাবতীয় কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা। এক কথায় পরিবারের নারী সদস্যদের মূল নিয়ন্ত্রক ছিল পরিবারের পুরুষ সদস্যরা।

কিছুদিন আগেও ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টি অনেকের কাছেই ছিল অস্পষ্ট এবং অবদমিত। আর নারী ক্ষমতায়ন বিষয়টি গ্রামীণ সমাজে এখনো অনেকেরই অজানা। অনেকেই মনে করে যে, ক্ষমতা আর ক্ষমতায়ন দুটি সমার্থক প্রত্যয়। যাই হোক, গ্রামীণ নারীর জীবন, জীবিকা ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে আলোকপাতের জন্য গবেষণা এলাকার নির্বাচিত দুইজন মহিলার জীবন বৃত্তান্ত (কেস স্টাডি) উপস্থাপন করা হলো।

কেস স্টাডি ১

রশিদা বেগমের বর্তমান বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। হালকা-পাতলা গড়ন। গায়ের রং বেশ ফর্সা। চমৎকার শারিরীক গঠন দেখে মনেই হয় না তার বয়স অতো হয়েছে। রশিদা লেখাপড়া করেছে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। তিন সন্তানের জননী। দুই মেয়ে এক ছেলে। মেয়ে দুটি বড়। বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেটি বর্তমানে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। রশিদার বাবার বাড়ি চানপুর গ্রামে। মাত্র ষোল বছর বয়েসে তার বিয়ে হয়েছিল মালাহার গ্রামের কাদের মুন্সির মেজো ছেলে ওহিদুলের সাথে। পরপর তিনবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েও সে পাস করতে পারেনি। সুতরাং অন্যান্য ভাইদের সাথে বাবার জমিতে ওহিদুল কৃষি কাজ করতো। ওহিদুলেরা পাঁচ ভাই দুই বোন। অন্যান্য ভাইদের মতো জমিতে সে ঠিকমতো খাটাখাটনি করতে পারতো না বলে পরিবারের কেউই ওহিদুল ও তার স্ত্রীকে ভালো চোখে দেখতো না। এরই মধ্যে তাদের প্রথম মেয়ের জন্ম হয়। একদিন ভাইয়ে-ভাইয়ে গোলমাল লাগে। কাদের মুন্সি দেড় বিঘা ধানী জমি ও তিন মণ ধান দিয়ে ওহিদুলকে আলাদা করে দেয়। শুরু হয় তাদের নতুন জীবন। কোলের শিশু সন্তানটির বয়স তখন মাত্র চার মাস। এ হেন অবস্থায় সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ স্বামী-স্ত্রী দুজনেই

চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। তখন চৈত্র মাস। বাবার দেওয়া জমিটুকু তখন খালিই পড়ে ছিল। রশিদা বুদ্ধি করে সেখানে মিষ্টি কুমড়ার চারা লাগিয়ে দেয়। ওহিদুল কাজের খোঁজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। ওদিকে রশিদা মিষ্টি কুমড়ার চারাগুলোর নিয়মিত পরিচর্যা করতে থাকে। রশিদার সংসারে আয়-রোজগার বলতে তখন কিছুই ছিল না। সে সর্বক্ষণ একটা চিন্তাতেই বিভোর থাকতো, তা হলো শশুরের দেওয়া তিন মণ ধান শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা কি খাবে। রশিদার বাবার অবস্থাও তেমন ভালো নয়। তারপরও মেয়ের এমন অসময়ে বাবা অনেক কষ্ট করে আধা মণ গম, সের দশেক চাল আর পোষার জন্য একটা ছাগল দিয়ে যায়। কোনো কাজ না পেয়ে ওহিদুলও জমিতে খাটতে থাকে। শ্রাবণ মাসে মিষ্টি কুমড়ার গাছে ফুল আসে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আশার স্বপ্ন দেখতে থাকে। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস থেকে তারা মিষ্টি কুমড়া বিক্রি শুরু করে। বাবার সংসার থেকে আলাদা হওয়ার পর কার্তিক মাস পর্যন্ত তাদের কষ্টের কথা রশিদা এখনো ভুলতে পারেনি। যাই হোক, জমিতে উৎপাদিত মিষ্টি কুমড়া বিক্রি করে তারা বেশকিছু নগদ টাকা পায়। ঠিক এই সময়ে তিন কাঠা জায়গা দিয়ে সেখানে বাড়ি করে থাকতে বলে। উপায় না দেখে তারা সেই টাকা দিয়ে যেখানে ছোট্ট একটা ঘর তৈরি করে। এরপর ঐ জমিটুকুকে সম্বল করেই তাদের সংসার কোনোমতে চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু কোনো রকম উন্নতি হচ্ছিল না। তারপর আবার তার আর একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। সংসারে আস্তে আস্তে অভাব দেখা দিতে থাকে। একদিন স্বামী-স্ত্রী মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, রশিদার বাবার দেওয়া ছাগল ও তার দুটি বাচ্চা বিক্রি করে ওহিদুল কাঁচামালের ব্যবসা করবে। কিন্তু সমস্যা হলো ছাগলটি প্রতিদিন মোটামুটি আধসের করে দুধ দিতো। আর সেই দুধ তাদের মেয়ে দুটি খেতো। এর মধ্যে রশিদার এক খালাতো বোন একদিন তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সন্ধান দেয়। আর বলে যে, সেখান থেকে ঋণ নিয়ে সহজেই তার স্বামী কাঁচামালের ব্যবসা করতে পারে। তার পরদিনই রশিদা সেই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ঋণের ব্যাপারে কথা বলে আশানুরূপ সাড়া পায় এবং মোটামুটি মাস তিনেকের মধ্যেই সে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ পায়। আর সেই ঋণের টাকা দিয়ে রশিদার স্বামী ওহিদুল কাঁচামালের ব্যবসা শুরু করে। ঋণের টাকা শোধ হওয়ার পর সে পুনরায় কুড়ি হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ছোট আকারের একটি মুরগির খামার করে। আস্তে আস্তে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। ইতিমধ্যে তাদের দুটি মেয়েই মাধ্যমিক পাস করে। অতঃপর ভালো ঘর দেখে তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়। বর্তমানে তারা বেশ সুখে আছে। রশিদার মুরগির খামারটি বেশ লাভ জনক হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে খামারটি তারা বাড়াতে থাকে। এখন তাদের খামারে এক হাজারেরও বেশি মুরগি রয়েছে। তাদের আয়-রোজগার এখন বেশ ভালো। শ্রম আর মেধার মাধ্যমে তারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করেছে। সাড়ে চার বিঘা ধানী জমি কিনেছে, তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটি সুন্দর পাকা বাড়ি করেছে, ভেম ধুমধাম করে মেয়ে দুটির বিয়ে দিয়েছে। সংসারে এখন আর তাদের কোনো কিছুর অভাব নেই। রশিদা এবং তার স্বামী ওহিদুল এক প্রশ্নের জবাবে জানায় যে, বাবার সংসার থেকে পৃথক হওয়ার পর একদিনও তাদের মধ্যে কোনো রকম গোলমাল কিংবা মতানৈক্য হয়নি। তাছাড়া যে কোনো কাজ করার আগে স্বামী-স্ত্রী এক সাথে বসে ভালোভাবে আলোচনা করে নেয়। রশিদা এখন রোজগারের অর্থ ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারে। প্রয়োজনে এখন সে একাই মালাহার থেকে নওগাঁ শহরে যাতায়াত করে। একবার সে তার অসুস্থ আত্মীয়কে দেখার জন্য রাজশাহীতেও গিয়েছে। এতে তার স্বামী তাকে বাধা দেয়নি। রশিদা ও ওহিদুল ইচ্ছেমতো কাপড়-চোপড় তৈরি করে। রশিদা সোনার গহনা বানায়। এতে স্বামী-স্ত্রী কেউ কাউকে বাধা দেয় না। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আলোচনা করে রশিদা পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ওহিদুল জানায় যে, তাদের অবস্থার পরিবর্তনের মূলে তার স্ত্রী রশিদার বুদ্ধিমত্তা ও শ্রম। তাছাড়া প্রাথমিক অবস্থায় নেওয়া

ক্ষুদ্র ঋণ তাদের যথেষ্ট উপকারে এসেছে। তাই স্ত্রীর কোনো সিদ্ধান্তে সে দ্বি-মত পোষণ করে না। রশিদা সৎ সদালাপী এবং অত্যন্ত মিশুক মহিলা। তাছাড়া সে পরোপকারীও বটে। পাড়া-প্রতিবেশি এমন কি আশপাশের অনেক মহিলাই রশিদার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের জন্য আসে। শুধু তাই নয়, অনেক পুরুষও রশিদার সততা ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করে। কিছুদিন আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময়ে এলাকার অনেকেই রশিদাকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচন করার কথা বলেছিল। কিন্তু সে রাজি হয়নি। তবে সামনের নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচন করার তার ইচ্ছে আছে।

কেস স্টাডি ২

মরিজান বিবির বর্তমান বয়স আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ বছর। সে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। পনের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল আড়ানগর গ্রামের জনৈক খালেকের সাথে। কিন্তু সে বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। বিয়ের সময়ে যৌতুক হিসেবে জামাইকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা আর একটি ফনিক্স সাইকেল দেওয়ার কথা ছিল। মরিজানের বাবার অবস্থা তেমন ভালো নয়। জমি বন্ধক রেখে জামাইকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক দিয়েছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুত ফনিক্স সাইকেলটি বার বার সময় নিয়েও দিতে পারেনি। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই গোলমাল হতো। শুধু তাই নয়, খালেক মাঝে মধ্যেই মরিজানকে প্রচণ্ড মারধোর করতো। আর এতে ইন্ধন যোগাতো খালেকের মা, বাবা, ভাই, বোন সবাই। এরই মধ্যে একই গ্রামের সইজুদ্দির মেয়ের সাথে খালেকের গোপন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সইজুদ্দির অবস্থা মোটামুটি ভালো। বিষয়টি জানার পর সইজুদ্দি খালেককে জানায় যে, সে যদি তার মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজনে তার স্ত্রীর কাছ থেকে নেওয়া যৌতুকের পাঁচ হাজার টাকা সে পরিশোধ করে দেবে। এতে খালেক রাজি হয় এবং সইজুদ্দির কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে টাকা মরিজানের হাতে ধরিয়ে দেয়। এরপর মরিজানকে তালাক দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। উল্লেখ্য, তাদের বিয়ে রেজিস্ট্রি করা ছিল না। মরিজান বাবার সংসারে ফিরে আসে এবং ফেরত পাওয়া টাকা বাবার হাতে দিলে তার বাবা সে টাকা দিয়ে বন্ধকী জমি ফেরত নেয়। বাবার টানাটানির সংসারে মরিজানকে খুবই কষ্ট করে দিন কাটাতে হতো। তাদের ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সম্পর্কে তার ফুফা। মরিজানের অবস্থা দেখে আর তার বাবার অনুরোধে তিনি মরিজানকে সরকারি রাস্তায় মাটি কাটার কাজে লাগিয়ে দেন। এতে মরিজানের খাওয়া-পরার কষ্ট লাঘব হয়, সাথে সাথে তার বাবার সংসারেও কিছুটা সচ্ছলতা ফিরে আসে। মরিজানের সহকর্মী মালাহার গ্রামের আজাহারের সাথে আস্তে আস্তে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং একদিন তারা বিয়েও করে। এ বিয়েতে উভয় পক্ষের পরিবারেরই মত ছিল। দিন যেতে থাকে। দুটি সন্তান হওয়ার পর মরিজান তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। প্রথম সন্তান ছেলে। সে এখন কলেজে পড়ে। আর দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে, এখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। তাদের দুটি ছেলেমেয়েই লেখাপড়ায় বেশ ভালো। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সন্তানদুটোকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চায়। সন্তানদুটো বড় হওয়ার পর মরিজান মাটি কাটার কাজ ছেড়ে দিয়েছে। সে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে পাঁচটি ছাগল কিনে পোষা শুরু করেছিল। সেখান থেকেই তার উন্নতির সূত্রপাত। এখন সে একটি ছোটখাটো ছাগলের খামার তৈরি করেছে। তার খামারে ছাগলের সংখ্যা বর্তমানে তেইশটি। পূর্বে আজাহারের পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া দুই কাঠা জমির উপর একটি মাত্র খড়ের ঘর ছিল। বর্তমানে তারা প্রায় বিঘা তিনেক ধানী জমি কিনেছে। বসত বাড়িটি পাকা করেছে। বাড়িতে টিউবওয়েল বসিয়েছে এবং পাকা পায়খানা তৈরি করেছে। তারা এখন বেশ সুখেই আছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চমৎকার সমঝোতা। মরিজানের যে কোনো কাজে তার স্বামী

কখনোই বাধা দেয় না। গত নির্বাচনের সময়ে নিজের ইচ্ছাতেই মরিজান ভোট দিয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সে স্বামীর সাথে পরামর্শ করেছে। সংসারের যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে স্বামী-স্ত্রী এক সাথে বসে পরামর্শ করে। পাড়া প্রতিবেশির সাথে তাদের বেশ ভালো সম্পর্ক। মাস ছয়েক আগে, প্রতিবেশি আকুলের মা অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলে মরিজান নিজে তাকে থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানকার ডাক্তার তার চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মরিজান তাকে নিয়ে রাজশাহী মেডিকেলে যায়। শুধু তাই নয়, তার চিকিৎসার জন্য মরিজান সাতশত টাকা খরচ করেছে। ভবিষ্যতে মরিজানের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেব অংশগ্রহণ করার কোনো ইচ্ছা নেই, তবে তার ফুফাকে ভোট দেওয়ার জন্য এলাকার সবাইকে অনুরেধ করবে। তার বিশ্বাস, এলাকার মানুষ তার কথা রাখবে। কারণ এলাকার সবাই থাকে খুব ভালোবাসে এবং তার কথার যথেষ্ট মূল্য দেয়।

উপসংহার

গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্ত এক গ্রামে, যেখানে উন্নত জীবন ব্যবস্থার জন্য, আধুনিক চিকিৎসা, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নেই। এতৎসত্ত্বেও সন্তান ধারণ ও লালন-পালন, স্বামী ও পরিবারের সদস্যদের সেবা, রান্নাবান্না আর ঘর-গৃহস্থালির আটপৌরে জীবনে বন্দী নারীদের মধ্যে থেকে অল্পসংখ্যক তাদের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার বাইরে আসতে পেরেছেন বলে মনে হয়। আর এর পশ্চাতে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বর্তমানে উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক সচ্ছলতাই নারীর স্বাবলম্বিতা ও ক্ষমতায়ন বিশেষভাবে সহায়তা করে। নারীরা স্বামীর প্রেরণায় বিভিন্ন ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত হয়ে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে গাভীপালন, হাঁস-মুরগি পালন, ক্ষুদ্রব্যবসা, সেলাই প্রভৃতি আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড থেকে কিছু না কিছু আয় করতে সক্ষম হচ্ছে। যদিও সুস্থ পারিবারিক পরিবেশের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাদের জীবনে অনুপস্থিত, তথাপি তারা তাদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক মাসিক আয় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। সর্বোপরি বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য তারা অন্তহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণ নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করছে যা তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, আধুনিক ধ্যান-ধারণা অর্জন এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও সহায়তা করছে। উল্লেখ্য, যদিও নারীর জন্য তাদের প্রচলিত গৃহস্থালি কাজের পাশপাশি নতুন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র তৈরির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা তবুও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় নারীরা চিরাচরিত কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১১৩.৯ মিলিয়ন যার মধ্যে ৭৩৮৯২০০০ জন গ্রামীণ, ৩৬৩৪৩০০০ জন নারী এবং নারী শিক্ষার হার মাত্র ১৩.২ শতাংশ (PRB, ১৯৯৩)। শিক্ষিত নারীর উল্লেখযোগ্য অংশ শহরে বসবাস করে। যার ফলে গ্রামীণ নারীদের বেশিরভাগই অশিক্ষিত অথবা স্বল্প শিক্ষিত। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষার অভাব একটি বড় বাধা। তাই পুরুষ শাসিত সমাজ, অশিক্ষা, অজ্ঞতা, বিভিন্ন কুসংস্কার ও অন্যান্য বাধার কারণে গ্রামীণ নারীরা সম্পূর্ণভাবে তাদের দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা দেখানো বা প্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছে না। তাই নারীদের জন্য নতুন ও অধিক উৎপাদনমুখী আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের অনুসন্ধান প্রয়োজন যা তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে এবং পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে সাহায্য করবে। গ্রামীণ নারীদের অবশ্যই সমাজের কুসংস্কার ও প্রচলিত প্রথা থেকে বেরিয়ে গণতান্ত্রিক, মানবিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

অর্জন করতে হবে। অবশ্য এজন্য সর্বাগ্রে সমাজের পুরুষদেরও মুক্ত মানসিকতা দিয়ে এসব কর্মকাণ্ড গ্রহণকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং শুধুমাত্র তখনই ক্ষুদ্র ঋণ নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারবে এবং আয় অর্জনের মাধ্যমে মানবিক মর্যাদা নিয়ে সমাজে টিকে থাকতে সক্ষম হবে, যা বিভিন্ন স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিবে। এক কথায় বলা যায়, ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে আর্থিক সঙ্গতি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম্মান ও মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে নারীকে স্বাবলম্বী ও ক্ষমতায়িত করবে।

তথ্যপঞ্জি

আকতার, শাহনাজ (১৯৯৭), "গ্রামীণ বাংলাদেশে ঋণ ব্যবস্থাপনা : জামালপুর জেলার নারায়ণপুর গ্রামের একটি চিত্র", *নির্যাস*, খণ্ড ৪ (ঢাকা : ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ)।

আখতার, রাশেদা (১৯৯৬), "উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিও : গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন", *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা-১ (ঢাকা : উইমেন ফর উইমেন)।

আখতার, তাহমিনা (১৯৯৫), *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মঈন, জুলিয়া (১৯৯৮), "গ্রামীণ কর্মজীবী মহিলাদের ভূমিকা, মর্যাদা ও পরিবর্তনের ধারা : একটি গ্রাম পর্যায় সমীক্ষা", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা-৬৮, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সাহা, সুব্রত কুমার (১৯৯৭), "ক্ষুদ্র ঋণ: পল্লী নারীর ক্ষমতায়নের হাতিয়ার", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, তৃতীয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (ঢাকা : স্টেপস টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট।

হারুন, অবন্তী ও আইনুন নাহার (২০০১), "গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের মিথ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", *'চর্চা : নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধ সংকলন'* নৃবিজ্ঞান বিভাগ (ঢাকা : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

হাসেমী, সৈয়দ (১৯৯১),"এনজিও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোনো বিকল্প পথ নয়", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৪০।

BBS (1994), *Bangladesh Population Census. 1991*, National Series, Vol.-1.

BBS (1991), Union Statistical Office, Naogaon: Dhamoirhat.

GOB (1995), *Bangladesh Economic Review 1995*, Dhaka: Ministry of Finance.

Duza, A. (1989), *Women and Population Dynamics*, California: Newbury Park.

Haider, Rana *et al.* (1994), "Women, Poverty and the Environment", *Environment and Development in Bangladesh*, Dhaka: The University Press Limited.

Karmakar, K.G. (1999), *Rural Credit and Self-help Groups*, New Delhi: Sage Publications.

Khandker, Shahidur R. (1998), *Fighting Poverty with Micro-credit: Experience in Bangladesh*, Dhaka: The University Press Limited.

Karl, M. (1995) *Women and Empowerment: Participation and Decision Making*, London: Zed Books Ltd.

Lockwood, David E. (1997), *UNDP in Bangladesh*, Dhaka: Bangladesh

Mizan, Ainon Nahar (1994), *In Quest of Empowerment: the Grameen Bank Impact on Women's Power and Status*, Dhaka: The University Press Limited.

Mahmud, Simeen (2001), "Women Empowerment," *Monitoring and Evaluation of Micro finance Institutions*, Dhaka: BIDS.

Marun, E. Elizaboth (1982), *Rural Women at Work in Bangladesh*, Unpublished Dissertation. Berkeley: California University.

McCarthy, Florence E. (1980), *"Patterns of Employment and Income Earning Among Female Headed Household Labour"*, Women's Section, Family and Development Division, Ministry of Agriculture and Forest, Dacca: Bangladesh.

Shahid, Shaouli (2000), "Beijing +5 and Bangladesh," *Unnayan Podokhep*, Vol.-5, No.-1, Dhaka: Steps towards Development.

Shehabuddin, Rahnuma (1992), *Empowering Rural Women: The Impact of Grameen Bank in Bangladesh*, Dhaka: Grameen Bank.

The World Bank (1999), *Bangladesh: Key Challenges for the Next Millennium*, U.S.A.: Washington.

PRB (1993), *World Population Data Sheet*, Washington D.C.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২

প্রবাসী কর্মজীবীদের পারিবারিক জীবন : প্রোষিতভর্তৃকার ক্ষমতায়ন

মোঃ ওমর ফারুক**

Abstract: Women development through 'Empowerment Approach' is one of the major strategies in the development discourse of Bangladesh. Economic empowerment is considered as the basic source of overall empowerment of women. Bangladesh is one of the main labour sending countries in the world and remittance is the highest source of our foreign exchange earning. It is said that left-behind familes of migrant workers enjoy comparatively better economic solvency, well-being and other facilities. Similarly, their wives are being empowered by this process. They are advance in respect of entitlement, decision-making process in the family and social activities in the community and society. This paper attempts to explore the nature and trends of empowerment of migrant workers' as well as development and well being of their families left-behind based on field study.

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের উন্নয়নমুখী আলোচনায় 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক অভিবাসন' একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। অভিবাসনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যায়, ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক সীমানা পেরিয়ে কিংবা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জনগোষ্ঠীর গমনাগমন একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য ও মানব সভ্যতার মতোই সুপ্রাচীন।[১] কর্মসংস্থান, উন্নত জীবনযাত্রার হাতছানি, জীবনবিপন্নকারী পরিস্থিতি থেকে আত্মরক্ষাসহ নানা কারণে মানুষ প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের সর্বত্র। এই অভিবাসন প্রক্রিয়ার উৎস ও গন্তব্য উভয় দেশের সমাজ সমৃদ্ধকরণে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষত বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ নারীর ক্ষমতায়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।[২] বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ তার জন্মগত বাসভূমির বাইরে বসবাস করে। ক্রমপরিবর্তনশীল ভূ-রাজনীতি, অর্থনৈতিক দৃশ্যপটের পরিবর্তন এবং অর্থনীতি বিষয়ক জ্ঞানভাণ্ডার প্রবৃদ্ধির কারণে একবিংশ শতাব্দীর আগামী দিনগুলোতে বিশ্বচরাচরে মানুষের গমনাগমন বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। অর্থনীতিবিদ, জনবিজ্ঞানী ও উন্নয়নকর্মীদের মতে, শ্রমের আন্তর্জাতিক গতিশীলতা জাতিসমূহের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা ও উন্নয়ন, সমাজে দারিদ্র্য ও অসমতা দূরীকরণ, লৈঙ্গিক বৈষম্য হ্রাস এবং নারীর ক্ষমতায়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। অমর্ত্য

---

* পিএইচডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; সরকারি কর্মকর্তা।

[১] Tasneem Siddiqui, "State As Agent of Patriarchy: Reflection on Female Migration" in Kazi Tobarak Hossain Muhammad Hasan Imamand Shah Ehsan Habib (etds.), *Women, Gender and Discrimination* (Rajshahi: Department of Sociology, RU, 2004), p. 50.

সেনের মতে, "উন্নয়নশীল দেশসমূহের অনিয়ন্ত্রিত দারিদ্র্যের আধিপত্য ভাঙতে ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিগণিত নারীদের ক্ষমতায়নে আন্তর্জাতিক অভিবাসন ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।[২]

সাধারণত 'নারীর ক্ষমতায়ন' নারী উন্নয়ন ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। নারী উন্নয়নের বিভিন্ন ধরন বা অ্যাপ্রোচের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানী ক্যারোলিন মোজার কর্তৃক সূত্রায়িত 'ক্ষমতায়ন অ্যাপ্রোচ' অন্যতম। একটি জাতির সার্বিক উন্নয়নের সকল কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষের সক্রিয় ভূমিকা অত্যাবশ্যক। উন্নত দেশগুলোতে নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণে এটি সহজেই ধরা পড়ে। আজ বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের যে ধারাবাহিক অগ্রগতি চলছে, বাংলাদেশও তাতে সম্পৃক্ত হয়েছে। তবে বহু উন্নয়শীল দরিদ্র দেশের মতো বাংলাদেশের নারীরাও দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পেষিত এবং ব্যাপক বৈষম্যের শিকার, যা নারীদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পূর্ণ অংশীদারিত্বের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশের মৌলিক পরিসংখ্যানের প্রায় সকল সূচকেই নারীর অধস্তনতা সুস্পষ্ট। বর্তমানে নারীর অধিকার ও সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশেও সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বহু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন ২০০০-এর সার্বিক মূল্যায়নে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজের সকল স্তরে সম-অংশীদারিত্বের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন।[৩]

বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান উপায় হলো তার সার্বিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।[৪] অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমেই তাদের ক্ষমতায়নের বলয় ক্রমশ পরিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে বিস্তৃত হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ হয় অধিকতর সক্রিয়। অর্থনৈতিক মুক্তির নামে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক বা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ব্যাপক সাফল্য অর্জন করলেও এর পাশাপাশি প্রবাসী কর্মজীবীরা এক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।[৫] প্রবাসী কর্মজীবী স্বামীদের প্রেরিত অর্থ (remittance) ও তার বিনিয়োগ সুযোগ, স্বামীর অনুপস্থিতিতে পরিবারের বিভিন্ন ভূমিকা পালনে একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব পালন, সর্বোপরি সামাজিক নানাবিধ গতিশীলতা এবং কর্মকাণ্ডে প্রোষিতভর্তৃকাদের দৃশ্যমানতা এবং অংশগ্রহণ সামগ্রিকভাবে তাদের ক্ষমতায়নে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।[৬] বর্নিত প্রবন্ধে প্রোষিতভর্তৃকার ক্ষমতায়ন বলতে পারিবারিক সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রবাসী কর্মজীবীদের স্ত্রীদের অংশগ্রহণ, সম্ভাব্য সামাজিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুযোগ ও অধিকার অর্জন এবং সামাজিক দৃশ্যমানতা, অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটাবার সামর্থ্য অর্জনসহ সমাজের বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং তা ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জনকে বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা অর্জন, সমাজ বাস্তবতার সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তার উৎপাদন (অর্থনৈতিক) পুনরুৎপাদন (প্রজনন) ও সামাজিক ভূমিকা পালনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে প্রোষিতভর্তৃকার ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

---

[২] Amartya Sen, "Cultural Liberty and Human Development", *Human Development Report 2004* (New York: Oxford University Press, 2004), p. 23.

[৩] মেঘনা গুহঠাকুরতা, "নারী ও রাষ্ট্র", *বাংলাদেশের নারী : বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, আল মাসুদ হাসানউজ্জামান (সম্পা.) (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২) পৃ. ৬৩।

[৪] অবন্তী হারুন ও আইনুন নাহার, "গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের মিথ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", *চর্চা সংকলন*, জহির আহমদ ও মানস চৌধুরী (সম্পা.) (ঢাকা : নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১), পৃ. ৬৫।

[৫] Abdullahel Hadi, "Overseas Migration and the Well-being of those Left Behind in Rural Communities of Bangladesh", *Asia-Pacific population Journal*, Vol. 14, No. 1, March, 1999.

[৬] সুরাইয়া বেগম, "রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ এবং অংশগ্রহণের সংকট : পরিপ্রেক্ষিত নারী", *সমাজ নিরীক্ষণ*, ৫০ সংখ্যা নভেম্বর ১৯৯৩।

বর্তমান প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশের প্রবাসী কর্মজীবীদের পরিচয়, জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের অবদান, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক কাঠামো ও ধরন, প্রোষিতভর্তৃকাদের পারিবারিক জীবন ও আর্থ সামাজিক অবস্থা, তাদের ক্ষমতায়নের প্রকৃতি ও প্রবণতা, স্বামী প্রবাসে থাকায় পরিবারের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণসহ প্রবাসী কর্মজীবীদের রেখে-যাওয়া পরিবারের (Lelf-behind families) নিরাপত্তা, ঝুঁকি হ্রাস ও প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নে আরো কি কি নীতিনির্ধারণী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২. প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

২.১ সাধারণ উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যে হলো বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রবাসী কর্মজীবীদের স্ত্রীদের অর্থাৎ প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের ধরন ও পরিবর্তন প্রবণতা অনুসন্ধান। পরিবারের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, সম্পদের ওপর অধিকার নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও নানামুখী সামাজিক ভূমিকা পালনে তাদেরকে সক্রিয় করে তোলে। প্রবাসী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থ তাদের স্ত্রীদের বা প্রোষিতভর্তৃকাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে কতটুকু অবদান রাখছে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে আত্মনির্ভরশীলতার তত্ত্বানুযায়ী ও বাস্তব প্রয়োজনে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং সংগঠনে তাদের অংশগ্রহণের মাত্রা ও ক্রিয়াশীলতা বিশ্লেষণও এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

২.২ বিশেষ উদ্দেশ্য:

১. স্বামীর প্রেরিত অর্থের মাধ্যমে সচ্ছলতা অর্জনসহ পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সামাজিক ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে প্রোষিতভর্তৃকাদের সক্ষমতা বেড়েছে কিনা তার মূল্যায়ন ;

২. প্রোষিতভতৃকাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিজস্ব পছন্দ ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন প্রবণতা ও পরিমাণ বিশ্লেষণ ;

৩. অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোষিতভর্তৃকাদের সামাজিক সম্পদে (Social Capital) প্রবেশগম্যতা এবং তা ব্যবহারের দক্ষতা ও অধিকার কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই ;

৪. আধুনিক ধ্যান ধারণা, প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি ও খাপ খাওয়ানো, সমস্যা সমাধানে আত্মনির্ভরশীল ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতার উন্নয়ন অন্বেষণ ; এবং

৫. প্রবাসী কর্মজীবীদের অধিকার সংরক্ষণ এবং প্রোষিতভর্তৃকাদের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে কতিপয় নীতি নির্ধারণী সুপারিশ প্রণয়ন ।

এই লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য সামাজিক জরিপ, কেস স্টাডি ও অন্তর্দর্শন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায়। যদিও রাজশাহী জেলায় সামগ্রিকভাবে প্রবাসী কর্মজীবীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম তবুও বিরল ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হিসাবে গবেষণাটিকে প্রতিনিধিত্বশীল করার জন্য 'উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন' (Purposive Sampling)-এর মাধ্যমে ২০ জন প্রবাসী কর্মজীবীর স্ত্রী বা প্রোষিতভর্তৃকাকে নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ গবেষকের একটি বৃহত্তর গবেষণার সমগ্রক হিসেবে উত্তরদাত্রীদের ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকায় এবং সমসাময়িক অন্য কয়েকটি গবেষণায় স্বামীদের আর্ন্তজাতিক অভিবাসন ও দেশে রেখে যাওয়া স্ত্রীদের ক্ষমতায়নের মধ্যে সহ সম্পর্কের প্রতিফলন থাকায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে । তাছাড়া উক্ত নমুনানের মাধ্যমে উত্তরদাত্রী নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহের সময়ে কমসংখ্যক নমুনা সংক্রান্ত সাধারণীকরণ সমস্যার উত্তরণপূর্বক ফলাফলকে প্রতিনিধিত্বশীল এবং প্রোষিতভর্তৃকার ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে অধিকতর পর্যবেক্ষণের জন্য ৫ জন প্রোষিতভর্তৃকার কেস

স্টাডি করা হয়েছে, যার মধ্য থেকে ৩ জনের কেস প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে । গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেও সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বর্ণিত কেসগুলি নির্বাচন করা হয় এবং কেস স্টাডি করার সময়ে পূর্বে প্রস্তুতকৃত গাইড প্রশ্নপত্র অনুসরণ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে 'কাঠামোগত প্রশ্নমালা' (Structured Questionnaire) ও 'আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার পদ্ধতি' (Formal Interview Method) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের গভীরতা অনুসন্ধান এবং দৃশ্যমানতা এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হওয়ায় সীমিত পরিসরে 'কেসস্টাডি' ও 'পর্যবেক্ষণ' পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়েছে। আর গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো গঠন ও প্রাসঙ্গিক ধারণার বিকাশে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, পত্রপত্রিকা, জার্নাল, ইন্টারনেট প্রভৃতি থেকেও সহায়ক তথ্য (Secondary information) সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩. প্রবাসী কর্মজীবীদের পরিচয় ও জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের অবদান

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম শ্রম-উদ্বৃত্ত দেশ। বিশ্ব শ্রমবাজারে এর অবস্থান সরসরাহের দিকে। বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ জনশক্তি বেকার ও চার পঞ্চমাংশ জনগণ চরম দারিদ্র্যের নীচে বসবাস করে এবং এখানে মানুষ ও ভূমির অনুপাত ১ : ১৮।[৭] এসব কারণে বাংলাদেশের জনগণের বিদেশ গমনের প্রবণতা অত্যধিক। প্রতিবছর গড়ে ২,২৫,০০০ বাংলাদেশী শ্রমিক জীবিকার সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমায়। ২০০৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ২,৪৮,৭০৫ জন।[৮] ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৩৭ লাখেরও বেশি জনশক্তি বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে মর্মে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত হলো প্রবাসী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থ (remittance)। ১৯৭৭-৭৮ অর্থ বছর হতে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ের গড়পড়তা শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ এসেছে এই খাত থেকে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের শতকরা ২২ ভাগ আমদানি ব্যয় উক্ত খাতের অর্থ হতে পরিশোধ করা হয়েছে। সর্বোপরি, বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি এই খাত থেকে আসে। দেশের মোট শ্রম শক্তির শতকরা ৫ ভাগ বিদেশে কর্মরত। তবে বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির মাত্র ১ শতাংশ মহিলা বিদেশে কর্মরত।[৯] সামপ্রতিক প্রকাশিত এক নিবন্ধে দেখা যায় অতীতের সকল রের্কড ভঙ্গ করে বিদেশে কর্মরত ৩৫ লাখ প্রবাসী ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ৪৮০ কোটি ৫৫ লাখ ডলারের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠিয়েছে । অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলসহ অন্যান্য উপায়ে প্রেরিত অর্থ ধরলে এই পরিমাণ ৭০০ কোটি ডলার অতিক্রম করবে বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক হিসাবে দেখা যায়। এই হার গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২২শতাংশ বেশি। এটা এখন গার্মেন্টস শিল্পের আমদানি অংশ বাদ দিলে দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। বাংলাদেশ ব্যংকের অন্য এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, রেমিট্যান্স প্রবাহের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলশ্রুতিতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি এই প্রথমবারের মতো (জুলাই, ২০০৬) আমদানি বিলের ৩৪ কোটি ডলারের দেনা পরিশোধের পরও উক্ত রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩১৮ কোটি ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত হিসেব মতে এই বছরের শেষ নাগাদ রিজার্ভের এই

---

[৭] M. Aimullah Miyan, " Dynamics of Labour Migration: Bangladesh Context", Conference Paper, IUBAT, Dhaka, December 2003. Http.www.kli.re.kr/iira 2004/pro/papers/MAlimullah Myan.pdf.accessed, May 2005.

[৮] BMET (Bureau of Manpower, Employment and Training), Flow of Migration by Country of Employment Report, Dhaka, 2004, p.3.

[৯] *Ibid.*

পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।[১০] এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী রেমিট্যান্সের এই প্রবাহ অব্যাহত থাকলে চলতি অর্থ বছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ অর্জন সম্ভব হবে।[১১] বাংলাদেশের শ্রমিকদের বেশির ভাগই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, আবুধাবি, কুয়েত, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশে চাকুরিতে নিয়োজিত। বাংলাদেশের বিদেশ-গমন-প্রবণ জেলাগুলো হলো কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা, বরিশাল, বাগেরহাট প্রভৃতি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা জাতীয় অগ্রগতিতে প্রবাসী কর্মজীবীদের ভূমিকা অপরিসীম।[১২]

৪. নারীর ক্ষমতায়ন : প্রত্যয় ও প্রকৃতি

'ক্ষমতায়ন' বিশেষত 'নারীর ক্ষমতায়ন' প্রত্যয়টি বর্তমান বিশ্বের উন্নয়ন ডিসকোর্সে বহুল আলোচিত বিষয়।[১৩] ক্ষমতায়নের ধারণাটি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের সময় থেকে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, যা ১৯৭৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি সর্বপ্রথম পাওলো ফ্রেইরি নামক এক ব্রাজিলীয় শিক্ষাবিদ নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে ব্যবহার করেন।[১৪] ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করে। অর্থাৎ ব্যক্তি নিজেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। সহজভাবে বলা যায়, বস্তুগত, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ওপর নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতাকে ক্ষমতায়ন বলে। আর এ ধরনের সম্পদকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।[১৫] এগুলো হলো—(ক) ভৌত (খ) মানবিক (গ) অর্থনৈতেক ও (ঘ) বুদ্ধিবৃত্তিক। ভৌত সম্পদের মধ্যে রয়েছে যেমন—জমি, পানি, বন; মানবিক সম্পদের মধ্যে—মানুষ, তার শারীরিক সক্ষমতা, শ্রম, দক্ষতা; অর্থনৈতিক সম্পদের মধ্যে অর্থ ও অর্থে অভিগম্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের মধ্যে আছে জ্ঞান, তথ্য ও ধারণা।

এ সকল সম্পদের একটি বা অনেকগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি বা সামাজিক ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।[১৬] সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের বিদ্যমান ধারা বজায় রাখা এবং সকলের কাছে তা যথাযথ বলে গ্রহণীয় করার জন্য এটি প্রয়োজন হয়। মতাদর্শ বা বিশ্বাস ব্যবস্থা (Value System) যা কাঠামোকে সকলের কাছে গ্রহণীয় করে তোলে, তা সৃষ্টির মাধ্যমেই প্রদত্ত ক্ষমতা কাঠামো স্থায়ী হতে পারে। আরো বলা যায়, ক্ষমতা কাঠামোর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে ক্ষমতাহীনসহ এর সকল অংশে তা গ্রহণ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে। প্রাথমিকভাবে এটি সংঘর্ষমূলক উপায়ে হয়তো অর্জিত হয়। কিন্তু যখনই আধিপত্যশীল গোষ্ঠী জয়ী হয়, তখন অসমতার জন্য একটি দার্শনিক যুক্তি তারা উত্থাপন করে এবং সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর মাধ্যমে তা জোরদার করা হয়। মতাদর্শ ছাড়াও রাষ্ট্র তার প্রশাসন, আইন এবং সেনাবাহিনী ইত্যাদির দ্বারা সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী ও অব্যাহত রাখে।[১৭] বিশ্ব ব্যাংকের (২০০২)

---

[১০] *দৈনিক যায়যায় দিন*, ৩০ জুলাই ২০০৬।

[১১] *The Daily Star*, 22 July 2006.

[১২] Tasneem Siddiqui, *Transcending Boundaries, Labour Migration of Women from* Bangladesh (Dhaka : UPL, 2001), p. 5.

[১৩] অবন্তী হারুন ও নাহার, *গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়ন*, পৃ. ৬৯।

[১৪] ফারাহ্ দীবা চৌধুরী, "বিশ্ব নারী সম্মেলন বাংলাদেশের নারী" *বাংলাদেশের নারী : বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, আল মাসুদ হাসানউজ্জামান (সম্পা.) (ঢাকা : ইউপিএল, ২০০২), পৃ. ২৬১।

[১৫] শামীমা পারভীন, "নারীর ক্ষমতায়ন", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ৪র্থ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৭।

[১৬] *তদেব*, পৃ. ৩৯।

[১৭] তদেব, পৃ. ৪২।

প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে, "ক্ষমতায়ন হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনের গুণগত পরিবর্তনে তাদের সম্পদ ও সামর্থ্যের বিস্তার ঘটানো, যা তাদের অংশগ্রহণ, সমঝোতা, প্রভাবিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন এবং তাদের প্রতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।"[১৮]

বিশ্ব ব্যাংক ক্ষমতায়ন ধারণা বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নে সমাজের বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান ও তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং এর ফলে তাদের উন্নয়ন তরান্বিতকরণে একটি কাঠামো নির্দেশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় নীতির সংস্কার যা নারীদের উন্নয়নে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, সুশাসন, বাজার ব্যবস্থায় তাদের অধিকতর অভিগম্যতা, সুশীল সমাজ ও নারী সংগঠনগুলোকে শক্তিশালীকরণসহ তাদের সম্পদ বৃদ্ধি ও নির্বাচনের স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর এক্ষেত্রে কোনো দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর তার রাষ্ট্রীয় নীতির সংস্কার বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাছাড়া ব্যাপ্ত পরিসরে নারীদের ক্ষমতায়নে প্রণোদনা জোগায় এরূপ একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকাটাও জরুরি। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব ব্যাংক নির্দেশিত ক্ষমতায়ন কাঠামো নিম্নরূপ[১৯]

চিত্র ১

ক্ষমতায়ন কাঠামো : নারী উন্নয়ন প্রেক্ষিত

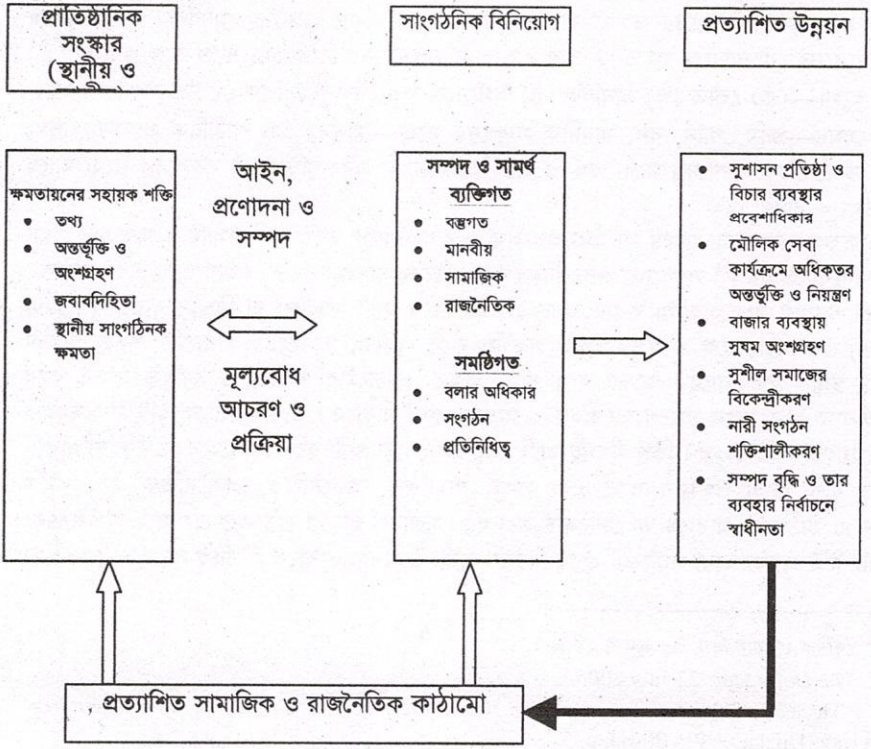

উৎস : Empowerment and Poverty Reduction, World Bank, 2002, p. 23.

[১৮] World Bank, *Empowerment and Poverty Reduction* (Washington DC: World Bankm 2002), p. 14.

[১৯] World Bank, *Empowerment and Poverty Reduction,* p. 23.

অন্যদিকে, মার্চিনেট (১৯৯০) নারীর ক্ষমতায়নের চারটি মাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন।[২০] ঐ চারটি মাত্রা হলো : (ক) সম্পদ; (খ) শক্তি; (গ) সম্পর্ক; এবং (ঘ) উপলব্ধি। এ চারটি মাত্রা ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, ক্ষমতা প্রক্রিয়ায় নারীর সম্পদের ওপর অধিকার, নিয়ন্ত্রণ এবং অর্জনের ক্ষমতা যে কোনো অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন বা সম্পর্কের ধরন পরিবর্তন করার ক্ষমতা এবং সর্বশেষ নারীর নিজের অবস্থান ও উত্তরণ সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধি এবং সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তির মনোভাব অন্তর্ভুক্ত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য ও অসমতার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর ক্ষমতা অর্জন এবং জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, নারীর ক্ষমতায়ন বলতে এককভাবে কোনো বিশেষ নারীর ক্ষমতায়নকে না বুঝিয়ে বরং সমষ্টিগতভাবে নারী সমাজের ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে নারীসমাজ ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে এবং এই বোধোদয়ই নারী ও পুরুষের ক্ষমতায়ন সম্পর্কে পরিবর্তন আনার কৌশল হিসেবে কাজ করবে। ক্ষমতায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ প্রাধান্য পায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নারী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে সুযোগ ও প্রবেশগম্যতার (accessibility) বৈধতা অর্জন করে। উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যাপকভাবে পরস্পর সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যথাযথ শিক্ষা ও দক্ষতা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ উন্মোচিত করে আবার এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারও উন্মুক্ত হয়। শিক্ষাকে ক্ষমতায়নের একটি প্রধান পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা। এটি নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নেও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।[২১] এ প্রসঙ্গে মোজার বলেন,

> ক্ষমতায়ন দৃষ্টিভঙ্গি মূলত নারীর ক্ষমতার গুরুত্বের কথা বলে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের মধ্যে ক্ষমতাকে না দেখে বরং নারীদের নিজেদের আত্মনির্ভরতা ও অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটাবার ওপরই সর্বাধিক জোর দেয়। বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতার মধ্যে দিয়ে নিজের জীবনের পছন্দগুলো নির্ধারণ করা এবং পরিবর্তনের গতিপথকে প্রভাবিত করাই হলো ক্ষমতায়ন। আর এভাবে তা একই ও বিভিন্ন সমাজে ক্ষমতার পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে নারীকে ক্ষমতায়িত করতে চায়।[২২]

৫. প্রোষিতভর্তৃকার ক্ষমতায়ন : বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের এক নতুন দিক

বাংলা ব্যাকরণের এক কথায় প্রকাশ সংক্রান্ত আলোচনায় **'প্রোষিতভর্তৃকা'** বা যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে ধারণাটি আমাদের কল্পনায় এক বিরহী নারীর করুণ চিত্র রূপে ভেসে উঠলেও বাংলাদেশের নারীর উন্নয়ন ডিসকোর্সে এটি একটি নতুন প্রপঞ্চ। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় এটি আপাত বিষম বা অসঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে মনে হলেও আন্তর্জাতিক শ্রমিক অভিবাসন ও অভিবাসী শ্রমিকদের রেখে যাওয়া পরিবারে

---

[২০] তোফায়েল আহমেদ, *দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়ন* (ঢাকা : ব্রাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ২০০০), পৃ. ৩৯।

[২১] B. Hartmann and J.A. Boyce, *View from a Bangladeshi Village* (London: Zed Press, 1983), p. 19.

[২২] Caroline Moser, "Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Gender Needs", *World Development*, 17: 11, 1989, p. 74.

প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের মধ্যে একটি ইতিবাচক সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় সমাজগবেষক ও নারী উন্নয়নকর্মীদের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যদিও বিদেশে চাকুরি বা অর্থোপার্জনের ফলে তাদের প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের নানা দিক নিয়ে গবেষণা অপ্রতুল কিন্তু ভারতের কেরালা রাজ্যের প্রোষিতভর্তৃকাদের পারিবারিক জীবন ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে কেসি জাকারিয়া এবং এস আই রাজন একটি গবেষণাকর্মে এদেরকে 'উপসাগরীয় বধূ' (Gulf-Wives) নামকরণ করেছেন। প্রায়োগিক অর্থে উক্ত প্রোষিতভর্তৃকা ও গবেষণার 'উপসাগরীয় বধূ' অভিন্ন অর্থ বহন করে।[২৩]

নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী বস্তুগত ও মানবিক সম্পদের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং এটি পিতৃতন্ত্র ও সকল প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সকল কাঠামোয় নারীর বিরুদ্ধে জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে।[২৪] সমাজবিজ্ঞনী মেয়ক্স (Mayoux) (২০০০) নারীর ক্ষমতায়নে নারীর উৎপাদনশীল, পুনরুৎপাদনশীল ও সামষ্টিক বা সামাজিক ভূমিকার পরিপূর্ণ বিকাশ ও কার্যক্ষমকরণের ওপর জোর দিয়েছেন এবং তিনি নারীর ক্ষমতায়নের একটি সমন্বিত মডেল বা কাঠামো দাঁড় করেছেন।

প্রথমত: **অভিক্ষমতা** (Power to) ক্ষমতায়নের এই মডেলে মূলত মহিলাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ ও অত্যাবশ্যকীয় সম্পদে অভিগম্যতার মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম করে তোলা হয়। এই মডেল বিকাশে লিউক্স, গ্রামসি ও ওয়েবারের দর্শন ও আলোচনা প্রভূত অবদান রেখেছে।[২৫]

দ্বিতীয়: **অধিক্ষমতা** (Power over) এই ধরনের ক্ষমতার বিন্যাসের ধারণায় প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার চর্চার ওপরে অধিক আলোকপাত করা হয়। সমাজে ক্ষমতা ও সম্পদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য যা নারীদের প্রত্যাশা পূরণের পথে প্রধান অন্তরায় তার পরিবর্তন ও সেগুলো অর্জনে যোগ্য করে তোলাই এই প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

তৃতীয়ত: **অন্তঃক্ষমতা** (Power within) সংশ্লিষ্ট ধারণায় ক্ষমতার পূর্ববর্তী উভয় বিন্যাসকে নির্দেশ করে এর বাইরে একটি ভিন্নমাত্রা নির্দেশ করে। এই প্রক্রিয়ায় নারীদের নিজস্ব প্রত্যাশা ও বিদ্যমান অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার পরিবর্তন কৌশল প্রকাশের যোগ্যতা ও পদক্ষেপকে সক্রিয় করে থাকে।

চতুর্থত: **সহক্ষমতা** (Power with) এই ধারণা সাম্প্রতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত আলোচনায় উঠে এসেছে যেখানে ক্ষমতা উৎসারিত হয় ব্যক্তি নয়, বরং সামষ্টিক সামর্থের উৎস থেকে। মূলত সংহতি ও মৈত্রীর সমন্বিত সামর্থ্যই ক্ষমতায়ন যা দ্বারা কেনো বৃহৎ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়ায় নারীদের সামষ্টিক স্বার্থকে পরীক্ষা ও তার প্রকাশ, এগুলোর বিন্যাস ও অর্জন এবং বিদ্যমান অবস্থা পরিবর্তনে নারী ও পুরুষের সংগঠনের প্রেক্ষাপটে এগুলোকে বিবেচনা করাকে বোঝায়।

নারীর ক্ষমতায়নের উপর্যুক্ত প্রক্রিয়া ও মডেলের আলোকে বাংলাদেশ থেকে আগত প্রবাসী কর্মজীবীদের সন্তোষজনক উপার্জন, তাদের প্রেরিত অর্থ, পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং বাস্তব পরিস্থিতি ও সচেতনায়নের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মজীবীদের পরিবারিক জীবনের উন্নয়ন তথা

---

[২৩] K.C. Zachariah and S.I. Rajan, "Gender Dimensions of Migration in Kerala: Macro and Micro Evidence", *Asia-Pacific Population Journal,* Vol. 16, No. 3 (September 2001), p. 68.

[২৪] L. Mayoux, "Development Policy and Practice", *Journal of Social Studies,* Vol. 82, No. 1 (1998), pp. 18-68.

[২৫] S. Lukes, *Power: A Radical View* (London: Macmillan, 1974), p. 33.

প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্ণিত গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের একটি পর্যায়ক্রমিক চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো।[২৬]

চিত্র ২ : প্রোষিতভর্তৃকার ক্ষমতায়ন

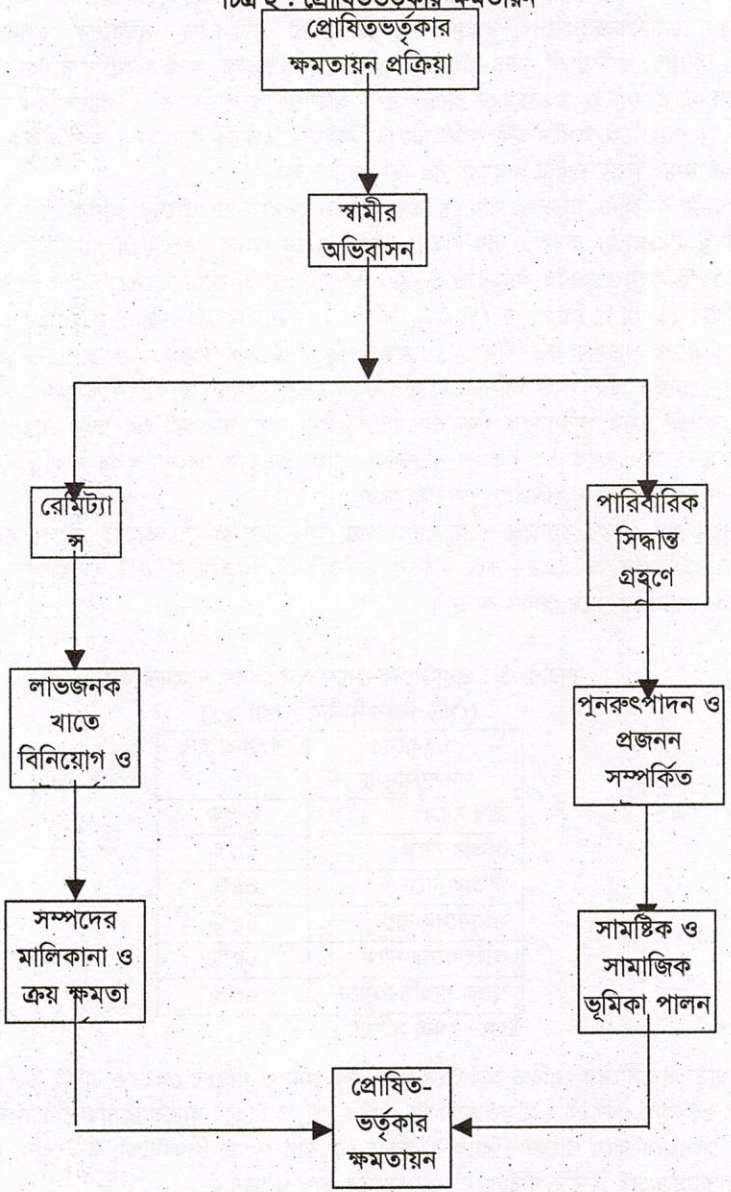

সূত্র : Gender Deniessions of Migration in Kerala : Macro and Micro Evidence, *Asia Pacific population journal,* Vol. 16, No. 3, 2001, p. 59 (modified)

---

[২৬] K.C. Zachariah and S.I. Rajan, *Gender Dimensions of Migration.*

৬.১ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন : পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া আলোচনা করলে দেখা যায় যে, নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান উপায় হলো তার অর্থনৈতিক বা উৎপাদনশীল (Productive role) ভূমিকার স্বীকৃতি, গতিশীলতা এবং এর যথার্থ মূল্যায়ন। প্রোষিতভর্তৃকাদের বস্তুগত ও জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ওপর অভিগম্যতা (accessibility) ও নিয়ন্ত্রণ, আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, অর্জিত অর্থের ব্যবহার, সম্পদ সৃষ্টি, সম্পদের মালিকানা ও ক্রয়ক্ষমতা অর্জন এবং অর্থসংক্রান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের নিয়ামক হিসাবে ধরা হয়। অর্থনৈতিক পরিবর্তন বা সাফল্যের মধ্য দিয়েই নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি রচিত হয়।[২৭]

প্রবাসী কর্মজীবী সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলিতে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই অর্থাৎ শতকরা ৬০ ভাগই মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত যার শীর্ষে রয়েছে সৌদি আরব (৩০%)। বাকিদের মধ্যে অন্যতম কুয়েত ১৫% সংযুক্ত আরব আমিরাত ১০%। তাছাড়া প্রবাসী কর্মজীবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মালয়েশিয়া (১০%), সিংগাপুর (১৫%), দক্ষিণ কোরিয়া (৫%), জার্মানি (৫%) ও আমেরিকায় কর্মরত। এদের শতকরা ৫০ ভাগ ৫-১০ বছর, ৩৫ ভাগ ১-৫ বছর ও ১৫ ভাগ ১০-১৫ বছর পর্যন্ত বিদেশে রয়েছে। এরা গড়ে মাসিক ২১,০০০/- (একুশ হাজার) টাকা দেশে প্রেরণ করে থাকেন। প্রবাসী কর্মজীবীদের পরিবারিক গঠন বিশ্লেষণে দেখা যায়, শতকরা ৬৫ ভাগ পরিবারের কর্ত্রী বা প্রধান তাদের স্ত্রীরা বাকি ৩৫ শতাংশ পরিবারে প্রোষিতভর্তৃকারা তাদের শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে যৌথ পরিবারে বসবাস করেন।

দেশে অর্থ প্রেরণ সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায়, অধিকাংশ প্রবাসী তাদের স্ত্রীদের নামে (শতকরা ৬৫ ভাগ) উপার্জিত অর্থ প্রেরণ করে থাকেন। বাকি ২০% পিতামাতা, ৫% ভাইবোন, ৫% সন্তান ও ৫% শ্বশুর-শাশুড়ির নামে প্রেরণ করেন।

সারণি ১ : প্রবাসীদের দেশে অর্থ প্রেরণ সংক্রান্ত তথ্য
(মোট উত্তর দাত্রীর সংখ্যা ২০)

পরিবারের সদস্য/সদস্যা	শতকরা হার
স্ত্রীর নামে	৬৫%
পিতার নামে	২০%
মাতার নামে	০৫%
সন্তানদের নামে	০৫%
ভাইবোনের নামে	০৫%
শ্বশুর-শাশুড়ির নামে	০৫%

উৎস : ক্ষেত্র সমীক্ষা।

এছাড়া প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ উত্তোলনে, লেনদেন ও খরচের ক্ষেত্রেও একই চিত্র পাওয়া যায়। শতকার ৬৫ ভাগ ক্ষেত্রেই প্রোষিতভর্তৃকারা স্বামীর প্রেরিত টাকার ব্যাংক হিসাব পরিচালনাসহ খরচ ও অন্যান্য লেনদেন করে থাকেন। বাকি শতকরা ৩৫ ভাগ ক্ষেত্রে পিতামাতা, ভাইবোন, সন্তান-সন্ততি ও শ্বশুর-শাশুড়ি এই হিসাব পরিচালনা ও লেনদেন করে থাকেন।

---

[২৭] H. Todd, *Women at the Centre: Grameen Bank Borrowers after One Decade* (Dhaka: UPL, 1996), p. 26.

সারণি ২ : প্রবাসী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের বিনিয়োগ

(উত্তরদাত্রীগণ একাধিক ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ করেছেন ফলে শতকরা হার ১০০ এর অধিক হয়েছে

মোট গণসংখ্যা = ২০)

খাত	শতকরা হার (%)
ব্যবসায়-বাণিজ্য	৪৫%
সঞ্চয়পত্র ক্রয়	১০%
ঋণ পরিশোধ	২৫%
সামাজিক অনুষ্ঠান ও যৌতুক প্রদান	০৫%
জমি ক্রয়	৪০%
বড়ি নির্মাণ ও মেরামত	৫০%
স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার ক্রয়	৪০%

উৎস: ক্ষেত্র সমীক্ষা।

অন্যদিকে প্রবাসী কর্মজীবীদের প্রেরিত আয়ের বিনিয়োগ খরচ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের ৫০ শতাংশই প্রোষিতভর্তৃকা/পরিবারের সদস্যগণ বাড়ি নির্মাণ ও মেরামত, ৪৫ শতাংশ ব্যবসায় বাণিজ্যে, ৪০% শতাংশ জমি ক্রয়ে, ৪০ শতাংশ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার ক্রয়, ২৫ শতাংশ সামাজিক অনুষ্ঠানাদির জন্য খরচ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রেষিতভর্তৃকারা তাদের প্রবাসী স্বামীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করে তাদের পারিবারিক সচ্ছলতা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো প্রোষিতভর্তৃকাদের শতকরা ১০০ ভাগই বলেছেন তাদের স্বামী বিদেশে অবস্থান ও অর্থ প্রেরণের ফলে তাদের পারিবারিক সচ্ছলতা বেড়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রোষিতভর্তৃকারা বস্তুগত সম্পদ অর্জন, নিয়ন্ত্রণ, পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের স্বামীদের প্রেরিত অর্থ বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সমাজবাস্তবতা ও সচেতনতা তাদেরকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হতে যথেষ্ট সাহায্য করছে।

৬.২ স্বাস্থ্য ও পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা

প্রখ্যাত নারীবাদী অর্থনীতিবিদ ইস্টার বোসেরাপ (Ester Boserup) তাঁর সাড়া-জাগানো গ্রন্থ 'অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা'তে সর্বপ্রথম **'লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন'** ও বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেন এবং সমাজের আধুনিকায়নের সঙ্গে প্রচলিত উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণ করেন।[২৮] তিনি পুরুষ ও নারীর কাজের ওপর এ সকল পরিবর্তনের চিহ্নিত ফলাফলগুলো পরীক্ষা করে তথ্যসহ প্রমাণ করেন যে, লৈঙ্গিক বৈষম্য ও ভূমিকা বণ্টনের (role fixation) কারণে উন্নয়নের সুফল পুরুষের তুলনায় নারীর কাছে পৌঁছেছে অনেক কম। নারীদের মধ্যে অপুষ্টির হার বেশি। সমাজের পুরুষকেন্দ্রিকতা ও সামাজিক রীতি-নীতি মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনায় বৈষম্যমূলক অংশগ্রহণ ও অপুষ্টির ক্ষেত্রে অনেকাংশেই দায়ী। নারীরা কেবল তাদের পুনরুৎপাদন ও প্রজননমূলক ভূমিকায় আবদ্ধ এই প্রচলিত ধারণার বদলে নারীদের উৎপাদনশীলতার ওপর তিনি

---

[২৮] Ester Boserup, *Womens' Role in Economic Development* (New York: St. Martin's 1970), p. 134.

দৃষ্টিপাত করেন এবং উৎপাদন ও সামাজিক ভূমিকা পালনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ওপর জোর দেন।[২৯]

আলোচ্য গবেষণায় প্রোষিতভর্তৃকাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকার প্রতি মনোভাব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা একদিকে যেমন বেড়েছে অন্যদিকে সন্তান ধারণ ও প্রতিপালন সনাতনী এই ভূমিকাতেই শুধুমাত্র তারা বৃত্তাবদ্ধ নয়। প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা ও অংশগ্রহণকে আরো গতিশীল ও বৃদ্ধি করে তারা তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন তথা ক্ষমতায়নের বলয় আরো প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

৬.৩ প্রোষিতভর্তৃকাদের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য

প্রোষিতভর্তৃকাদের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, শতকরা ৯৫ ভাগ দম্পতি পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সচেতন। অন্যদিকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট পরিবারে পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর অনুপাত ৫৫ : ৪৫।

উক্ত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে পুরুষের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে এবং নারীদের পুনরুৎপাদন মূলক ভূমিকার পাশাপাশি সামাজিক ভূমিকাকে ফলপ্রসূ করতে তারা সহযোগিতা করছে। এটি নিঃসন্দেহে প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত সচেতনতার ক্ষেত্রে ৮৫% ক্ষেত্রেই মহিলারা এ সম্পর্কে সচেতন বলে জানান। বাকি ১৫% মাহিলারাদের বেশিরভাগই স্বল্পশিক্ষিত ও গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের উপকণ্ঠে (Sub-urban) বসসাসরত। ফলে তারা এ সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না বলে মনে হয়।

চিত্র ৩ : পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে অংশগ্রহণ

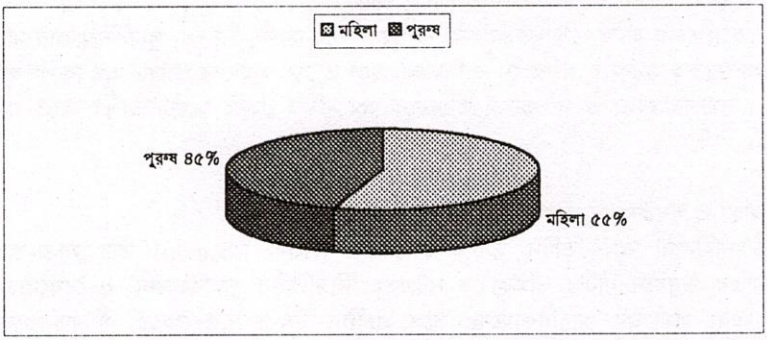

প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো পরিবারে খাদ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানে ছেলে মেয়ের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েতে কোনো বৈষম্য করেন না। বাকি ২০ ভাগ সনাতনী ধ্যান-ধারণা পোষণ, ছেলে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, অশিক্ষা ইত্যাদি কারণ দায়ী বলে প্রাপ্ত তথ্যে বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়। তবে সামগ্রিকভাবে প্রোষিতভর্তৃকাদের স্বাস্থ্য ও প্রজনন ভূমিকার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়েছে মর্মে দেখা যায় যা তাদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম সহায়ক শক্তি।

---

[২৯] *Ibid.*, p. 135.

৬. সামাজিক ক্ষমতায়ন : দৃশ্যমানতা, সামাজিক গতিশীলতা ও সাংগঠনিক সম্পৃক্তি

নারীর ক্ষমতায়নেরর সম্পর্কগত বা সামাজিক গতিপথ পর্বে মূলত বৃহত্তর সামাজিক জীবনে মহিলাদের অগ্রসরমাণ ভূমিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ক্ষমতায়নের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়ার সাথে সাথে তাদের সামাজিক পশ্চাৎপদতা কেটে যায় এবং বহির্জগতের সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচিত, সামাজিক গতিশীলতা, দৃশ্যমানতা, সাংগঠনিক সম্পৃক্তি (সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক) বৃদ্ধি পায়। অমর্ত্য সেনের ভাষায়, "নারীর সুখ-সচ্ছলতা দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে বোঝা যাবে যদি তার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যা তিনি হতে চান তা তিনি হতে বা করতে পারেন (যেমন-লেখাপড়ার পর্যায় বৃদ্ধি, অধিক হারে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার, কোনোরূপ জড়তা ছাড়া সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ইত্যাদি সেই সুযোগসমূহ তার কাছে খোলা থাকে)।"[৩০]

সামাজিক ক্ষমতায়নের আরেকটি আবশ্যিক উপাদান হলো সংগঠন। নারীরা সংগঠিত ভাবে যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অচলায়তনকে অতিক্রম করে থাকে। আর এই প্রক্রিয়াতেই একজন নারীর নিজস্ব পরিচিতি তৈরি হয় গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে, দলের মধ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অপরাপর সদস্যদের সঙ্গে দলবদ্ধ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে, যা তার ক্ষমতায়নের একটি চূড়ান্তরূপ।[৩১]

আলোচ্য গবেষণায় প্রোষিতভর্তৃকাদের সামাজিক ক্ষমতায়নের উপাদান, প্রক্রিয়া প্রভৃতি এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রোষিতভর্তৃকার প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ তাদের ক্ষমতায়নের প্রধান নিয়ামক। পরিবারই এই ক্ষমতায়নের সূতিকাগার, যা ধীরে ধীরে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বলয়ে প্রসারিত হয়। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রোষিতভর্তৃকাদের ভূমিকা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট পরিবার সমূহের শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে (প্রোষিতভর্তৃকার মতামত নিয়ে) সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাকি ৪০ শতাংশ পরিবারের ক্ষেত্রে তিনি একাই অর্থাৎ প্রোষিতভর্তৃকা এককভাবে সিদ্ধান্ত নেন ও ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে শ্বশুর বা শাশুড়িই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

চিত্র ৪ : পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রোষিতভর্তৃকার ভূমিকা

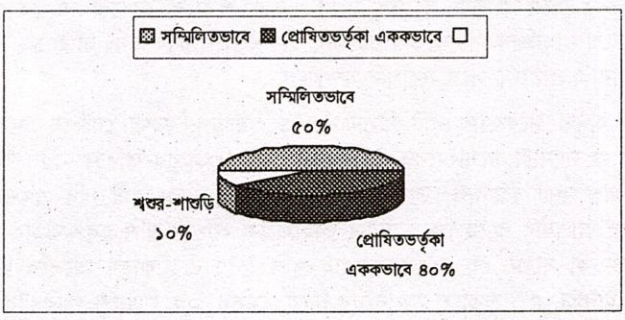

উৎস: ক্ষেত্র সমীক্ষা

উল্লিখিত তথ্য থেকে বোঝা যায়, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রোষিতভর্তৃকাদের ভূমিকা (৫০%+৪০%) শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে কার্যকর, যা তাদের ক্ষমতায়নের অন্যতম নির্দেশক।

---

[৩০] Amartya Sen, *Cultural Liberty*, p. 27.

[৩১] অবন্তী হারুন ও নাহার, *গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়ন*, পৃ. ৮৫।

প্রবাসী স্বামীদের সঙ্গে যোগাযোগ, বিভিন্ন মিডিয়া ও প্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ৯৫% ক্ষেত্রে তারা চিঠিপত্র ও মোবাইল, ৩৫% ক্ষেত্রে টেলিফোন, ১০% ক্ষেত্রে ই-মেইল ও ফ্যাক্সে তাদের স্বামীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিজেরা স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যোগাযোগ ও প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রোষিতভর্তৃকাদের অন্যান্য নারীদের তুলনায় সামাজিকভাবে অনেক বেশি অগ্রসরমাণ।

পূর্বেই বলা হয়েছে, দৃশ্যমানতা (visibility) ও সামাজিক গতিশীলতা (social mobility) নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম সূচক। কাজের প্রয়োজনে প্রোষিতভর্তৃকাদের বাইরে যাতায়াত ও যোগাযোগের পরিমাণ অনেক বেশি। এ সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, তাদের ৯৫ শতাংশই মনে করেন স্বামী বিদেশে থাকায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে তাদের বাইরে যাতায়াতের পরিমাণ বেড়েছে। এদের ৮০ শতাংশ বলেছেন যে, তারা নিজেরা বাজার করেন, ৬০ শতাংশ সন্তানদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যান, ৫৫ শতাংশকে লেনদেনের জন্য ব্যাংকে যেতে হয় এবং ১০ শতাংশ সামাজিক অন্যান্য কারণে বাইরে যান বলে জানান। ফলে দেখা যাচ্ছে, সামাজিক ভূমিকা পালনে প্রোষিতভর্তৃকারা অনেক বেশি দৃশ্যমান ও সক্রিয়, যা তাদেরকে আত্মসচেতন, স্বাতন্ত্র্যবোধ, অভিযোজন এবং আত্ম-উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে নিজস্ব ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছে।[৩২]

ক্ষমতায়নের সাংগঠনিক উপাদান ও তাতে প্রোষিতভর্তৃকাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায়, তাদের শতকরা ৬০ ভাগ কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নন এবং বাকি ৪০% কোনো না কোনো সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের বিভিন্ন সূচকের তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায়, তাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের হার অপেক্ষাকৃত কম। এর কারণ হিসেবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের স্বল্পতা, বাড়তি পরিবারিক দায়িত্বপালন হেতু সময়ের অভাব। তবে তাদের ক্ষমতায়নে সংগঠনের ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে সবাই একমত এবং সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে।

যারা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত তাদের মধ্যে ৬২.৫ শতাংশ কোনো না কোনো রাজনৈতিক সংগঠন, ৩৮ শতাংশ সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, ২৫ শতাংশ ক্লাব এবং বাকি ১২ শতাংশ এনজিও সমিতি এবং অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত।

এই প্রসঙ্গে বর্ণিত গবেষণায় দুটি চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে এসেছে, যা নারীর চিরায়ত গৃহশান্তি ও সংসারী মনোভাবের ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকারের পরিচয় বহন করে। এ বিষয়ে তাদের যে দুটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার একটি হলো, "আপনার স্বামী যদি এখনই প্রবাস থেকে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসে তাহলে কি আপনি খুশি হন? অবাক করে দিয়ে ৬৭ শতাংশ প্রোষিতভর্তৃকা বলেন যে, তারা অবশ্যই খুশি হন। এর কারণ হিসেবে ৮৩.৩৩ শতাংশ তাদের নিরাপত্তা হীনতা, ৫০ শতাংশ সন্তানদের নিয়ে সমস্যা, ২৫ শতাংশ পারিবারিক অশান্তি এবং ৮.৩৩ শতাংশ অন্যান্য কারণে তাদের প্রবাসী স্বামীদের দেশে আগমন কামনা করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রবাসী কর্মজীবীদের উপার্জন প্রোষিতভর্তৃকা ও সংশ্লিষ্ট পরিবারের সচ্ছলতা ও ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এর জন্য তাদেরকে যথেষ্ট মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্য দিতে হয়।

---

[৩২] নাজমা সিদ্দিকী, *বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারী*, পৃ. ১০১।

তাদের নিকট আরেকটি প্রশ্ন ছিল, "আপনার যদি একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকত তাহলে দেশে অথবা বিদেশে কর্মরত পাত্রদের মধ্যে কাকে পছন্দ করতেন? এক্ষেত্রেও তাদের ৯০ শতাংশই এক বাক্যে দেশে কর্মরত পাত্রদের সাথে কন্যার বিয়ের কথা বলেছেন। বাকি ১০ শতাংশের মতামত হলো যোগ্যতা ও কন্যার বিদেশে যাওয়ার সুযোগ থাকলে বিদেশে কর্মরত পাত্রের সঙ্গে তাদের কন্যাদের বিবাহ দিতে কোন আপত্তি নেই। যদিও মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশে এ সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, পরিবারের বস্তুগত উন্নতি ও প্রোষিতভর্তৃকা সামগ্রিকভাবে ক্ষমতা অর্জন করলেও একাকীত্ব, বিরহজনিত মর্মজ্বালা প্রভৃতি বিদেশে কর্মরত পাত্রদের প্রতি প্রোষিতভর্তৃকারা তথা প্রবাসী কর্মজীবীদের পরিবারের একটি অনীহা বা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে কেরালার প্রোষিতভর্তৃকাদের উদাহরণ তুলে ধরে কে.সি, জাকারিয়া ও এস. আই. রাজন (২০০১) যথার্থই যে, যে সব মহিলার বিরহজনিত মর্মজ্বালার অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা তাদের স্বামীদের জন্য বিদেশের তুলনায় দেশের চাকুরিকেই অধিকতর পছন্দ করে। তাদের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমির সকল বালু চকচক করলেও তা সোনা নয়। কারণ এক্ষেত্রে প্রবাসী কর্মজীবীর পাশাপাশি তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদেরকেও অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।[৩৩]রীতা আফসার ও অন্যান্য (২০০০) এজন্য বাংলাদেশের পারিবারিক প্রেক্ষাপটে স্বল্পমেয়াদি ও চুক্তিভিত্তিক আন্তর্জাতিক অভিবাসনকে' প্রয়োজনীয় অশুভ' (Necessary Evil) বলে অভিহিত করেছেন।[৩৪]

এ সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে উপরে বর্ণিত চিত্রে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ৯৫ শতাংশেরই পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা ও ক্ষমতা বেড়েছে। মাত্র ৫ শতাংশ বলেছে তাদের অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। অবৈধ আদম ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়ে অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষতি, ঋণ পরিশোধ ও স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ ইত্যাদি এক্ষেত্রে দায়ী বলে তারা জানান।

প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের পথে বিদ্যমান অন্তরায় এবং এগুলো নিরসন করে তাদের ক্ষমতায়নকে আরো কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সে বিষয়ক মতামত জরিপে দেখা যায়, ৫৫ শতাংশের মতামত হলো তাদের স্বামীদের প্রেরিত অর্থের নিরাপদ বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে, ৪০ শতাংশের অভিযোগ হলো মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশে টেলিফোন/মোবাইলে যোগাযোগের খরচ অত্যাধিক। এটি আমেরিকা বা ইউরোপে যোগাযোগের খরচের তুলনায় দ্বিগুণ। তারা যৌক্তিক খরচে প্রবাসী স্বামীদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ রাখেন। এছাড়া ৩৫ শতাংশ শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের বিশেষ সুবিধা, ২০ শতাংশ সরকারি প্লট বরাদ্দে তাদের অগ্রাধিকার, ৩৫ শতাংশ স্বামীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা, ২০ শতাংশ আয়কর রেয়াত এবং ১০ শতাংশ সহজ ও নিরাপদ মাধ্যমে দেশে টাকা প্রেরণের সুব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন। আর তাহলে তাদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও ক্ষমতায়নে নতুন মাত্রা যোগ হবে বলে তারা মতামত ব্যক্ত করেন।

৭. ক্ষমতায়নের বাস্তব চিত্র : কতিপয় কেস স্টাডি

আলোচ্য গবেষণায় প্রেষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের প্রকৃতি, প্রক্রিয়া, পর্যায় বা মাত্রা এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসুবিধা ও এগুলোর সমাধানের সুপরিশ ইত্যাদি বিষয় গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য ৩ জন প্রোষিতভর্তৃকার কেস স্টাডি করা হয়।

---

[৩৩] K.C. Zachariah and S.I. Rajan, *Gender Dimensions of Migration*, p. 69.

[৩৪] Rita Afsar, Mohammad Yunus and A B M Shamsul Alam, *Are Migrants chasing after the "Golden Deer"? A Study on Cost—Benefit Analysis of Overseas Migration by the Bangladeshi Labour*, (BIDS, 2000) p.91.

কেস স্টাডি ১ : শাহানা বেগম

শাহানা বেগমের বাড়ি রাজশাহী শহরের ধরমপুর এলাকায়। ছিপছিপে গড়নের ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের শাহানার বয়স ৩০ বছর। এস. এস. সি পাশ। স্বামী মিজানুর রহমান ৭ বৎসর যাবৎ সৌদি আরবে কর্মরত। এক পশলা বৃষ্টির পর পড়ন্ত বিকেলের স্নিগ্ধ আলোয় শাহনাদের বাড়ি যাই। তার দেবর মফিজুর রহমানের মাধ্যমে আগেই অ্যাপয়ন্টমেন্ট করা ছিল। এক চিলতে পোড়ো জমি পেরিয়েই শাহানাদের একতলা বাড়ি। কলিংবেল টিপতেই সালাম দিয়ে হাসিমুখে দরজা খুলে দিলেন তিনি। নিজের পরিচয় দেয়ার পর ড্রইংরুমে বসতে দিলেন। অত্যন্ত সাজানো গোঁছানো তার ড্রইংরুমটি।

প্রাথমিক আলাপের পর জানতে চাইলাম, "কেমন আছেন?" উত্তরে তিনি জানালেন যে খুবই ভালো আছেন তিনি। স্বামী বিদেশে থাকাতে নিয়মিত উপার্জনের ফলে সচ্ছলতার পরিবার। গড়পড়তা আনুমানিক মাসিক ২০,০০০/- টাকা পাঠান তার স্বামী এবং এই টাকা তার নিজের নামেই পাঠান। বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ি, দেবর মফিজ ও ছেলে আশিক ও কন্যা আনিকাকে নিয়ে তার সংসার। ৭ বছরের ছেলে আশিক স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে, কন্যা আনিকার বয়স ৩ বছর। স্বামীর প্রেরিত টাকা দিয়ে স্থানীয় বাজারে একটি হোটেল করেছেন তিনি যা দেবর মফিজ ও তিনি দেখাশুনা করেন। টিন ও কাঠের ঘরের বদলে ৫ কক্ষ বিশিষ্ট একতলা একটি বিল্ডিং দিয়েছেন তিনি। সামগ্রিকভাবে তার সংসার খুবই সচ্ছল। সংসারের কর্ত্রী তিনি। শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে অত্যন্ত স্নেহ ও দেবর মফিজ খুব শ্রদ্ধা করে। স্বামীর প্রেরিত টাকার উত্তোলন ও খরচ নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ি বা দেবরের সঙ্গে তার কখনই কোনো মনোমালিন্য হয়নি।

সাংগঠনিক বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান যে, তিনি বিএনপির স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ও একটি বেসরকারী স্কুলেরও সদস্যা তিনি। কাজের প্রয়োজনে বাইরে যাতায়াত ও প্রতিবেশীদের ভালো মন্দের খোঁজ-খবর নেওয়ায় অনেকেই নানা কাজে তাকে ডাকে এবং পরামর্শ নেয়। তিনি মনে করেন আগের তুলনায় পরিবারে ও সমাজে তার মর্যাদা ও ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। এখন তিনি আত্মনির্ভরশীল ও আত্মতৃপ্ত।

স্থানীয় মহিলাদের উন্নয়নে তার কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি জানান যে, তিনি একটি মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে তুলবেন যেখানে মহিলাদের একটি যৌথ তহবিলের মাধ্যমে ঋণদানসহ তাদেরকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দান ও সচেতন করে তুলবেন। স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, তিনি নিজেই স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন চিঠি পত্র, মোবাইল ও টেলিফোনের মাধ্যমে। তার স্বামী ৬ মাস অন্তর দেশে আসেন। তার মতে, স্বামী বিদেশে থাকাতে সমায়িক কিছু অসুবিধা হয় বটে; কিন্তু অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, সন্তানদের ভবিষ্যৎ ও স্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য তিনি এটা মেনে নিয়েছেন। তিনি প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়ন তথা প্রবাসী কর্মজীবীদের পরিবারের জন্য বিশেষ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বল্প খরচে স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ এবং সরকারি প্লট বরাদ্দে তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

কেস স্টাডি ২ : ফরিদা আকতার

ফরিদা আকতারের বয়স ২৫ বছর। স্বামী আলমগীর হোসেন। ৫ বছর যাবৎ সিংগাপুর প্রবাসী। ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। সেখানে স্বামী রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। ফরিদার ৪ বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। শ্বশুর শাশুড়ি ছাড়া সংসারে ১ ননদ ও দেবর রয়েছে। তারা যথাক্রমে কলেজে ও স্কুলে পড়ে।

স্বামী মাসিক আনুমানিক ১৫,০০০/- টাকা দেশে পাঠান। টাকা ফরিদার শ্বশুরের নামে পাঠালেও ফরিদা ও তার সন্তানদের যখন যা লাগে তা ইচ্ছেমত খরচ করতে পারেন। স্বামীর প্রেরিত টাকা দিয়ে ২ বিঘা জমি কেনা হয়েছে স্বামীর নামে। কিছু টাকার সঞ্চয়পত্র কেনা হয়েছে ফরিদার নামে। ফরিদা অবসর সময়ে বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ করেন। বুটিক ও হাতের কাজে তার বিশেষ দক্ষতা রয়েছে স্থানীয় ***'মিনু বুটিক'*** নামক দোকানের অর্ডারের কাজ করে মাসে আনুমানিক গড়ে ৩,০০০/- টাকা আয় তার। সার্বিকভাবে তাঁর আর্থিক কোন সমস্যা নেই মর্মে জানান তিনি। স্বামীর সঙ্গে তিনি ও পরিবারের অন্যান্যরাও যোগাযোগ করেন।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি জানান তারা অস্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং এটি স্বামীই ব্যবহার করে থাকেন। এইচআইভি/এইডস সম্পর্কেও তিনি সচেতন।

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার মহল্লায় কোনো মহিলা সংগঠন না থাকায় তিনি কোনো সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নন। তার স্বামীর উপার্জন ও বাস্তব পরিস্থিতিতে তার আত্মোপলব্ধি এবং আত্মনির্ভরশীলতা বেড়েছে। পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তার সঙ্গে আলাপ করা হয়। শ্বশুড় শাশুড়ি তাকে খুবই স্নেহ করেন। তার দেবর-ননদ, ভাবী-অন্ত-প্রাণ।

স্বামী বছরে ১ বার দেশে আসেন। একাকীত্ব, দুশ্চিন্তা ও নিরাপত্তাহীনাতা অনুভব করেন মাঝে মাঝে তিনি। নিজেকে অনেক কিছু সামলাতে হয়। তবে আস্তে আস্তে এসবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। প্রোষিতভর্তৃকাদের অধিক ক্ষমতায়নে স্বামীর প্রেরিত অর্থের নিরাপদ বিনিয়োগ ও তাদের অংশগ্রহণের জন্য সমাজে পর্যাপ্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

কেস স্টাডি ৩ : আনোয়ারা বেগম বীনা

আত্মপ্রত্যয়ী ও সংগ্রামী এক নারী আনোয়ারা বেগম বীনা। বয়স ৪১ বছর। স্নাতক পাশ। রাজশাহী কাটাখালী এলাকায় বাড়ি। স্বামী ১৫ বছর যাবৎ জার্মান প্রবাসী। তিনি ২ কন্যা সন্তানের জননী। সংসারে আর কেউ নেই। ২ দেবর আলাদা সংসারে বসবাস করেন বহু পূর্বে থেকেই। স্বামী ২/৩ বছরে একবার দেশে আসেন। স্বামীর টাকা প্রেরণ অনিয়মিত হলেও অপর্যাপ্ত নয়।

বড় মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে ২য় বর্ষ অনার্সের ও ছোট মেয়ে স্থানীয় সরকারী মহিলা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক ১ম বর্ষের ছাত্রী। মিসেস বীনা স্বামী জার্মানি চলে যাওয়ার পর ৪/৫ বছর সন্তান ও সংসার নিয়ে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু কন্যা দুটি স্কুলগামী হলে তার একাকীত্ব বেড়ে যায় এবং তখন তিনি স্থানীয় একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকুরি নেন। এই বিদ্যালয় এখন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আনোয়ারা বেগম বীনা এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা।

তার স্বামী তার নামেই টাকা প্রেরণ করেন। উক্ত টাকা ও নিজের আয় দ্বারা তিনি দোতলা একটি চমৎকার বাড়ি করেছেন যার নীচতলা ভাড়া দিয়ে তিনি ২য় তলাতে বসবাস করছেন। সঞ্চয় স্কীম ছাড়াও স্থানীয় কাটাখালী বাজারে তার দুটি দোকান আছে যা ভাড়া দেওয়া। সংসারে কোনো আর্থিক অসচ্ছলতা নেই।

আনোয়ারা বেগম বীনা ছাত্রজীবন থেকেই খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহী ছিলেন। তিনি একজন রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী। ঘরে দেবব্রত, শান্তিদেব ঘোষ থেকে শুরু করে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা পর্যন্ত অসংখ্য শিল্পীর রেকর্ড দেখা গেল। তিনি জেলা মহিলা সংস্থার একজন সদস্য। তিনি একটি মহিলা সমিতিরও (এনজিও) সাধারণ সম্পাদক। তার মতে বাংলাদেশের মহিলাদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সংগঠনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

সংসারের কোনো বিষয়েই তিনি আর এখন স্বামীর দিকে চেয়ে থাকেন না। একক দায়িত্বেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন। সমাজে তার সম্মান ও মর্যাদা ঈর্ষণীয়। তিনি বলেন যে, স্বামীর দীর্ঘদিনে অনুপস্থিতি, ধৈর্য, পরিশ্রম, উদ্যোগ ও বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা তাকে

সমাজে অধিকতর মর্যাদা দিয়েছে ও তার সার্বিক ক্ষমতায়নকে তরান্বিত করেছে। তার মতে, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন আদৌ সম্ভব নয়। নারীদের ব্যাপারে পুরুষের সনাতনী বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন করতে হবে বলে তার অভিমত।

আনোয়ারা বেগম প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার ২ মেয়েকেও তার আদলে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে চান তিনি। তিনি স্বপ্ন দেখেন নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করে নারী পুরুষের সমন্বয়ে একটি সুন্দর সমাজের।

৮. উপসংহার ও সুপারিশমালা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে প্রবাসী কর্মজীবীদের অবদান অপরিসীম। উন্নয়নের অগ্রগণ্যতা, গতিপ্রবণতা, ব্যাপক অংশীদারিত্ব এবং সামাজিক অসমতা হ্রাসই শুধু নয়; প্রবাসী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থ, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাত্রা প্রণালির অনুপ্রবেশ এবং অনুশীলন তাদের পরিবার তথা প্রোষিতভর্তৃকাদের সার্বিক ক্ষতমায়নে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। বিশেষত বাংলাদেশের মত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই প্রক্রিয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন অনেকেই সামাজিক পরিবর্তনের বাহন হিসেবে মনে করেন। সমাজে নারীর প্রতি লৈঙ্গিক বৈষম্য দূরীকরণে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধিকতর অংশগ্রহণ, উৎপাদনশীল ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা, সামাজিক উদ্যোগ ও ভূমিকাপালন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়ন প্রবণতা লক্ষণীয় মাত্রায় বেড়েছে, যা প্রবাসী কর্মজীবীদের পারিবারিক কল্যাণ ও উন্নয়নকে প্রভূত মাত্রায় ত্বরান্বিত করেছে। পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, পরিবারে স্বামীর দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির ফলে প্রোষিতভর্তৃকারা অতিরিক্ত পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য হন। এতে তাদের সামাজিক দৃশ্যমানতা, গতিশীলতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। দেশে স্বামী অবস্থান না করলেও অন্যকেউ তাদের ওপর সাধারণত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না। বরং অর্থনৈতিক শক্তি বলে প্রোষিতভর্তৃকারা অন্যান্যদেরকে নিজেদের পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য কাজে নিয়োজিত করতে পারেন। এভাবে পরিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বামীর প্রেরিত অর্থ নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে শতকরা ১০০ ভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারিক সচ্ছলতা অর্জন, সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনই নারীদের একমাত্র ভূমিকা এই ধারণার বাইরে এসে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, অধিক হারে বিভিন্ন যোগাযোগ ও প্রযুক্তি মাধ্যমের ব্যবহার, ইত্যাদি সমাজে তাদের মর্যাদা ও ভূমিকাকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রেষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের এই আবর্তন সামাজিক দৃশ্যমানতা ও 'প্রদর্শক প্রভাবক' (Demonstrative Effect) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের অন্যান্য স্তরের নারীদেরকেও সচেতন এবং ক্ষমতায়নে উদ্বুদ্ধ করছে। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় বিশেষত ২ ও ৩ নং কেস স্টাডি বিশ্লেষণসহ সামগ্রিকভাবে প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের চিত্র পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, তাদের ক্ষমতায়নের মাত্রা যে সব নারীর স্বামীরা মধ্যপ্রাচ্যে থাকেন তার তুলনায় ইউরোপ, দূরপ্রাচ্য বা আমেরিকায় কর্মরত স্বামীদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর। মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ, তুলনামূলক সীমিত উপার্জন ও সেখানে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এর অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নে এদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ামকের পাশাপাশি তাদের স্বামীদের গন্তব্য বা অবস্থানরত দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার কারণেও কিছুটা পার্থক্য সূচিত হয়। তবে কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকলেও প্রোষিতভর্তৃকাদের পারিবারিক জীবন অনেক বেশি সচ্ছল, গতিশীল এবং তাদের ক্ষমতায়নের মাত্রাও তুলনামূলকভাবে সমাজের অন্যান্য সাধারণ মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর। এ প্রসঙ্গে কে,সি, জাকারিয়া, এস,আই, রাজন বলেন,

"উপসাগরীয় বধূ শুধু গৃহাভ্যন্তরেই নয় বরং সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনেও তিনি একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা আয়ত্ত করেছেন। তার স্বামী (সংসারে) অনুপস্থিত থাকতে পারেন; কিন্তু তার সহায়তার হাত সর্বদা টেলিফোনের অপর প্রান্তে অত্যন্ত নিকটবর্তী ও সক্রিয় থাকে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পদ তার (স্ত্রীর) অধিকারে আসে এবং আশেপাশে যে কোনো পুরুষের সমমর্যাদার পর্যায়ে স্বামীর অনুপস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পদে তার মালিকানা এবং প্রয়োজনানুযায়ী স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তার স্বভাবসুলভ লাজুকতার স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তনের মাধ্যমে একজন নির্ভরশীল মহিলাকে আত্মপ্রত্যয়ী ব্যবস্থাপকে রূপান্তরিত করে। তিনি তার চারপাশের জগৎ সম্পর্কে একটি গভীর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন।"[৩৫] কিন্তু তা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের সূচক যেমন লক্ষণীয়ভাবে ঊর্ধ্বগামী নয়; তেমনি প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের আর্থ-সামাজিক শর্তও এখনও যথার্থ মাত্রায় অনুকূল নয়।

পুরুষকেন্দ্রিক সমাজ-কাঠামো, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার, অশিক্ষা, নারী সংগঠনের অভাব, অর্থের নিরাপদ বিনিয়োগের প্রতিকূল পরিবেশ, রাজনীতিতে তাদের প্রান্তিক অবস্থান, প্রভৃতি প্রোষিতভকর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের পথে প্রধান অন্তরায়। এসব সমস্যা দূরীকরণে প্রোষিতভকর্তৃকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ, স্বামীর প্রেরিত অর্থের নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগ সুযোগ, অধিকতর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধকরণ ও তাতে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করণের মধ্যেই তাদের ক্ষমতায়নের পূর্ণাঙ্গ রূপ নিহিত। আর এজন্য সরকার, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ ও দেশের নারী সংগঠনগুলোকে সুষ্ঠু নীতি ,পরিকল্পনা ও যথার্থ কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

আলোচ্য গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, প্রবাসী কর্মজীবীদের আয়, প্রেরিত অর্থের লাভজনক ও নিরাপদ বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের স্ত্রীদের ভূমিকা, সামাজিক ভূমিকা পালনসহ স্বামীর অনুপস্থিতিতে সমাজ বাস্তবতায় আত্মনির্ভরশীলতা ও সংগ্রামী মানসিকতা সামাজিকভাবে প্রোষিতভর্তৃকাদেরকে ক্ষমতায়িত করেছে। কিন্তু তাদের ক্ষমতায়নের গতিপথ ও প্রক্রিয়ায় এখনও নানাবিধ সমস্যা এবং প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এগুলো নিরসনে সরকার, জনগণ ও সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে, পরিবর্তন ঘটাতে হবে সমাজের পুরুষকেন্দ্রিক মানসিকতার। প্রোষিতভর্তৃকাদের প্রদত্ত মতামত ও অন্যান্য তথ্যের আলোকে তাদের ক্ষমতায়নের জন্য নিম্নে কতিপয় সুপারিশ করা হলো :

- প্রবাসী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগ পরিবেশ সুনিশ্চিত করণ;
- হুন্ডি ও অনিরাপদ মাধ্যম ছাড়া ব্যাংক ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ও নিরাপদ মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে দেশে টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা;
- সহজে ও স্বল্প খরচে প্রবাসী স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা;
- প্রবাসী কর্মজীবীদের পরিবারের জন্য 'বিশেষ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা প্যাকেজ' প্রবর্তন করা;
- প্রোষিতভর্তৃকাদের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণের জন্য সরকার ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন গড়ে তুলতে প্রণোদনা (Incentive) প্রদান;

---

[৩৫] "... the Gulf wives will have developed an innate capacity to get things done, not only within the household but also in the community. ... the husband may be absent, but his helping hand is close by at the other end of the telephone line. The husband's absence, increased economic resources at the disposal of the wife and the ability to communicate with him whenever needed have all became instrumental in transforming a shy, depended woman into a self-confident autonomous manager with a status equal to that of any man in the neibghbourhood. She has also gained a larger vision of the world around her."... K.C. Zachariah and S.I. Rajan, *Gender Dimensions of Migration,* p. 69.

- প্রোষিতভর্তৃকাদের পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকা পালনে পুরুষের বৈষম্য-মূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সুশীলসমাজসহ বিভিন্ন নারী উন্নয়ন সংগঠনের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ;
- প্রোষিতভর্তৃকারা প্রজননস্বাস্থ্য ও এইচআইভি/এইডস সংক্রমণে ঝুঁকিপ্রবণ হওয়ায় তাদের জন্য বিশেষ সমন্বিত স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ;
- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অধিক দৃশ্যমান, সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত ও অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;
- প্রবাসী কর্মজীবীদের স্ত্রী ও পরিবারের জন্য বিশেষ 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর' (Special Social Safty Net) ব্যবস্থা করা;
- প্রোষিতভর্তৃকাবা তথা নারীর ক্ষমতায়নে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি বাংলাদেশে এদেশের উপযোগী করে প্রবর্তন;
- প্রোষিতভর্তৃকাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও এগুলোর বাস্তবসম্মত সমাধানের জন্য তাদের ওপর ব্যাপক গবেষণা ও জরিপের ব্যবস্থাকরণ।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৩শ সংখ্যা ১৪১২

দৈহিক মিলন: পক্ষদের অধিকার ও দায়বদ্ধতা

খবির উদ্দীন আহম্মদ*

Abstract: Mankind is the joint product of man and woman. Sexual intercourse is a normal and natural process for creation of human being. It is also mutual enjoyment of the parties; it may also be an act of unilateral enjoyment of the active one, normally male wherein female's role is passive. Marriage is legal and social basis of this sexual relationship. There may be extra-marital sexual relationship between a man and a woman which is highly discouraged. Both these marital and extra-marital relationships create various rights and obligations between the parties. Meaning of puberty; nature, concept and importance of sexual intercourse, various rights and obligations of the parties to the sexual intercourse are discussed in this article.

১. ভূমিকা

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে নারী ও পুরুষের মধ্যে মানুষ সৃষ্টির ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি মানুষের মধ্যে যৌন চেতনা দান করেছেন। এ চেতনা উদ্বুদ্ধ মানুষের দৈহিক মিলনে সন্তান জন্ম লাভ করছে। নারী ও পুরুষের এ দৈহিক মিলন সৃষ্টির প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। আল্লাহ জন্মদান ব্যবস্থা প্রদানসহ জোড়ায় জোড়ায় অন্য প্রাণীও সৃষ্টি করেছেন। এভাবে প্রাণী থেকে প্রাণী সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্টির অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে। প্রাণীকূলে এরূপে প্রাকৃতিক উপায়ে বংশ বিস্তার একটি স্বাভাবিক ঘটনা। নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানুষ এরূপে বংশ বিস্তারের মাধ্যমে পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রাকৃতিক উপায়ে নারী ও পুরুষের Cohabitation / Sexual intercourse / Consummation / Coition তথা যৌন সম্পর্ক/যৌন মিলন/সহবাস বা দৈহিক মিলন সন্তান জন্ম দানে ব্যর্থ হলে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে যথা Artificial Insemination, Test Tube, ইত্যাদির মাধ্যমে মানব সন্তান জন্ম লাভ করছে। মানব জন্ম প্রক্রিয়ার রহস্য একটা পর্যায় পর্যন্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। ফলে মানুষের মধ্যে প্রজনন ক্ষমতা আসার কোনো এক পর্যায়ে মানুষ জানছে জন্ম রহস্য। শরীরে সন্তান জন্মদানের উপাদান যথা শুক্র বা ডিম্ব নিঃসরণ বিষয়ে পুরুষ বা নারীর তাৎক্ষণিক জ্ঞান না থাকলেও কোনো এক সময়ে তারা সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই মানুষ সন্তান জন্মদানে তার সক্ষমতার বা অক্ষমতার বিষয় অবগত হচ্ছে। প্রকৃতিগতভাবে যৌনতার মানসিক ও শারীরিক চাহিদা পরিপূরণে মানুষ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট বা ধাবিত হচ্ছে। দুর্বল মুহূর্ত অনেক সময়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করছে। ধর্ম, আইন, সমাজ মানুষের মধ্যের সন্তান জন্মদানের যৌনতা বিষয়ক এ প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে নারী ও পুরুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছে বিবাহের প্রচলন। বিবাহ হচ্ছে প্রকারান্তরে নারী ও পুরুষের স্বীকৃত সহবাস, যৌন সম্পর্ক,

* ড.খবির উদ্দীন আহম্মদ, সহযোগী অধ্যাপক , আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

যৌন মিলন, দৈহিক মিলন তথা Cohabitation, Sexual intercourse, Consummation বা Coition; দৈহিক মিলনের অক্ষমতা (Impotence) বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান কারণ। নারী ও পুরুষের বিবাহোত্তর দৈহিক মিলন স্বাভাবিক ঘটনা হলেও প্রাক-বিবাহ বা বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলন একদম বিরল নয়। সমাজে বিবাহ বহির্ভূত এরূপ দৈহিক মিলন একটি আনন্দ কর্ম হিসেবে প্রচলিত ঘটনা। তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তা নিষিদ্ধ। ক্ষেত্র বিশেষে তা শাস্তিযোগ্য। বিবাহোত্তর বা বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলনে নারী ও পুরুষের বিভিন্ন প্রকার অধিকার ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের সাধারণ ও বিশেষ আইনসহ বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ে প্রচলিত দৈহিক মিলনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্ণনাসহ নারী ও পুরুষের জননেন্দ্রিয় সহযোগে সংঘটিত দৈহিক মিলন উৎসারিত পক্ষদ্বয়ের বৈধ অবৈধ অধিকার ও দায়বদ্ধতার বিভিন্ন বিষয় এবং দৈহিক মিলনে পক্ষদের অধিকার নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ এ প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হবে। অধিকার সুসংহত বা সংরক্ষণ প্রয়োজনে দরকারি ক্ষেত্রে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দেওয়া হবে।

২. দৈহিক মিলনের অর্থ, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ

পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছা করেন[১] এবং প্রথমে পুরুষ আদম ও পরে নারী হাওয়া সৃষ্টি করেন;[২] তিনি পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেন;[৩] তিনি জোড়া সৃষ্টি করেন। তিনি মানুষের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির ব্যবস্থা প্রদানে নারী ও পুরুষের মধ্যে মানুষ সৃষ্টির উপাদান স্থাপন করেন ও সন্তানাদির জন্ম দেন। প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাণী সৃষ্টির কৌশল হচ্ছে যৌন মিলন। এ যৌনতা তথা দৈহিক মিলন যা আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির জন্য নারী ও পুরুষের মধ্যে আবশ্যক করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টিতে অংশগ্রহণে সক্ষম করার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরুষ ও নারীকে পৃথক সত্তা প্রদান করেন। সন্তান জন্মদানের প্রাকৃতিক পদ্ধতি এ দৈহিক মিলন বিশ্বের সর্বজনীন নিয়ম।[৪] নারী ও পুরুষ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দৈহিক মিলনে উপনীত হয়।[৫] এভাবে নারী ও পুরুষের দৈহিক মিলনকে আবশ্যক করলেও তিনি তাতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রদান করেন এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দেন,[৬] এবং এরূপ সম্পর্ক ব্যতীত দৈহিক মিলনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার বাধা উত্থাপন এবং তাকে শাস্তিযোগ্য করেন। মুসলিম সম্প্রদায়ে কেবল এভাবে দৈহিক মিলনকে দেখা হয়, তা নয়, অন্য সকল সম্প্রদায়েই বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলন নিরুৎসাহিত। ক্ষেত্র বিশেষে তা শাস্তিযোগ্য গণ্য হয়ে আসছে। উপরোক্তরূপে মানুষ নারী ও পুরুষে বিভক্ত হলেও বিরল সংখ্যায় মানুষের অপর আর এক শ্রেণী হচ্ছে হিজড়া (Hermaphrodite)। এরা দৈহিক মিলনে অক্ষম। দৈহিক মিলন কেবল নারী ও পুরুষে সম্ভব।

অধিকার ও দায়বদ্ধতার দিক থেকে নারী ও পুরুষের দৈহিক মিলন দুই ভাগে বিভক্ত। যথা:

(১) বৈবাহিক ও
(২) বিবাহ বহির্ভূত।

---

[১] *The Holy Qur'an*,II:30.
[২] *তদেব*, XXX:21,IV:1,VII:189.
[৩] *তদেব*, XVI:72,XXIII:12-14.
[৪] Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality in Islam*, Alan Sheridan(tr.) (London: Routledge & KegaPaul,1985),8.
[৫] *তদেব*, পৃ. ৭-১৩.
[৬] *The Holy Qur'an*, XXIV:32.

বৈবাহিক সম্পর্কগত দৈহিক মিলন মূলত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সংঘটিত হয়। বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলন বিবাহিত বা অবিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে সংঘটিত হতে পারে। এ প্রকারের দৈহিক মিলন প্রাক-বিবাহ বা বিবাহোত্তর হতে পারে। প্রাক-বিবাহ দৈহিক মিলন অবিবাহিত নারী ও পুরুষের নিজেদের মধ্যের দৈহিক মিলন। আর বিবাহোত্তর দৈহিক মিলন হচ্ছে বিবাহিত এক বা উভয় পক্ষের দৈহিক মিলন। তারা নিজেরা একে অপরের সাথে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত নয়।

নারী ও পুরুষের সাধারণত বয়ঃসন্ধিতে দৈহিক মিলনের চেতনা সূচিত হয়। এ সময় নারীর শারীরিক ও মানসিকভাবে মা হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টিসহ গর্ভে সন্তান ধারণের ক্ষমতা এবং পুরুষের সন্তান জন্মদানের পরিপূর্ণতা আসে। বিবাহের জন্য নারী ও পুরুষের এটা উপযুক্ত সময়। যৌন চেতনায় নারী ও পুরুষ পারস্পরিকভাবে অথবা কোনো এক পক্ষ একতরফাভাবে বিবাহ বহির্ভূত বা বৈবাহিক সম্পর্কগত কারণে যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয়ে থাকে। তাতে নারীর গর্ভে সন্তানের সূচনা হতে পারে। নাও পারে। এটা নারী ও পুরুষের দৈহিক মিলন বিষয়ে ইতিবাচক দিক। নেতিবাচক দিক তা হলো দৈহিক মিলনের অক্ষমতা (Impotence)। এর অর্থ শারীরিকভাবে যৌনকার্য তথা দৈহিক মিলনের অক্ষমতা।[৭] তা দৈহিক মিলনে পুরুষকে নিষ্ক্রিয় রাখে। নারীর ক্ষেত্রেও এরূপ অক্ষমতা থাকতে পারে। দৈহিক মিলন বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টির অন্যতম মূল ভিত্তি হওয়ায় পক্ষদের কারো মধ্যের এর অক্ষমতা বিবাহ বিচ্ছেদসহ অন্যান্য অধিকার বা অধিকারহীনতা সৃষ্টি করে। দৈহিক মিলন পক্ষদের মধ্যে বিভিন্ন অধিকার সৃষ্টি করে। কারো কোনো অধিকার হরণ করে। আবার কাউকে কোনো ক্ষেত্রে দায়বদ্ধও করে। দৈহিক মিলনের সক্ষমতা বা অক্ষমতা সৃষ্ট দেওয়ানি বা ফৌজদারি প্রকৃতির অধিকার ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো পক্ষদের উভয়ের বা কোনো এক পক্ষের অনুকূলে বা প্রতিকূলে যায়।

৩. বয়ঃসন্ধি : নারী ও পুরুষের দৈহিক মিলনে উপযুক্ততা

নারী ও পুরুষের বয়ঃসন্ধিতে (Puberty/*Catamenia*) যৌনতার প্রকাশ ঘটে যা প্রজনন তথা দৈহিক মিলনের ক্ষমতা। চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ আইন বিজ্ঞান ও মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য প্রচলিত ব্যক্তিগত আইনে নারী ও পুরুষের বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হওয়ার বিভিন্ন লক্ষণ ও বয়সের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। সাধারণত তা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দৈহিক ও মানসিক লক্ষণে প্রকাশ পায়। বয়সের দিক থেকে ছেলেরা সাধারণত ১৫ বা ১৬ বছর বয়সে দৈহিক মিলনে সক্ষম হয়। তা সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা শুরুর পূর্বে আসে এবং পরে যায়। মেয়েরা সাধারণত ১৩ বা ১৪ বছর বয়সে বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ হচ্ছে পুরুষাঙ্গের বৃদ্ধি পাওয়াসহ বীর্য নির্গত করার ক্ষমতা অর্জন এবং লিঙ্গের গোড়া ও বগলে লোম বা চুলসহ মুখমণ্ডলে দাড়ি গোঁফ গজানো। এছাড়া এসময় কণ্ঠস্বর মোটা ও ভারী হয়। মেয়েদের লক্ষণ হচ্ছে ডিম্ব নিঃসরণের সুস্থ ডিম্বাশয়সহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জননেন্দ্রীয়ের বৃদ্ধি পাওয়া, ঋতুস্রাব বা মাসিক শুরু হওয়া এবং যৌনাঙ্গের পাশে ও বগলে লোম বা চুল গজানোসহ স্তন স্ফীত হওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া।[৮] অন্য ব্যক্তিগত আইন অপেক্ষা মুসলিম আইনে নারী ও পুরুষের বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্তীর লক্ষণ ও বয়স বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সে অনুযায়ী বালকের বয়ঃসন্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় তার বীর্যস্খলনের, স্ত্রীলোককে গর্ভবতী করার বা সঙ্গমে

---

[৭] N. J. Modi (ed.), *Modi's Textbook of Medical Jurisprudence and Toxicology* (Lahore : P. L. D. Publishers, N.D.), 303. ডাঃ কে.সি. গাঙ্গুলী ও বাসুদেব গাঙ্গুলী, *মেডিক্যাল আইন বিজ্ঞান* (ঢাকা: আলীগড় লাইব্রেরী, ১৯৯২), পৃ. ৪০২।

[৮] Modi, pp. 303-4, 306-7; *শরীর ও সম্পর্ক* (Dhaka: BBC World Service and the International Planned Parenthood Federation South Asia Region, 1996), pp. 4-6.

বীর্য নিঃসরণ দ্বারা, এবং এগুলোর কিছুই যদি তার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে, তার ১৮ বছর পূর্ণ না হলে তার বয়ঃসন্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে না। বালিকার বয়ঃসন্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় তার স্খলন, বা গর্ভসঞ্চার দ্বারা; এবং এগুলোর কিছুই যদি না হয়, তার ১৭ বছর পূর্ণ হলে তার বয়ঃসন্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে। আবু হানিফার মতে বালক ও বালিকার বয়ঃসন্ধি নির্ণয় বিষয়ক ঘটনা এগুলো। তাঁর দুই শিষ্য আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ শায়বানীর মতে বালক বা বালিকার ১৫ বছর পূর্ণ হলে তাদের সাবালক সাবালিকা ঘোষণা করতে হবে। একটি মত প্রচলিত আছে যে আবু হানিফাও এ বিষয়ে একইমত পোষণ করেছেন। বয়সগত ক্ষেত্রে বলা হয় বয়ঃসন্ধির সর্বনিম্ন সময় বালকের ক্ষেত্রে ১২ এবং বালিকার ক্ষেত্রে ৯ বছর।[৯] প্রিভি কাউন্সিলের একটি মামলায় মেয়ের বয়ঃসন্ধির সর্বনিম্ন ৯ বছর বয়সের একটি দৃষ্টান্ত আছে।[১০]

বাংলাদেশের সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য The Majority Act, 1875 (Act IX of 1875) প্রচলিত আছে। তা বয়স প্রসঙ্গে বিবাহ, মোহরানা, বিবাহ বিচ্ছেদ, দত্তক, ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেনি। অন্য ক্ষেত্রে এ আইন অনুযায়ী সাবালকত্ব অর্জনের বয়স ১৮ বছর বা ২১ বছর পূর্ণ হওয়া।[১১] এর পূর্বে নাবালকত্ব থাকে। কোনো সময় সাবালকত্বে বয়ঃসন্ধি আসার কথা বলা হলেও দেখা যায় প্রকৃত পক্ষে তা নারী ও পুরুষের মূলত উপরে বর্ণিত দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় যা The Majority Act, 1875 বর্ণিত বয়সের পূর্বেই দেখা দেয়।

৪. সমাজ ও রাষ্ট্র এবং দৈহিক মিলন

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষের দৈহিক মিলন সম্পর্কিত বিষয়গুলি দেশের সাধারণ ও ব্যক্তিগত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তিগত আইন ধর্ম সম্প্রদায়ভিত্তিক। মুসলমানের জন্য মুসলিম আইন এবং হিন্দুর জন্য হিন্দু আইনের পাশাপাশি খ্রিস্টানের জন্য নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ আইন বাংলাদেশে কার্যকর আছে। এগুলো অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে। অপরাধের প্রকৃতি ও শাস্তির বিধান দেশের সাধারণ আইনের আওতাভুক্ত। সকলের ক্ষেত্রে তা সমভাবে প্রযোজ্য।

দৈহিক মিলন মূলত সৃষ্টির প্রাকৃতিক কৌশল। প্রাকৃতিকভাবে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের জন্য তাতে আনন্দ, বিনোদন, আছে। প্রেম, ভালবাসা, আবেগ অনেক সময় এ আকর্ষণের অংশ। এগুলো দৈহিক মিলনের চেতনা প্রদানে সমভাবে বিশেষ বয়সে নারী ও পুরুষের মধ্যে উপস্থিত হয়। এগুলো আল্লাহ

প্রদত্ত। মানুষের মধ্যে এ চেতনার সৃষ্টি প্রদানসহ মানুষকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে তাগিদ দিয়েছেন।[১২] বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলন নিয়ন্ত্রণে তাকে শাস্তিযোগ্য করেছেন। এ নিয়ন্ত্রিত নারী ও পুরুষের দৈহিক মিলন বিষয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র অত্যন্ত সচেতন। রাষ্ট্রীয় আইনে বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলনে পুরুষের একপাক্ষিক চেষ্টাসহ দৈহিক মিলন অপরাধ। নারীর বিরুদ্ধে এ অপরাধ রোধের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থাও প্রণীত হয়েছে। নারী ও পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত পারস্পরিক দৈহিক মিলনকেও অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে অপরাধীকে দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থাও প্রদত্ত হয়েছে। বয়সগত

---

[৯] Charles Hamilton (ed.), *The Hedaya or Guide A Commentary on the Mussulman Laws* (2nd ed.; Lahore : Premier Book House, 1963), pp. 529-30.

[১০] Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, Oxford India Paperbacks, 4th ed., (Delhi: Oxford University Press, 1999), p. 94; Nawab Sadiq Ali Khan & JaiKishori (1928) 30, *Bom. L.R.* 1346.

[১১] *The Majority Act, 1875* (Act IX of 1875), Sections 2, 3.

[১২] *The Holy Qur'an*, XXIV:32.

কারণে স্ত্রীর সাথের স্বামীর দৈহিক মিলনকেও অপরাধ গণ্য করে স্বামীকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্র ব্যতীত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত নারী ও পুরুষের সকল দৈহিক মিলনই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কজাত তা পারস্পরিক বা একপাক্ষিক। বাংলাদেশে The Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ৮নং আইন) অনুযায়ী এ অপরাধ শাস্তিযোগ্য। কন্যাশিশু ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে রাষ্ট্রের এ পদক্ষেপ। এগুলো ফৌজদারি আইনের আওতাভুক্ত। The Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act XIX of 1929) শিশু বিবাহ বন্ধে প্রণীত আইন।

বৈবাহিক সম্পর্কগত বা বিবাহ বহির্ভূত উপরোক্ত প্রকারের দৈহিক মিলনের ঘটনা ছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে দৈহিক মিলনের ঘটনা সমাজে দেখা যায় যা গণিকাবৃত্তি হিসেবে পরিচিত। কেবল বাংলাদেশ নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রচলিত এ গণিকাবৃত্তি রোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নারী ও কন্যা-শিশুর যৌন জীবন এখানে পুঁজি হওয়ায় গণিকাবৃত্তিতে বিভিন্নভাবে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার প্রবণতা মহল বিশেষের মধ্যে বিদ্যমান। ফলে নারী ও শিশুর জীবন সংকটাপন্ন। বাংলাদেশ সংবিধানে গণিকাবৃত্তি রোধে রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।[১৩] বাংলাদেশে গণিকাবৃত্তি নিরোধের প্রচলিত আইন হচ্ছে The Suppression of Immoral Traffic Act, 1933 (Act VI of 1933)। এ আইনে গণিকাবৃত্তির অর্থ টাকা বা কিছুর বিনিময়ে ভাড়ায় পরিচালিত মিশ্র দৈহিক মিলন।[১৪] নারী ও শিশুর যৌন জীবনের বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধে গণিকালয় (Brothel) পরিচালনাকারী ও এ বৃত্তির আয় ও সুবিধাভোগকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়েছে। গণিকাবৃত্তি ভিত্তিক দৈহিক মিলন নারী ও পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক অধিকার সৃষ্টি করে না। তা অনৈতিক কাজ। সমাজ কলুষিত করার মত প্রকাশ্যে না হলে তার জন্য অংশগ্রহণকারী পক্ষদের কোনো শাস্তির ব্যবস্থা নাই।

বিবাহজাত দৈহিক মিলন নারী ও পুরুষের বিবাহের অধিকারের আওতাভুক্ত। তা নারী ও পুরুষকে বিভিন্ন অধিকার প্রদান ও দায়িত্ব অর্পণ করে। ক্ষেত্র বিশেষে তা হরণও করে। দেওয়ানি প্রকৃতির এ প্রকারের অধিকার ও দায়বদ্ধতা বিবাহ সম্পর্কজাত বা বিবাহ বহির্ভূতও হতে পারে। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কজাত দৈহিক মিলনই ফৌজদারি আইনের আওতাভুক্ত।

৫. দৈহিক মিলনের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ক্ষেত্র

পরিবার ও সমাজে বিবাহ সম্পর্কজাত দৈহিক মিলন একটি চিরাচরিত নিয়ম ও স্বাভাবিক ঘটনা। তাতে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ বিষয়ক অধিকার সৃষ্টি হয়। বিবাহের পক্ষদ্বয় পারস্পরিকভাবে বা এককভাবে দৈহিক মিলন দ্বারা বাধ্যবাধকতার আওতায় আসে। প্রচলিত আইনে দৈহিক মিলন ভিত্তিক অধিকার হরণসহ অধিকার ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টির ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে—বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, মোহরানা, খোরপোশ, ইত্যাদি প্রসঙ্গ। বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলনে সাধারণত অপরাধ সৃষ্টি হয়। ফৌজদারি আইনে এরূপ অপরাধ হচ্ছে—ধর্ষণ, ব্যভিচার, জেনা, ইত্যাদি। দৈহিক মিলনে অংশগ্রহণকারী পক্ষদ্বয় বা কোনো একপক্ষ এজন্য দায়ী হয়, এবং অপরাধের জন্য দণ্ডিত হতে পারে। নিম্নে প্রাসঙ্গিক আইন আলোচিত হলো:

---

[১৩] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৮ (২)।

[১৪] *The Suppression of Immoral Traffic Act, 1933* (Act VI of 1933), Section 3(4).

৫.১. অধিকার ও দায়বদ্ধতার দেওয়ানি ক্ষেত্র

দৈহিক মিলন নারী ও পুরুষের অধিকারগত কতিপয় বিষয় যথা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, মোহরানা, খোরপোশ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির পারস্পরিক অথবা একপাক্ষিক অধিকার এবং বা দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

৫.১.১. বিবাহ

বিবাহের ধারণা

বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের নিকট বিবাহের ধারণা বিভিন্ন প্রকার। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আইন বা বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়। মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মুসলিম আইন অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় সকল শর্ত পূরণ করলেই তা প্রকৃত বিবাহ বা নিকাহ হিসেবে গণ্য হয়। এ আইনে বিবাহ মূলত সন্তান জন্মদান ও যৌন সম্পর্ক তথা দৈহিক মিলন বা সহবাস বৈধকরণের চুক্তি।[১৫] বলা হয় বিবাহের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে দৈহিক মিলন। বিবাহ দৈহিক মিলনকে বৈধতা দেয়।[১৬] তাকে দেওয়ানি চুক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়। পারস্পরিক আনন্দ, সন্তানের জন্মদান ও সহবাসের বৈধতা প্রদানের জন্য নারী ও পুরুষের মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়।[১৭] মুসলমান নারী ও পুরুষের একপক্ষের ঘোষণা বা প্রস্তাবে অপর পক্ষের সম্মতি দানের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। হিন্দু আইনে বিবাহকে ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বন্ধন বলা হয়।[১৮] এবং বলা হয় এটা কোনো চুক্তি নয়[১৯] বরং Holy Sacrament। মুসলিম সম্প্রদায়ে বৈধ বিবাহের ফলে পক্ষদের মধ্যের যৌন সম্পর্ক তথা দৈহিক মিলন বৈধ হয়।[২০] বিবাহ দৈহিক মিলনকে সামাজিকতা দিয়েছে। তা সকল সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অধিকার, দায়বদ্ধতা ও সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করাসহ সন্তানের জন্মের বৈধতা দেয়।[২১] এ ক্ষেত্রের দৈহিক মিলন বিষয়ক প্রসঙ্গগুলো নিম্নে আলোচিত হলো :

৫.১.১.১. মুসলিম আইন

মুসলিম আইনে বিবাহ তিন প্রকার। যথা : (১) বৈধ বিবাহ, (২) ত্রুটিপূর্ণ বিবাহ এবং (৩) অবৈধ বিবাহ। বিবাহের যে সকল ক্ষেত্রে দৈহিক মিলন সংঘটনজনিত কারণে অধিকার সৃষ্টি হয় বা লোপ পায় নিম্নে তা আলোচিত হলো :

৫.১.১.১.১. ত্রুটিপূর্ণ বিবাহ

বৈধ বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অস্থায়ী বাধা থাকলে তাকে ত্রুটিপূর্ণ বিবাহ বলা হয়। যেমন: ইদ্দত পালনরতা স্ত্রীলোকের সাথের বিবাহ। পক্ষদের মধ্যে দৈহিক মিলন হলে স্ত্রী মোহরানার সুনির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট অংশ যা কম তা পাওয়ার অধিকারিণী।[২২]

---

[১৫] Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law* (4th ed., 8th reprint; Delhi: Oxford University Press, 1994), p. 90.

[১৬] Bouhdiba, p. 18.

[১৭] Neil. B. E. Baillie. *A Digest of Muhummadan Law* (Lahore: Premier Book House, 1958), pp. 4, 10, 16, 18; *Hedaya*, pp. 25, 33.

[১৮] Sundrabai v. Shibnarayan (1908) *32 Bom.* 81.

[১৯] Sunderlal T. Desai (ed.), *Mulla Principles of Hindu Law* (14th ed.; Bombay : N. M. Tripathi Private Limited, 1975), p. 507.

[২০] Fyzee, (1999), p. 116.

[২১] Paras Diwan and Peeyushi Diwan, *Private International Law* (4th ed., rev.ed., New Delhi:Deep & Deep Publications,1998), p.237.

[২২] তদেব, পৃ. ১১৪।

৫.১.১.১.২. অবৈধ বিবাহ

স্থায়ী বাধা বিবাহকে অবৈধ করে। এ বিবাহের কোনো বৈধ ফলাফল থাকে না। সাধারণত নিষিদ্ধ রক্ত, বৈবাহিক বা দুধ সম্পর্কের নারী ও পুরুষের বিবাহ অবৈধ বিবাহ। দৈহিক মিলন হয়ে থাকলে এ বিবাহে স্ত্রী মোহরানা পায়।[২৩] স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন হয়ে থাক বা না থাক স্ত্রীর মায়ের সাথের বিবাহ বৈধ নয়।[২৪] স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন হয়ে না থাকলে স্ত্রীর অধস্তনকে বিবাহ করা যায়।[২৫] ফলত স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন হয়ে থাকলে তার কন্যাকে বিবাহ করা যায় না।

৫.১.১.১.৩. ইদ্দতকাল

ইদ্দত অর্থ নিবৃত্তিকাল। বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর ফলে কোনো বৈবাহিক সম্পর্কের অবসানের ক্ষেত্রে নারীর পরবর্তী বিবাহের জন্য যে অপেক্ষাকাল তাকে ইদ্দতকাল বলা হয়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক মিলন ঘটলে স্ত্রীর ইদ্দত পালন আবশ্যক। বিবাহ বিচ্ছেদ দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্কের অবসানের ক্ষেত্রে ইদ্দতকাল তিন ঋতু, মৃত্যুর ফলে চার মাস দশ দিন, দৈহিক মিলন না হয়ে থাকলে ইদ্দত পালনের প্রয়োজন নাই।[২৬]

৫.১.১.১.৪. বৈধ অবসর (Valid Retirement)

ইদ্দত পালনের প্রশ্নে দৈহিক মিলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রীর বৈধ অবসরকে (Valid Retirement) তাদের দৈহিক মিলনের সমপর্যায়ভুক্ত গণ্য করা হয়েছে। এর অর্থ দৈহিক মিলনের ক্ষেত্রে নৈতিক, শারীরিক বা আইনগত বাধা না থাকা অবস্থায় স্বামী ও স্ত্রীর একত্রে গোপনে অবস্থান। তা মোহরানার নিশ্চয়তাদান, পিতৃত্ব নির্ধারণ, ইদ্দত পালন, ইদ্দতকালে স্ত্রীর খোরপোশ ও বাসস্থানের সংস্থান, স্ত্রীর বোনের সাথে বিবাহের বাধা উত্থাপনসহ চারজন স্ত্রীর বর্তমানে ৫ম স্ত্রী গ্রহণে বাধা প্রদান করে।[২৭]

৫.১.১.১.৫. অবৈধ দৈহিক মিলন ও অন্তরঙ্গতা

বৈবাহিক সম্পর্কগত সুবিধায় স্বামী স্ত্রীর দৈহিক মিলন বিবাহে যেরূপ নিষিদ্ধ সম্পর্ক সৃষ্টি দ্বারা বাধা সৃষ্টি করে কোনো নারীর সাথে কোনো পুরুষের অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক এবং অন্তরঙ্গ মেলামেশাও (Illicit intercourse and undue familiarity) সেরূপ বাধা সৃষ্টি করে। ফলে ঐ নারীর সাথে ঐ পুরুষের বিবাহ সম্ভুক্ত হলেও তার অন্য আত্মীয়ের সাথে তার বিবাহে বাধা আসে।[২৮]

৫.১.১.১.৬. বিবাহের অনুমান

বৈধ বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা আছে। কিন্তু যদি সেরূপ ছাড়া কোনো পুরুষ ও নারী স্বামী স্ত্রী হিসেবে দীর্ঘকাল ধারাবাহিকভাবে দৈহিক মিলন ঘটিয়ে আসতে থাকে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবর্তমানে অনুমান করা যায় যে ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে একটা বৈধ বিবাহ সংঘটিত হয়েছে।[২৯]

৫.১.১.১.৭.মুতা(অস্থায়ী)বিবাহ

মুতার আক্ষরিক অর্থ ভোগ, ব্যবহার এবং এর আইনগত অর্থ ভোগের জন্য বিবাহ। মহানবী হযরত

---

[২৩] তদেব, পৃ. ১১২।
[২৪] *Hedaya*, p. 27.
[২৫] Fyzee, (1999), p. 106.
[২৬] তদেব, পৃ. ১০৮।
[২৭] তদেব, পৃ. ১০৮-৯।
[২৮] তদেব, পৃ. ১১১।
[২৯] তদেব, পৃ. ১১৪।

মুহাম্মদ (দঃ) প্রথম দিকে এ বিবাহ বিষয়ে আপত্তি না করলেও পরে তা নিষিদ্ধ করেন। ইথ্না আশারী শিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সকল সম্প্রদায় এটা বিশ্বাস করে। একদিন, এক মাস বা এক বছর বা নির্দিষ্ট বছরের জন্য এ বিবাহ হয়ে থাকে। দৈহিক মিলন হলে স্ত্রী পূর্ণ মোহরানা পায়। না হলে অর্ধেক। নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই স্ত্রী চলে গেলে আনুপাতিক হারে মোহরানা কমে যায়। দৈহিক মিলন হলে বিবাহের মেয়াদ শেষে স্ত্রীকে দুই ঋতুকাল ইদ্দত পালন করতে হয়। মিলন না হলে তা পালন লাগে না।[৩০]

৫.১.১.২.হিন্দু আইন

হিন্দু আইনে বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে দৈহিক মিলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ আইন অনুযায়ী দৈহিক মিলনের অক্ষমতা বিবাহকে বৈধতা দেয় না। বেশ কিছু মামলায় স্থির হয়েছে, যে বিবাহের একজন দৈহিক মিলনে অক্ষম এবং বিবাহ সম্ভুক্ত করতে সক্ষম নয় সে বিবাহ বাতিল।[৩১]

৫.১.২. বিবাহ বিচ্ছেদ

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যের দৈহিক মিলন বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পক্ষদের দৈহিক মিলনের অক্ষমতা বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ। নিম্নে বিবাহ বিচ্ছেদে দৈহিক মিলন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো:

৫.১.২.১. মুসলিম আইন

ইসলামে বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদিত হলেও তা কোনো ভাল কাজ নয়। কেবল বাধ্য হলেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। বিবাহ বিচ্ছেদের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যথা: তালাক, ইলা, ইত্যাদি।

৫.১.২.১.১.তালাক

স্বামী কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তার নিরংকুশ ক্ষমতায় তালাকের মাধ্যমে স্ত্রী পরিত্যাগ করতে পারে। তালাক কার্যকর করার দিক থেকে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত:

১. তালাক আল সুন্নাহ (অনুমোদিত পদ্ধতি): (১) আহসান; (২) হাসান
২. তালাক আল বিদা (অননুমোদিত পদ্ধতি)।

৫.১.২.১.১.১. তালাক আল সুন্নাহ

৫.১.২.১.১.১.১. আহসান (চমৎকারভাবে অনুমোদিত) পদ্ধতি

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ঋতুমুক্ত থাকাকালে একবার তালাকের ঘোষণা প্রদান এবং পরবর্তী ঋতু শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দৈহিক মিলনে বিরত থাকাসহ পুরো ইদ্দতকাল দৈহিক মিলনে বিরত থাকার মাধ্যমে এ পদ্ধতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর হয়।[৩২] দৈহিক মিলনে বিরত থাকাকালে কোনো সময় মিলন ঘটলে তালাক বাতিল তথা অবৈধ হয়ে যায়। ফলত বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর হয় না। এ ক্ষেত্রে ইদ্দতকাল তালাক ঘোষণা থেকে তিন মাস। স্বামীর ঘোষণা বা আচরণ দ্বারা এ সময়ে তালাক প্রত্যাহার করা যায়। প্রত্যাহারের পরিষ্কার প্রদর্শন হলো দৈহিক মিলন ঘটানো। এ সময়ের মধ্যে দৈহিক মিলন ঘটলে বিবাহ বিচ্ছেদ অকার্যকর হয়।

---

[৩০] তদেব, পৃ. ১১৭-১২১।

[৩১] Desai,474, উদ্ধৃত Sm.Ratan Moni Debi v. Nagendra Narain Sungh(1949)*A.C.* 404, A.v. B.(*'52*) AB 486.

[৩২] *Hedaya*, 72.

৫.১.২.১.১.১.২. হাসান (অনুমোদিত) পদ্ধতি

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ঋতুমুক্ত থাকাকালে পর পর তিনটি ঋতুমুক্ত অবস্থায় তিনবার তালাক প্রদান এবং স্ত্রীর ঐরূপ অবস্থা থাকাকালে তার সাথে দৈহিক মিলনে বিরত থাকার মাধ্যমে এ পদ্ধতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর করা হয়।[৩৩] এ পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে পরপর তিনবার স্ত্রীর তিনবারের ঋতুমুক্ত থাকাকালে তালাক ঘোষণা এবং ঐ ঋতুমুক্ত সময়ে দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক ছেদ করা হয়। স্ত্রীর ঋতুমুক্ত থাকাকালে দৈহিক মিলন ঘটানো দ্বারা তালাক প্রত্যাহার হতে পারে।[৩৪]

৫.১.২.১.১.২. তালাক আল বিদা

তিন তালাক ও এক তালাক প্রদান পদ্ধতিতে এ নিয়মে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হয়।

উপরোক্ত তালাক প্রদানের পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য দুইটি দিক যথা (১) স্ত্রীর ঋতুমুক্ত থাকা এবং (২) দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকা প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার।

৫.১.২.১.২. ইলা

বিবাহ বিচ্ছেদের ইলা পদ্ধতিতে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন ঘটাবে না বলে শপথ গ্রহণ করে এবং চার মাস বা তার বেশি সময় দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকে। হানাফী আইন অনুযায়ী আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিরেকেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।[৩৫]

৫.১.২.১.৩. স্বামীর দৈহিক মিলনের অক্ষমতা

The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 (Act VIII of 1939) অনুযায়ী স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে। স্বামীর দৈহিক মিলনের অক্ষমতা এ মামলায় ডিক্রি প্রদানের উপযুক্ত কারণ। বিবাহের সময় স্বামী দৈহিক মিলনে অক্ষম (Impotent) ছিল এবং এখনও এরূপ আছে মামলায় প্রমাণিত হলে আদালত বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি দিতে পারেন। বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রিদানের পূর্বে অন্য কোনোভাবে নয় কেবল স্বামীর আবেদনের ভিত্তিতে আদালত আদেশ দানের এক বছরের মধ্যে স্বামী Impotent নয় তা প্রমাণের সুযোগ স্বামীকে দিতে পারেন। স্বামী ব্যর্থ হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে, সফল হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না।[৩৬] বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে পক্ষদের মধ্যে দৈহিক মিলন অবৈধ হয়ে যায়।[৩৭]

৫.১.২.১.৪. বয়ঃসন্ধির মনোনয়ন (Option of Puberty)

সুস্থ মস্তিষ্কের প্রত্যেক সাবালক সাবালিকা নিজের বিবাহের চুক্তি নিজেই করতে পারে। বয়ঃসন্ধিতে সাবালকত্ব আসে। অভিভাবকের মাধ্যমে নাবালক নাবালিকার বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে। সাবালকত্ব অর্জনের পর এরূপে বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব। কোনো মেয়ের যদি নাবালিকা থাকাকালে তার অভিভাবক কর্তৃক তার বিবাহ সম্পাদিত হয়ে থাকে নিম্নবর্ণিত বিষয় সাপেক্ষে সে তার বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারিণী :

১. তার বিবাহ তার পিতা বা অন্য কোনো অভিভাবক কর্তৃক দেওয়া হয়েছে;
২. তার ১৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার বিবাহ দেওয়া হয়েছে;

---

[৩৩] *তদেব*, ৭২-৭৩।

[৩৪] Fyzee, (1999), 152-154.

[৩৫] *তদেব*, ১৬২।

[৩৬] *The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939* (Act VIII of 1939) Section 2 (V) read with section 2 proviso (c).

[৩৭] Fyzee,(1999), p. 186.

৩. তার ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে; এবং
৪. বিবাহ সম্ভুক্ত (Consummated) হয়নি, অর্থাৎ তার দৈহিক মিলন ঘটেনি। তবে বয়ঃসন্ধির পূর্বের সংঘটিত দৈহিক মিলন তার এ অধিকার খর্ব করে না।[৩৮]

যে সব কারণে কোনো স্ত্রী The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 অনুযায়ী তার বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রির জন্য মামলা দায়ের করতে পারে এটা তার অন্তর্গত। এতে বলা হয়েছে মুসলিম আইন অনুযায়ী কোনো মহিলার বিবাহ হয়ে থাকলে সে তার বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি লাভের অধিকারিণী—যদি তার ১৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার পিতা বা অন্য অভিভাবক কর্তৃক তার বিবাহ দেওয়া হয়ে থাকে, এবং সে তার ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার বিচ্ছেদ ঘটায়। তবে শর্ত হচ্ছে পক্ষদের মধ্যে দৈহিক মিলন হবে না, অর্থাৎ বিবাহ সম্ভুক্ত (Consummated) হতে পারবে না।[৩৯]

৫.১.২.১.৫. পূর্ববর্তী স্বামীর সাথে বিবাহের জন্য পরবর্তীর সাথে দৈহিক মিলনসহ বিবাহ বিচ্ছেদ

বিবাহ বিচ্ছেদের পর পুনরায় ঐ একই ব্যক্তিদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য বিচ্ছেদ প্রাপ্ত নারীর পুনরায় ভিন্ন ব্যক্তির সাথে বিবাহ হওয়া এবং এ স্বামীর সাথে তার প্রকৃত দৈহিক মিলনের পর বিবাহ বিচ্ছেদ শেষে পূর্ববর্তী স্বামীর সাথে বিবাহ হওয়ার ঘটনায় মধ্যবর্তী বিবাহের ঘটনা হিলা বিবাহ হিসেবে পরিচিত।[৪০] পবিত্র কোরআনেও এরূপে মধ্যবর্তী বিবাহের নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে 'যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীর সাথে (অলংঘনীয়) বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়, তারপর সে, ঐ স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রীর অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ হয় এবং ঐ ব্যক্তি তার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়।'[৪১]

পবিত্র কোরআনের এরূপ বাধ্যবাধকতা ভিত্তিক নিয়ম থাকায় একটি মামলায়[৪২] প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ভিন্ন ব্যক্তির সাথে পুনরায় স্বামী স্ত্রী হিসেবে বসবাস, দৈহিক মিলন, সন্তানের জন্মদান অবৈধ। এ মামলার ঘটনা হচ্ছে জনৈক গিয়াস উদ্দিন তার স্ত্রী আনিসা খাতুনকে তালাক দিয়েছিল। পরে ভিন্ন ব্যক্তির সাথে আনিসা খাতুনের মধ্যবর্তী বিবাহ ব্যতীত তারা নিজেরা স্বামী স্ত্রী হিসেবে বসবাস শুরু করেছিল। দৈহিক মিলনে তাদের পাঁচটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। এসব সন্তানের মর্যাদার প্রশ্নে আনীত মামলায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর হওয়াসহ ভিন্ন ব্যক্তির সাথে মধ্যবর্তী বিবাহের অনুপস্থিতিতে প্রিভি কাউন্সিল উক্তরূপ রায় প্রদান করেন। তবে বাংলাদেশে কার্যকর The Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (Ordinance VIII of 1961) অনুযায়ী কোনো স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের পর হিলা বিবাহ ছাড়া নিজেদের মধ্যে পুনরায় বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। স্ত্রীর সাথে তৃতীয় ব্যক্তির বিবাহ ছাড়া ছাড়াছাড়ির পর নিজেদের মধ্যে পুনরায় দুইবার সরাসরি বিবাহ সম্ভব।[৪৩]

---

[৩৮] *তদেব*, পৃ. ৯৩-৯৪. Behram Khan v. Akhtar Begum *PLD 1952* (WP) Lah. 548.
[৩৯] *The Dissolution of Muslim Marriages Act,* 1939, Section 2 (vii).
[৪০] Fyzee, p. 153,
[৪১] *The Holy Qur'an*, II:230.
[৪২] Rashid Ahmed v. Anisa Khatun (1931) 59 *I.A.*21, M.P.Jain, *Outlines of Indian Legal History* (5th ed., reprint; Nagpur: Wadhwa & Company Nagpur,1993), p. 606, Fyzee(1999), p.158.
[৪৩] *The Muslim Family Laws Ordinance, 1961*, Section 7(6).

৫.১.২.২. হিন্দু আইন

সনাতন হিন্দু আইন অনুযায়ী বিবাহের মাধ্যমে হিন্দু নারী ও পুরুষ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। ফলে প্রথা অনুমোদিত না হলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ চলে না।[৪৪] ভারতে প্রচলিত The Hindu Marriage Act, 1955 (Act 25 of 1955) এবং The Special Marriage Act, 1954 (Act 43 of 1954) অনুযায়ী স্বামী বা স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ গ্রহণ করতে পারে। এ দুই আইনে দৈহিক মিলনের অক্ষমতাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ গণ্য করা হয়েছে। অক্ষমতার কারণে দৈহিক মিলন না হওয়ায় আদালত বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি দিতে পারেন।[৪৫] এছাড়া বিবাহের পর নিজের স্ত্রী বা স্বামী ব্যতীত অপর ব্যক্তির সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে দৈহিক মিলন ঘটানোর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি দিতে পারেন।[৪৬]

৫.১.২.৩. The Divorce Act, 1869 (Act IV of 1869)

বাংলাদেশী খ্রিস্টানের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্নযোগ্য। আদালতের মাধ্যমে তার জন্য ডিক্রির প্রয়োজন হয়। স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগে স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ (Dissolution of Marriage) চাইতে পারে।[৪৭] এছাড়া স্বামী বা স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্ত্রী বা স্বামী বিবাহ বাতিলের (Nullity of Marriage) জন্য অভিযোগ আনতে পারে যে সে বিবাহের সময় দৈহিক মিলনে অক্ষম (Impotent) ছিল এবং মামলা দায়েরের সময় সেরূপ আছে। এ কারণে আদালত বিবাহ নির্বল ও বাতিল (Null and Void) ঘোষণা করতে পারেন।[৪৮] এছাড়া স্বামী বা স্ত্রী ব্যভিচারের অভিযোগে তাদের বিবাহ বিচারিক পৃথক্করণ (Judicial Separation) দ্বারা ছিন্ন করতে পারে।[৪৯]

৫.১.৩. মোহরানা

মোহরানা হচ্ছে মুসলিম বিবাহের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মুসলিম বিবাহ স্ত্রীর মোহরানা পাওয়ার অধিকার এবং স্বামীর তা পরিশোধে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেছে। পরিশোধযোগ্য মোহরানা সুনির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট হতে পারে। সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত মোহরানার অঙ্ক পরিশোধের দিক থেকে দুইভাগে বিভক্ত। যথা: (১) তাৎক্ষণিক এবং (২) বিলম্বিত। তাৎক্ষণিক মোহরানা বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টির সাথে সাথে চাওয়া মাত্র এবং বিলম্বিত মোহরানা বিবাহ বিচ্ছেদের পর পরিশোধযোগ্য। দৈহিক মিলন হলে স্ত্রী সম্পূর্ণ এবং না হলে অর্ধেক মোহরানা পেয়ে থাকে।[৫০] বর্তমানে বাংলাদেশে নিকাহনামায় মোহরানার অঙ্কের পরিমাণ এবং তা পরিশোধের পদ্ধতি লিখে রাখা হয়। যদি কোনো পদ্ধতি উল্লিখিত না হয় মোহরানার সমগ্র অর্থ চাহিবা মাত্র পরিশোধযোগ্য গণ্য হবে।[৫১] স্ত্রীর ধর্মত্যাগের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে দৈহিক সম্পর্ক হয়ে থাকলে স্ত্রী মোহরানার সম্পূর্ণ টাকা

---

[৪৪] Sunderlal T. Desai, *Mulla Principles of Hindu Law* (16th ed.; Bombay: N. M. Tripathi Private Limited, 1994), p. 485.

[৪৫] *The Hindu Marriage Act, 1955* (Act 25 of 1955), section 12; *The Special Marriage Act,1954* (Act 43 of 1954), Section 24.

[৪৬] *The Hindu Marriage Act, 1955*, Section 13 (1) (i).

[৪৭] *The Divorce Act, 1869* (Act IV of 1869), Section 10.

[৪৮] *তদেব*, ধারা ১৮, ১৯ (১)।

[৪৯] *তদেব*, ধারা ২২।

[৫০] *The Holy Qur'an*, 2:237; আলিমুজ্জামান চৌধুরী, *বাংলাদেশে মুসলিম আইন* (ঢাকা: অরণি প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ. ৪৫৮।

[৫১] *The Muslim Family Laws Ordinance, 1961*, Section 10.

পাওয়ার অধিকারিণী।[৫২] তাৎক্ষণিক মোহরানা যতক্ষণ পরিশোধ করা না হবে ততক্ষণ স্ত্রী স্বামীর সাথে বসবাস করতে ও স্বামীকে দৈহিক মিলনের সুযোগ দিতে অস্বীকার করতে পারে।[৫৩] সুন্নি আইন অনুযায়ী মোহরানার অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা নিশ্চিতকরণের অন্যতম ঘটনা দাম্পত্য মিলন, বৈধ অবসর। তবে শিয়া আইনে বৈধ অবসরে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না।[৫৪]

৫.১.৪. খোরপোশ

মুসলিম আইন

সাধারণত কোনো ব্যক্তি বিবাহ, সম্পত্তি ও সম্পর্কগত কারণে অপরের খোরপোশ প্রদানে দায়বদ্ধ। স্ত্রীরও খোরপোশ প্রদান মুখ্য দায়িত্ব। স্ত্রীর সাথে স্বামীর একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক অন্য সকলের সাথের সম্পর্কের উর্ধ্বে। বিবাহ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এ সম্পর্ক সৃষ্টি করে। স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর খোরপোশ পাওয়া বৈবাহিক সম্পর্কগত অধিকার হলেও তা গুরুত্বপূর্ণ শর্তের উপর নির্ভরশীল। উক্ত কারণে স্ত্রীর বয়ঃপ্রাপ্তির পরেই এবং তার পূর্বে নয়, স্ত্রীর খোরপোশ প্রদানে স্বামী বাধ্য। উপরন্তু স্ত্রীকে স্বামীর বাধ্য হওয়াসহ সকল আইনসিদ্ধ সময়ে স্বামীকে স্বাধীন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি প্রদান আবশ্যক[৫৫] যাকে দৈহিক মিলন হিসেবে গণ্য করা হয়।

৫.১.৫. জন্মের বৈধতা

মুসলিম সম্প্রদায়ে মানুষের জন্ম গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৈধতা থাকা প্রয়োজন। তা বৈধ বা ত্রুটিপূর্ণ বৈবাহিক সম্পর্কগত হলেও চলে। কোনো অবৈধ সম্পর্ক বৈধ সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। মুসলিম আইনে কোনো ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তির সাথে ঐ সন্তানের মায়ের বৈধ বা ত্রুটিপূর্ণ বৈবাহিক সম্পর্ক থাকাকালে সন্তানটিকে ভূমিষ্ঠ হতে হবে; এবং কতিপয় ক্ষেত্রে স্বীকৃতিও সন্তানের জন্মের বৈধতা দেয়। মুসলিম পরিবারে বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত সন্তান জন্মদান ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত। ফলে বৈধ বা ত্রুটিপূর্ণ বৈবাহিক সম্পর্কগত দৈহিক মিলনেই সন্তানের জন্ম হয়। বিবাহ বহির্ভূত বা অবৈধ বিবাহগত দৈহিক মিলনজাত সন্তান অবৈধ তথা জারজ।[৫৬] সন্তানের জন্মের বৈধতা বিষয়ে আদালতের বিচারকার্যে The Evidence Act, 1872 (Act 1 of 1872) কার্যকর ভূমিকা রাখে। এটি দেশের সাধারণ আইন। সে অনুযায়ী সন্তানের পিতা মাতার আইনানুগ বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে বা বিবাহ বিচ্ছেদের ২৮০ দিনের মধ্যে (মাতার পুনরায় বিবাহ হয়ে না থাকলে) যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তা ঐ পিতা মাতার বৈধ সন্তান হিসেবে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে যদি না প্রমাণিত হয় যে কথিত গর্ভ সঞ্চারের সময় তার মাতার সাথে পুরুষটির দৈহিক মিলন ঘটেনি বা ঘটার মত কোনো সুযোগ ছিল না।[৫৭] সন্তানের বৈধতা নির্ণয়ে তার মাতার সাথে তার পিতার দৈহিক মিলন অবশ্যই সংঘটিত হতে হবে। সন্তানের বৈধতা বিষয়ে প্রচলিত এ আইনের বিধান সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৫.১.৬. উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকার বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ পক্ষদের বিবাহগত অধিকার। বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন দ্বারা প্রত্যেকের নিজ নিজ উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত। পরিত্যক্ত সম্পত্তির

---

[৫২] A. M. Md. Ebrahim v. MaMa *(1939) Rang.*383, 179 *I.C.* 47.

[৫৩] আলিমুজ্জামান, পৃ. ৪০০, ৪১০।

[৫৪] *তদেব*, পৃ. ৪০৫-৬।

[৫৫] Fyzee (1999), p.12.

[৫৬] *তদেব*, পৃ. ১৮৯-১৯৬।

[৫৭] *The Evidence Act, 1872* (Act 1 of 1872), Section 112.

অংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে সকল আইনে অগ্রাধিকার নীতি যেমন আছে বঞ্চিতকরণ নীতিও তেমন আছে। ফলে কেউ অন্য অপেক্ষা আগে পায়, অথবা অন্য থাকলে অংশ পায় না। আবার কোনো কারণে কেউ বঞ্চিত হয়। বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি পাওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশে প্রচলিত সনাতন হিন্দু আইনের দায়ভাগ মতবাদ অনুযায়ী উত্তরাধিকার বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ অংশীদারের সন্তান জন্মদানে জন্মগত অক্ষমতা (Congenital Impotence)।[৫৮] এ ধরনের জন্মদানের অক্ষমতা মূলত দৈহিক মিলনের অক্ষমতাকে বুঝায়। পুরুষের অংশীদারের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। নারী স্ত্রী হিসেবে জীবনস্বত্বে স্বামীর সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। Congenital Impotence এর কারণে বাংলাদেশে স্ত্রীরও বঞ্চিত হওয়ার নিয়ম আছে। ভারতে The Hindu Succession Act, 1956 (Act 30 of 1956)-এ বঞ্চিত হওয়ার জন্য এটি কোনো কারণ হিসেবে গৃহীত হয়নি।[৫৯] ফলে ভারতে পুরুষের অংশীদার স্ত্রী সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারিণী। সন্তান জন্মদানের অক্ষমতার কারণে সে উত্তরাধিকার বঞ্চিত হয় না।

৫.২. অপরাধজনক ক্ষেত্র

সাধারণভাবে বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলন তথা নারী ও পুরুষের যৌন সম্পর্ক শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সমাজ ও রাষ্ট্র এ সম্পর্ক রোধে অত্যন্ত তৎপর। এ প্রকারের সম্পর্ক সাধারণত এক পাক্ষিক। তবে পারস্পরিক আচরণগতভাবেও এ অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রকৃতিভেদে এগুলো হলো (১) ধর্ষণ, (২) ব্যভিচার (Adultery), (৩) প্রতারণামূলকভাবে বৈধ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দৈহিক মিলন, (৪) জেনা, (৫) অজাচার (Incest)। অপরাধ সংঘটনসহ অপরাধ সংঘটনের চেষ্টাও শাস্তিযোগ্য। অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা নয় বরং সংঘটিত অপরাধ এ প্রবন্ধের আলোচিত বিষয়। অপরাধের বিষয়সমূহ নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো :

৫.২.১. ধর্ষণ

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অথবা নারীর বিরুদ্ধে পুরুষের একপাক্ষিক আচরণে ধর্ষণ সংঘটিত হতে পারে। সাধারণত কতকগুলো অবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্কজাত এবং বিবাহ বহির্ভূত নারী ও পুরুষের দৈহিক মিলন হচ্ছে ধর্ষণ। বৈবাহিক সম্পর্ক স্ত্রীর সাথে স্বামীর স্বাভাবিক দৈহিক মিলনের অধিকার দিলেও ১৪ বছরের কম বয়সী স্ত্রীর সাথে স্বামীর স্বাভাবিক দৈহিক মিলন ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হয়। এছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রের ধর্ষণ বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত দৈহিক মিলন। এ ধরনের সকল ক্ষেত্রে নারীর বিরুদ্ধে পুরুষের এক পাক্ষিক আচরণ প্রকাশিত হয়। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বা তার সম্মতি ছাড়া, বা তাকে মৃত্যু ঘটানোর বা আঘাতের ভয়ে ভীত করে আদায় করা সম্মতিতে তার সাথে পুরুষের দৈহিক মিলন হচ্ছে ধর্ষণ।[৬০]

৫.২.১.১. ধর্ষণের শাস্তি

ধর্ষণের আওতাভুক্ত প্রত্যেক অপরাধেরই নির্দিষ্ট শাস্তি আছে। ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৬১]

---

[৫৮] Desai, (1994), p.52.

[৫৯] *The Hindu Succession Act*, 1956 (Act 30 of 1956), Section. 28.

[৬০] *The Penal Code1860*, (Act XLV of 1860), Sections 375, 376; *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০* (২০০০ সালের ৮নং আইন), ধারা ৯; খবির উদ্দীন আহম্মদ, বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, *আইবিএস জার্নাল*, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯, ১৪৭-১৬৪; বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কজাত সন্তানের অধিকার ও মর্যাদা, *আইবিএস জার্নাল*, ১১শ সংখ্যা, ১৪১২, ২৩১-২৪০।

[৬১] *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০*, ধারা ৯(১)।

৫.২.২. ব্যভিচার (Adultery)

ব্যভিচার নারী ও পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের পারস্পরিক আচরণগত যৌন অপরাধ। বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে কোনো দম্পতির একজনের সাথে অন্য দম্পতির বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির সাথের দৈহিক মিলনকে ব্যভিচার বলা হয়।[৬২] The Penal Code, 1860-তে ব্যভিচারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সে মতে কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের স্ত্রীর সাথে তার (স্বামী) সম্মতি বা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সমর্থন ব্যতীত যৌন সঙ্গম সম্পন্ন করে তবে তাকে ব্যভিচার বলা হবে।[৬৩] ব্যভিচারের ফলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে মুসলিম আইন অনুযায়ী উক্ত সন্তান মায়ের সন্তান বিবেচিত হবে এবং মায়ের ও মাতৃকূলের আত্মীয়দের উত্তরাধিকারে সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে।[৬৪]

৫.২.২.১. ব্যভিচারের শাস্তি

ব্যভিচারের জন্য কেবল পুরুষের অপরাধ সংঘটিত হয়। এজন্য তাকে দণ্ডিত করা যায়। এর শাস্তি সর্বাধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ড। ব্যভিচারে অংশগ্রহকারী স্ত্রীকে ব্যভিচারের সহযোগী হিসেবে দণ্ডিত করা যায় না।[৬৫]

৫.২.৩. প্রতারণামূলকভাবে বৈধ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দৈহিক মিলন

(Cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage)

The Penal Code, 1860 অনুযায়ী কোনো পুরুষ কর্তৃক প্রতারণামূলকভাবে কোনো নারীকে তার সাথে বৈধ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করে তার সাথে স্বামী স্ত্রী হিসেবে দৈহিক মিলন ঘটালে ঐ পুরুষটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত করে।[৬৬] এ ক্ষেত্রে সাধারণত নারীকে কোনো বিবাহ অনুষ্ঠানের ঘটনা দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করা হয় যে তার সাথে বিবাহ হয়েছে এবং পরে তার সাথে দৈহিক মিলন ঘটানো হয়। আদৌ তাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। এ প্রকারের দৈহিক মিলনের ফলে অনেক সময় অনেক মহিলার গর্ভ সঞ্চার হয়। নারী সন্তানের মাও হয়।

৫.২.৩.১. শাস্তি

সর্বাধিক দশ বছর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ড।[৬৭]

৫.২.৪. জেনা

পবিত্র কোরআনে দৈহিক মিলনে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হয়ে তাতে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।[৬৮] ফলে দৈহিক মিলন হালাল (Lawful) ও হারাম (Unlawful) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। হারামের আওতাভুক্ত বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলন শাস্তিযোগ্য।[৬৯] পবিত্র কোরআনে জেনায় লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে জেনা করো না। কারণ তা অশ্লীল এবং নষ্ট পথ। তা অন্য সকল নষ্টকে আমন্ত্রণ করে।[৭০] তা ইসলামি ফৌজদারি আইনের আওতাভুক্ত অপরাধ। মোগল আমলে ভারতে ইসলামি ফৌজদারি আইন দেশের সাধারণ আইন ছিল। ব্রিটিশ শাসন আমলে বিভিন্নভাবে

---

[৬২] Modi, 33., গাঙ্গুলী, পৃ. ৪০০।
[৬৩] *The Penal Code1860*, Section 497.
[৬৪] আলিমুজ্জামান, পৃ. ৪৬২।
[৬৫] *The Penal Code1860*, Section 497.
[৬৬] *তদেব*, ধারা ৪৯৩।
[৬৭] *তদেব*।
[৬৮] Bouhdiba, p.14.
[৬৯] *তদেব*, পৃ. ১৫।
[৭০] *The Holy Qur'an*, XVII:32.

ফৌজদারি আইন সংস্কার সাধিত হয়েছে এবং সর্বশেষ The Indian Penal Code,1860 প্রণীত হলে ইসলামি ফৌজদারি আইন দেশের সাধারণ আইনের মর্যাদা হারায়। ইসলামি ফৌজদারি আইনের বিধান অনুযায়ী অবৈধ ও অননুমোদিত নারী ও পুরুষের এক প্রকার দৈহিক মিলনকে জেনা বলা হয়।[৭১] আদি ও আইনগত অর্থে বৈবাহিক বা দাসত্ব অধিকারের নিজস্ব সম্পদ নয় এমন কোনো নারীর সাথের কোনো পুরুষের দৈহিক মিলন হচ্ছে জেনা।[৭২] এ দৈহিক মিলনের বিষয় ছাড়াও ইসলামে কতগুলো বিষয় জেনার আওতাভুক্ত। যেমন : চোখের জেনা—দেখা, জিহ্বার জেনা—কথা বলা, হাতের জেনা—স্পর্শ করা, পায়ের জেনা—লালসার প্রতি গমন করা, ইত্যাদি।[৭৩]

৫.২.৪.১. জেনার শাস্তি

জেনার অপরাধ বাংলাদেশের সাধারণ বা বিশেষ আইনের আওতাভুক্ত অপরাধ নয়। তা মুসলিম আইনের আওতাভুক্ত। দৈহিক মিলন বিষয়ক জেনা নারী ও পুরুষের পারস্পরিক কার্য। উভয়েই এজন্য দণ্ডিত হয়। এজন্য বিবাহিত ব্যক্তির গুরুতর এবং অবিবাহিত ব্যক্তির লঘু দণ্ডের পরিমাণ নিম্নরূপ:

১. জেনাকারী ব্যক্তি বিবাহিত হলে তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে হত্যা করতে হবে;
২. জেনাকারী ব্যক্তি অবিবাহিত মুক্ত তথা স্বাধীন হলে তার শাস্তি একশ বেত্রাঘাত;
৩. এরূপ ব্যক্তি দাস হলে তার শাস্তি পঞ্চাশ বেত্রাঘাত।
পুরুষকে দাঁড়ানো এবং নারীকে বসা অবস্থায় বেত্রাঘাত করতে হয়।[৭৪]

৫.২.৫. অজাচার (Incest)

বৈবাহিক বা রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়ের সাথে যথা কন্যা, পুত্রের কন্যা, বোন, বোনের কন্যা, ইত্যাদির সাথে সংঘটিত দৈহিক মিলনের এরূপ ঘটনা একপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক হতে পারে। ইংল্যান্ডসহ অনেক পাশ্চাত্য দেশে এ ধরনের ঘটনা শাস্তিযোগ্য হলেও বাংলাদেশে তা শাস্তিযোগ্য নয়।

৬. আলোচনা ও সুপারিশ

নারী ও পুরুষের মধ্যে দৈহিক মিলনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে শাশ্বত স্বর্গীয় ইচ্ছা।[৭৫] তা নারী ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গতার ও আনন্দের বিষয়।[৭৬] প্রকৃতিগত কারণেই নারী ও পুরুষের মধ্যে দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়। মূলত তা সৃষ্টি কৌশল। অনেক সময়ে অনেকের কাছে তা আবার অপার বিনোদনের বিষয়। প্রত্যেক নারী ও পুরুষের মধ্যে দৈহিক মিলনের তাগিদ অনুভূত হয়। জীবনের প্রথম দিকে এ চেতনার শুরু এবং শেষ দিকে নিঃশেষ হয়। সাধারণত বয়ঃসন্ধিতে দৈহিক ও মানসিক যে পরিবর্তন তারই আয়োজন তা। অবশ্য অনেক পূর্বে বাহ্যিক দৈহিক গড়ন নারী ও পুরুষের প্রভেদ প্রকাশ করে। তা জীবনের গতি বিধিতে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ আনে। দৈহিক মিলনের চেতনা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ জাগায়, তা বিবাহকে আবশ্যক করে। কিন্তু সন্তান জন্মদানের মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি প্রকৃতিগতভাবে হলেও অনেক সময় বাস্তবভাবে হয় না। ফলে নারী নানাভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

---

[৭১] আলিমুজ্জামান, পৃ. ৩৭৮।
[৭২] *Hedaya*, p.182.
[৭৩] Bouhdiba. P.39.
[৭৪] *তদেব*, পৃ. ১৭৮-১৮০।
[৭৫] *তদেব*, পৃ. ৭, *The Holy Qur'an*, XXX:20.
[৭৬] Bouhdiba, p.8.

সন্তান জন্মদানে মাতৃ-মৃত্যু ব্যতীত স্বল্প বয়সে নারীর দৈহিক মিলন শারীরিক ও মানসিকভাবে নারীকে, পাশাপাশি পুরুষকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এ সকল বিপদের আশঙ্কারোধে অল্প বয়সের বিবাহ রোধ করার জন্য এ অঞ্চলে The Child Marriage Restraint Act, 1929 প্রণীত হয়েছে। তা দ্বারা ১৮ বছরের কমে নারী ও ২১ বছরের কমে পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এ আইন বাংলাদেশেও প্রযোজ্য। তা শিশু বিবাহকে শাস্তিযোগ্য করেছে।

যে সব নারী ও পুরুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষালাভ করছে তাদের জন্য এবয়স অতিক্রম করা সহজ। কিন্তু সাধারণ অবস্থার জীবন যাপনে তা অপেক্ষাকৃত কঠিন। আবার পুরুষের সন্তান জন্মদানের সময়কাল নারী অপেক্ষা বেশি। বিলম্বে বিবাহ তার জন্য মোটামুটি সকল ক্ষেত্রেই মঙ্গলজনক। কিন্তু নারীর জন্য সকল ক্ষেত্রে নয়। সন্তান জন্মদানে তার শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন যা গড়ে পঁয়তাল্লিশ বছর পার হলেই শেষ হয়ে যায়।[৭৭] প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষের একই বয়সে শেষ হয় এবং উভয়েই প্রায় একই বয়সে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। নারী ও পুরুষ সহপাঠী হলেও সন্তান জন্মদানে পুরুষ অপেক্ষা নারীর অগ্রগণ্যতা থাকে। সে গর্ভে সন্তান ধারণ করে। যৌন জীবন বিষয়ে সে পুরুষ অপেক্ষা অধিক পরিপক্বতা অর্জন করে। পুরুষের প্রতিনিয়ত অজস্র শুক্র নির্গত করা সম্ভব হলেও একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর নারীর ডিম্ব নিঃস্বরণ সম্ভব এবং গর্ভ সঞ্চার হলে প্রায় ১০ মাস ১০ দিন গর্ভে সন্তান ধারণ, প্রসব এবং পরবর্তী ডিম্ব নিঃসরণে তার সময়ের প্রয়োজন। শিক্ষা গ্রহণকালে নারীর জীবনের অধিক সময় ব্যয় হয়ে যায়। মাতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা তাকে ব্যাকুল না করলেও তার মানসিক অপেক্ষা দৈহিক প্রস্তুতি দ্রুত শেষ হয়ে যায়। এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ন্যূনতম আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনে মুসলিম বিবাহ সম্পন্ন সম্ভব। বিবাহ প্রমাণের প্রচেষ্টায় প্রণীত মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ সময় ক্ষেপণ ও অধিক আর্থিক খরচের অবস্থা দিয়েছে যা বিবাহ নিবন্ধনকে নিরুৎসাহিত করে। এক্ষেত্রে সহজ অবস্থা আনা প্রয়োজন। বিবাহ নিবন্ধন না করাকে শাস্তি বহির্ভূত করাসহ প্রত্যেক সহকারী জজ আদালতের বিচারককে তাঁর স্থানীয় এলাকার জন্য বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব দ্বারা বিবাহ নিবন্ধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্য সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিবাহ নিবন্ধনের গুরুত্ব সমান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এবং আদালতে নিবন্ধনের ব্যবস্থা চালু হলে দীর্ঘকালের কোর্ট ম্যারেজ ধারণা বাস্তবে রূপলাভ করতে পারে। শাস্তিযোগ্য অপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রত্যেক পুরুষেরই উচিত বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকা। ব্যভিচারে পুরুষের সাথে নারীর অংশ গ্রহণ বিবেচনায় নিয়ে তাকে তার সহযোগী গণ্য করা এবং শাস্তির আওতায় আনা দরকার। ১৪ বছরের কম বয়সী স্ত্রীর সাথের স্বামীর দৈহিক মিলনকে ধর্ষণ গণ্য না করে বরং বয়ঃসন্ধিতে উপনীত না হওয়া অর্থাৎ ন্যূনতম ৯ বছরের কম বয়সী স্ত্রীর সাথে স্বামীর দৈহিক মিলনকে ধর্ষণ গণ্য করার প্রয়োজনীয় বিধান করা যেতে পারে। তবে ধর্ম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইনে অনুমোদিত বিবাহযোগ্য বয়সে বিবাহিতা নারীর সাথে স্বামীর দৈহিক মিলন ধর্ষণের আওতা বহির্ভূত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেবল দৈহিক মিলন বিবাহগত অধিকার। দৈহিক মিলন, গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান পুরোপুরি পৃথক তিনটি বিষয়।

হিলা বিবাহ প্রসঙ্গে The Muslim Family Laws Ordinance,1961-এর বিষয়টি কোরআনের নির্দেশের পরিপন্থী। তা তৃতীয় ব্যক্তির সাথে বিবাহের আবশ্যকতা দূরীভূত করেনি, বরং তৃতীয় ব্যক্তির সাথের বিবাহ বিচ্ছেদে চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ প্রদান, ৯০ দিন অতিবাহিত হওয়া সংক্রান্ত বিধান ১ম ও ২য় বারের ক্ষেত্রে পালন না করার জন্য বলা হয়েছে গণ্য করা উচিত। এছাড়া

---

[৭৭] Modi, p. 307.

তৃতীয় বার তৃতীয় ব্যক্তির সাথে বিবাহ বিচ্ছেদে নোটিশের বিধান অবশ্য পালনীয় গণ্য হওয়া উচিত। বিচ্ছেদ হওয়া স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পুনরায় বিবাহ মধ্যবর্তী বিবাহ ব্যতীত সম্পাদনে কোরআনের নিষেধাজ্ঞা থাকায় মধ্যবর্তী বিবাহ ব্যতীত বিবাহ অবৈধ হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য দেখতে হবে বিবাহ বিচ্ছেদটি অলঙ্ঘনীয় হয়েছে কি না।

যে সকল দেওয়ানি ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক সত্ত্বেও দৈহিক মিলন অধিকার হরণ করে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা প্রয়োজন। নারী ও পুরুষের দৈহিক মিলন সম্পর্কিত সুবিধা অসুবিধার বিভিন্ন দিক সামনে নিয়ে একত্রে একটি বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলে অগ্রসর হতে পারেন। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান প্রত্যেককে উন্নততর জীবনদানে সক্ষম হবে আশা করা যায়। অভিজ্ঞতা, সচেতনতার অভাব বা অন্য কোনো কারণে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ পক্ষদের মধ্যে দৈহিক মিলনের অভাব বিবাহ বিচ্ছেদ তরান্বিত করে। বিবাহের প্রাথমিক পর্যায়েই তা দাম্পত্য বিপর্যয় ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে পক্ষসহ স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটন ও তা দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বিশ্বাস, সহানুভূতি, মানবতা ইত্যাদিসহ অন্যান্য কার্যকর প্রক্রিয়া দ্বারা এ ধরনের সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। শুভার্থীদের কেবল প্ররোচনা নয় পক্ষদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনও প্রয়োজন। স্থায়ী বৈবাহিক মিলনের অক্ষমতার প্রশ্ন ভিন্ন। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা না রাখার বিষয় পক্ষদের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে অন্যদের সহযোগিতা কাম্য। ভারতে হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য The Hindu Marriage Act,1955 কার্যকর ভূমিকা রাখছে। যে সকল কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রয়োজন তা অনুসন্ধানপূর্বক ঐ আইনের আদলে হিন্দর জন্য বাংলাদেশে আইন প্রণীত হতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়সহ সকলের কার্যকর ভূমিকা প্রয়োজন। The Hindu Sucession Act, 1956 ভারতে উত্তরাধিকার বঞ্চিত হওয়ার বাংলাদেশের Congenital Impotence-কে কোনো কারণ গণ্য করেনি। ফলত ঐ কারণে সেখানে কেউ উত্তরাধিকার বঞ্চিত হয় না। উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য এ বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। তাকে কেবল বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্নের কারণ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করা যায় যা অন্য সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকার বঞ্চিত হওয়ার তা কিন্তু কোনো কারণ নয়। টাকা বা কিছুর বিনিময়ে ভাড়ায় দৈহিক মিলনের গণিকাবৃত্তির বিষয়টি অনৈতিক বাণিজ্য। এরূপ মিলনের পক্ষদের মধ্যে তা অধিকার সৃষ্টি করে না। প্রকাশ্যে তা না হলে তাতে অপরাধ হয় না। এ অনৈতিক ও অসামাজিক গণিকাবৃত্তি রোধে পক্ষদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আইন হওয়া দরকার। তাতে নারী দেহ বাণিজ্যের পুঁজি হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। এ বিষয়ে রাষ্ট্র তার উপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কঠোর আইন প্রণয়ন ও যথাযথভাবে তার প্রয়োগ নিশ্চিত করলে এ বিষয়ে নিশ্চিত সুফল পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

৭. উপসংহার

মানুষের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে তার দৈহিক মিলনের সক্ষমতার সময়। সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে টিকিয়ে রাখার জন্য এ সময় কারো একার নিজস্ব নয়। তা সমগ্র মানব জাতির। সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির অপার কৌশল হিসেবে সমগ্র প্রাণীকুলের মধ্যে প্রদানের মতো মানুষের মধ্যেও এ অমূল্য সম্পদ দান করেছেন। মানুষ থেকে মানুষের জন্ম গ্রহণ দ্বারা মানব সভ্যতা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। এ এক সৃষ্টি কৌশল। সৃষ্টিতে মানুষের হাত নাই। এ ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এ কারণে মানুষের মধ্যে সংরক্ষিত মানুষ সৃষ্টির উপাদান যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়ে মানুষ জন্ম নিচ্ছে, আবার এরূপ ব্যবহারে কারো জন্ম হচ্ছে না; নারী ও পুরুষ এমন অনেক মানুষ আছে যাদের মধ্যে মানুষ সৃষ্টির এ উপাদান একেবারেই অনুপস্থিত। সৃষ্টি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে নারী ও পুরুষে মানুষ

দুইভাগে বিভক্ত। মানুষের অপর এক শ্রেণী হিজড়া। সন্তান জন্মদানে এরা অক্ষম। নারী ও পুরুষ দৈহিক মিলনের ক্ষমতায় পারস্পরিক অধিকারী। দৈহিক মিলন তাদের অধিকার প্রদান করে। অধিকার হরণ করে। জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময় সন্তান জন্মদানের সক্ষমতার সময়। পরিপূর্ণ বয়সের মানুষের সাধারণত জীবনের মধ্যবর্তী বয়স তথা মধ্যবর্তী সময় বা মধ্যবর্তী কাল এটা। এ সময় অতীত হয়ে গেলে মানুষ অক্ষম হয়ে যায়। এ সময়ের উভয় প্রান্তেই মানুষের মূল্যবান সময় আছে। এ সময়ে যাতে প্রত্যেকে অন্য সকল সক্ষম অবস্থার সহযোগিতা পায় তা সকলেরই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে দৈহিক মিলনের বৈধতার জন্য স্বীকৃত পন্থা বৈবাহিক সম্পর্ক । এ সম্পর্কগত দৈহিক মিলন পক্ষদের মধ্যে অধিকার দেয়, অধিকার হরণ করে। আবার এ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বয়সগত কারণে স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন স্বামীর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধ ছাড়া বিবাহ বহির্ভূত অন্য সকল দৈহিক মিলনই পুরুষের জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত এ অপরাধ রোধে দেশের প্রচলিত আইনে পুরুষকে দণ্ডিত করা হয়। স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ থাকলেও তার জন্য নারীকে শাস্তি দেওয়া হয় না। এতে অপরাধ প্রবণতার প্রতি প্ররোচনা দূরীভূত হয় না। সহিংস প্রকৃতির পুরুষের সক্রিয় দৈহিক মিলনে কেবল পুরুষকে দণ্ডিত করা যেতে পারে। কিন্তু অন্য যেসব ক্ষেত্রে নারীর প্ররোচনা, অংশগ্রহণ বা অন্যরূপ সহযোগিতা থাকে সেখানে নারীকেও দণ্ডের আওতায় আনা প্রয়োজন। ফলে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন দ্বারা অজাচারসহ জেনাকেও শাস্তিযোগ্য করা যেতে পারে। নারীকুলকে রক্ষার জন্য অতি উৎসাহী নারীর বিরুদ্ধে তার বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য শাস্তির বিধান প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। তাতে দণ্ড আরোপে নারী পুরুষ বৈষম্য বিলোপসহ বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলনরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান আবশ্যক। ধর্ম ও আইনের চাহিদার আলোকে সুনিয়ন্ত্রিত দৈহিক মিলন সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা দিতে পারে।

আইবিএস প্রকাশনা

পত্রিকা ও গ্রন্থ (বাংলায়)

আইবিএস জার্নাল (বাংলা), ১৪০০:১–১৪১২-১৩

ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সাহিত্য (সেমিনার : ৩), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৭৯)

বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা (সেমিনার : ৬), আমানুল্লাহ আহমদ (১৯৮৫)

বাঙালীর আত্মপরিচয় (সেমিনার : ৭), সম্পাদক : এস.এ. আকন্দ (১৯৯১)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা (সেমিনার : ৯), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৭৯)

বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল), ১ম খণ্ড, আবদুল করিম (১৯৯২)

Journals and Books (in English)

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vols. I-XXIX (1976-2006)

Reflections on Bengal Renaissance (Seminar Volume 1), edited by David Kopf & S. Joarder (1977)

Studies in Modern Bengal (Seminar Volume 2), edited by S.A.Akanda (1984)

The New Province of Eastern Bengal and Assam(1905-1911) by M.K.U.Molla (1981)

Provincial Autonomy in Bengal (1937-1943) by Enayetur Rahim (1981)

The District of Rajshahi : Its Past and Present (Seminar Volume 4), edited by S.A.Akanda (1984)

Tribal Cultures in Bangladesh (Seminar Volume 5), edited by M.S. Qureshi (1984)

Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh (Seminar Volume 8) edited by S.A.Akanda & M. Aminul Islam (1991)

History of Bengal : Mughal Period, Vols. 1 & 2 by Abdul Karim (1991, 1995)

The Institute of Bangladesh Studies : An Introduction (2004)

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies : An Up-to-date Index by M. Shahjahan Rarhi (1993)

Research Resources of IBS : Abstracts of PhD Theses Compiled by M. Shahjahan Rarhi (2002)

Orderly and Humane Migration : An Emerging Development Paradigm edited by Priti Kumar Mitra & Jakir Hossain (2004)

১২শ সংখ্যার সূচিপত্র

মোঃ মনিরুল হক ।। মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	লক্ষ্মণসেনের বাগবাড়ি প্রশস্তি : বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে এক মূল্যবান সংযোজন	৭
মোঃ রেজাউল করিম ।।	যশোরের খেজুর-চিনি : ঔপনিবেশিক বাংলার ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পপণ্য	২১
অজিত কুমার দাস ।।	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) : একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ	৪৩
সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন ।।	উদ্যাণ নির্মাণ ও স্থাপত্য শিল্পে উপমহাদেশীয় রমণীদের অবদান	৫৯
মোসাঃ ছায়িদা আকতার ।।	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রতিক্রিয়া	৬৯
মোসাঃ হাজেরা খাতুন ।।	বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার উৎপত্তি ও প্রকৃতি পর্যালোচনা	৮৭
আতিয়ার রহমান ।।	কুমারখালির প্রাচীন মঠ ও মসজিদ	৯৫
স্বরোচিষ সরকার	লোকনাট্য গাজির গান : শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রসঙ্গিক জিজ্ঞাসা	১১১
মোঃ সরওয়ার মুর্শেদ ।।	মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজৈবনিক রচনা : গ্রামীণ জীবন	১২৯
মোহাং শাহ্ কামাল ভূঞা ।।	বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা নারীর সামাজিক মূল্যায়ন	১৪৭
বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা ।।	বাংলাদেশের বিমূর্ত চিত্রকলার ঐতিহ্যিক পটভূমি	১৫৫
বিলকিস বেগম ।।	বাংলাদেশের বৃত্তিনির্ভর শিল্পকলা : লৌহশিল্প	১৭৫
আবদুল মতিন তালুকদার ।।	বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের পোড়ামাটির ভাস্কর্য : একটি পর্যালোচনা	১৮৫
শাহনাজ সুলতানা ।।	নওগাঁ জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	১৯৭
মোঃ শহীদুল ইসলাম ।। মুহম্মদ মিজানউদ্দিন	বাংলাদেশে শিশুশ্রমের চালচিত্র : রাজশাহী মহানগরকেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা	২১৩
খবির উদ্দীন আহম্মদ ।।	বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কজাত সন্তানের অধিকার ও মর্যাদা	২৩১
আবুল হাসান চৌধুরী ।।	গ্রন্থ সমালোচনা : 'অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ'	২৪১